শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র রায়।

বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ

ও

সাধু জীবনী

নৃণাং পাপকৃতাং তীর্থে ভবেৎ পাপস্য সংক্ষয়ঃ ।
যথোক্তং ফলদং তীর্থং ভবেৎ শুদ্ধাত্মনাম্ নৃণাম্ ॥

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩২০

মূল্য ১।০, কাপড়ে বাঁধান ১॥০

কলিকাতা

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্ স্বর্ণপ্রেসে,

শ্রীমনোরঞ্জন সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

যিনি

জীবনের শেষে

কাশীবাসের

চরমফল

লাভ করিয়াছিলেন

সেই

স্বর্গীয়

পিতৃদেব

শম্ভুনাথ রায় মহাশয়ের

পবিত্র

চরণে

এই

ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

উৎসর্গীকৃত হইল।

—•—

ভূমিকা।

আজকাল বাঙ্গলায় ভ্রমণকাহিনীর নিতান্ত অভাব নাই। ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমার "উত্তরপশ্চিমভ্রমণ" প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন বঙ্গ-সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনীর অভাব ছিল, এ কথা বলা যাইত। এই ৭।৮ বৎসরে সে অভাব অনেকটা পূরিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশের তীর্থভ্রমণ-কহিনী এই নূতন!

অনেকের বিশ্বাস, তীর্থ যাহা কিছু তাহা প্রায় সকলই বঙ্গদেশের বাহিরে। বলিতে লজ্জা নাই, ভূমিকা-লেখকেরও একদিন প্রায় এমনই একটা ধারণা ছিল। এটা যে কত বড় একটা ভ্রম, তাহা যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া একবার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়ের পুস্তকখানি পাঠ করিবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন।

বিহার, উড়িষ্যা ও আসামকে যদি জোর করিয়া বঙ্গদেশের গণ্ডীর বাহিরে নির্ব্বাসিত করিয়া না দেওয়া যায়, তবে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগটীর তীর্থ-গৌরব নিতান্ত সামান্য নহে।

যে দেশে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়া এমন একটা মহাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার আলোকে আজও অর্দ্ধেক জগৎ আলোকিত, যে দেশ চৈতন্যের লীলাভূমি, রামমোহনের জন্মস্থান, রামকৃষ্ণের সাধনাক্ষেত্র, সে দেশ কি তীর্থসম্পদে কাঙ্গাল? সতীর পবিত্র দেহকলা বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে ৫১টী মহাপীঠের সৃষ্টি হয়। তাহার মধ্যে ২২টীই এই বঙ্গদেশে। বঙ্গদেশ কি তীর্থ-গৌরবে কোনও দেশাপেক্ষা হীন?

যে দেশে চন্দ্রশেখর ও কামরূপ বর্ত্তমান, যে দেশে শ্রীক্ষেত্র, ভুবনেশ্বর, গয়া, নবদ্বীপ, কালীঘাট, বৈদ্যনাথ, গঙ্গাসাগর ও লাঙ্গলবন্ধের মত তীর্থ

সকল রহিয়াছে, যে দেশে কেবল বুদ্ধ, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ নন, রামপ্রসাদ, বিবেকানন্দ, রূপ-সনাতন, নিত্যানন্দ, সর্ব্বানন্দ, বারদীর ব্রহ্মচারী ও বিজয়-কৃষ্ণের মত সব মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার তীর্থগৌরব কি কোনও যুগে এতটুকু ম্লান হইবার সম্ভাবনা আছে ?

বুঝিয়া-শুনিয়াই গ্রন্থকার, ভারতের বহুতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াও গ্রন্থ লিখিবার বেলা বঙ্গদেশের তীর্থগুলি লইয়াই বেশী ঝুকিয়া পড়িয়াছেন। তবে যাহাতে পাঠক সম্প্রদায় ভারতের অন্যান্য অংশের তীর্থগুলির বিবরণ হইতেও একেবারে, বঞ্চিত না হন, সেজন্য তিনি পরিশিষ্টে প্রধান প্রধান কয়েকটী তীর্থেরও যথাসম্ভব বিবরণ দিয়াছেন। পুস্তকের উপ-কারিতা এজন্য নিশ্চয়ই অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় ত্রিপুরা জিলানিবাসী একজন সম্ভ্রান্ত ও একান্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। গ্রন্থলিখনেই তাঁহার বিচক্ষণতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্ফূর্ত্তি নহে। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতা চারিদিকে এমন অনর্গলভাবে প্রবা-হিত যে, কোনও একটী দিকের কোন একটী অনুষ্ঠানের ফলাফল লইয়া তাঁহাকে বিচার করিতে বসিলে, তাঁহার প্রতি নিতান্তই অবিচার প্রদর্শন করা হইবে। তিনি সম্পদে ও গৌরবে বিশেষভাবে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও ধর্ম্ম ও দৈন্যের মর্য্যাদা বিস্মৃত হন নাই। স্বচ্ছলতার ক্রোড়ে পালিত হইয়াও তিনি, আচার-নিষ্ঠা, সন্ধ্যাপূজা ও তীর্থাদি-ভ্রমণেই একান্ত অনুরক্ত। তাঁহার জীবনের উজ্জ্বল যান বৃদ্ধত্বের রেখা অতিক্রম না করিতেই, উপযুক্ত পুত্রদের হস্তে সকল ভারার্পণ করিয়া তিনি বৎসর বৎসর নানারূপ শারীরিক কষ্টস্বীকারপূর্ব্বক তীর্থভ্রমণ করিতেছেন এবং সেই সকল ভ্রমণের আমোদ সর্ব্বসাধারণকে বিলাইয়া দিবার চেষ্টায় আছেন। যে বয়সে ধীশক্তির প্রখরতা ক্রমে অবসানের পথে লুপ্ত হইতে থাকে, সে বয়সে লোকরঞ্জনার্থে এরূপ গ্রন্থলিখন-কার্য্যে ব্রতী হওয়া যে নিতান্তই শ্লাঘা ও পুণ্যের কার্য্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে কেবল দর্শনীয় স্থানগুলির বর্ণনা প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তীর্থযাত্রীর আবশ্যকীয় অনেক জ্ঞাতব্য কথাও তিনি ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শাস্ত্রাদি হইতে তীর্থযাত্রাবিধি, তীর্থফল প্রভৃতি অতিকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছেন। তীর্থগুলির উৎপত্তিবিবরণ, ইতিহাস ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব বিবরণী দিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি দশজন সিদ্ধ ও সাধুপুরুষের জীবনীরও উল্লেখ করিয়াছেন। মোট কথা, গ্রন্থখানিকে তীর্থযাত্রীর সম্পূর্ণ উপযোগী করিবার জন্য যতদূর চেষ্টার আবশ্যক, ততটুকু চেষ্টা করিতে তিনি বিরত হন নাই। এখন ফলাফল ভগবানের হাতে!

মহাভারতে পড়িয়াছি, বিদুরের দান অতি সামান্য হইলেও ভগবান স্বয়ং উহা অতি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমার আশা আছে, গ্রন্থকারের এই প্রীতিপূর্ণ দানটীও বঙ্গসাহিত্যের মন্দিরে তেমনি শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

গ্রন্থকারের নিবেদন

প্রবল গ্রীষ্মাতিশয্যে ধরাসুন্দরী যখন সম্যক উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সেই সময় যেমন প্রবল বারিবর্ষণে ধরণী সুশীতল হয়, তেমনি অধর্ম্মের প্রাবল্যে, ভণ্ডামীর আতিশয্যে, সংসার যখন প্রেতের তাণ্ডব ভূমিতে পরিণত হইবার উপক্রম হয়, তখনই ভগবানের সিংহাসন টলিয়া থাকে, এবং ধর্ম্মরাজ্য পুনঃ সংস্থাপন, সাধুদিগের পরিত্রাণ ও লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে ভগবানের আবির্ভাব হয়। ইহাকেই অবতার-গ্রহণ বলিয়া থাকে। এই ঘোর কলিকালে ভণ্ড, বর্ব্বর ও পাষণ্ডদিগের কু-আদর্শে, ধর্ম্মের নামে যখন অধর্ম্ম, জ্ঞানের নামে অজ্ঞানতা, কর্ম্মের নামে অপকর্ম্ম ধীরে ধীরে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিল, নিরীহদিগের নির্য্যাতন হইতেছিল, সেই সময় ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শাক্যসিংহ, ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে, প্রেম ও ভক্তির স্রোতে সাধারণ লোকের মলিন অন্তর বিধৌত হইয়া, কাপট্যপূর্ণ ভণ্ডামীর স্থলে প্রকৃত প্রেম ও ভক্তির প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। অনল প্রজ্বলিত হইলে অনিল আসিয়া যেমন তাহার সহায় হয়, তেমনি ভগবানের আবির্ভাবে প্রবর্ত্তিত অভিনব ধর্ম্মের পুষ্টিসাধনকল্পে ও ভ্রান্তজীবের পারত্রিক মঙ্গল সাধন উদ্দেশ্যে নানা-স্থানে মহাপুরুষগণ ভগবানের সহচররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ভগবানের সেই সকল মানবরূপধারী অবতারের কথা এবং বঙ্গদেশে যে সকল মহা-পুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গভূমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন—তাঁহাদের পবিত্র জীবনী ও অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ লোকশিক্ষার একান্ত উপযোগী বিবেচনায় নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। পরশমণির সংস্পর্শে লৌহ যেমন সুবর্ণে পরিণত হয়, তেমনি যেখানে

ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছিল, যেখানে সতীদেবীর অঙ্গসমূহ পতিত হইয়াছিল, যেখানে দেব-ঋষিগণ পবিত্র যজ্ঞসকল সম্পন্ন করিয়াছিলেন, যেখানে ক্ষণজন্মা মহাত্মাগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানই তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তীর্থসকল সাধুসঙ্গলাভের একমাত্র উপায়। সাধুদর্শনে, সাধুস্পর্শে এবং সাধুর মুখনিঃসৃত উপদেশাবলী শ্রবণে, অন্তরের মলিনতা দূর হইয়া, চিত্তবৃত্তিসকল নির্ম্মল হয়। চিত্তবিশুদ্ধি না হইলে বিষয়াসক্তি ত্যাগ হয় না, বিষয়বাসনা ত্যাগ করিতে না পারিলে শান্তি লাভের প্রত্যাশা সুদূরপরাহত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ভক্ত অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনটী নরকের দ্বার স্বরূপ; সুতরাং ইহাদিগকে বশীভূত করিতে না পারিলে হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি মানসিক ব্যাধিসকল বিদূরিত হইবার নহে, এবং কাজে কাজেই তীর্থাদি দর্শনের ফলপ্রত্যাশাও নিতান্ত বিফল।

ভক্তিরূপ অমূল্যনিধি যাঁহাদের হৃদয় ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে, দেবতা ও মহাপুরুষদিগের লীলাক্ষেত্র এই সকল তীর্থদর্শনের লালসা তাঁহাদের অন্তরে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নরনারীগণ পুণ্যসঞ্চয়-কামনায় ধর্ম্মের পবিত্র আকর্ষণে প্রতিদিন দলে দলে তীর্থদর্শনে গমন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে পদব্রজে ও নৌকা ভিন্ন যাতায়াতের কোন উপায় ছিল না; তাহাতে এক দিকে দস্যু তস্করের ভয়, ও অপর দিকে দালাল, সেঁতুয়া ও পাণ্ডাদিগের হাতে নানাপ্রকার অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও নিগ্রহের আশঙ্কা ছিল। এখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে এই সকল অত্যাচারের ও সময়ের উভয়েরই অনেকটা লাঘবতা হইয়াছে। দ্রুতগামী রেল ও ষ্টীমারের সাহায্যে এখন অল্প সময়ে সামান্য ব্যয়ে ধনী, নির্ধন, দীন-দুঃখী, আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই অকুতোভয়ে তীর্থস্থানে গমনপূর্ব্বক বাসনা-সিদ্ধি করিতেছে।

বাল্যকাল হইতেই পৌরাণিক গল্পসকল শ্রবণলালসা আমার একান্ত বলবতী ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিয়া লিখিত ঘটনার স্থানগুলি দর্শন করিবার জন্য একটা উৎকট বাসনা অনুভব করিতাম। স্বর্গীয় পিতৃদেবের সঙ্গে একবার তীর্থস্থান দর্শনে গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু সকল স্থান দর্শন তখন ভাগ্যে ঘটে নাই। করুণাময়ের কৃপায় প্রায় দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা জনপদ, নগরী ও তীর্থস্থানাদি দর্শন জন্য বৎসরে একবার গমন করিয়া থাকি। শাস্ত্রে লিখিত আছে, ত্রিকোণ পরিমিত প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিলে মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়। আমার ইচ্ছা ছিল সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া তদ্বিবরণ পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত করিব; কিন্তু মনুষ্যজীবন ক্ষণভঙ্গুর, আমার সেই বাসনা পূর্ণ হইবার পক্ষে নানাবিধ বিঘ্নদৃষ্টে সম্প্রতি "বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ" নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রণয়ন করিলাম।

৫১টী মহাপীঠ মধ্যে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যা, যাহাকে ইতিপূর্ব্বে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী বলিত, তদন্তর্গত ২২টী মহাপীঠের বৃত্তান্ত, অপর ১০টী উপপীঠের কথা, এবং সিদ্ধ সর্ব্বানন্দদেব, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেব, স্বামী বিবেকানন্দ, বারদীর ব্রহ্মচারী, সাধক রামপ্রসাদ ও ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ১০টী সাধক ও মহাপুরুষের জীবনী এবং পূর্ণব্রহ্মের অবতার ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যাপুরী, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপ ও বুদ্ধদেব শাক্য সিংহের সিদ্ধিস্থান বুদ্ধগয়া ইত্যাদির বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বঙ্গবাসী তীর্থযাত্রীর একান্ত দর্শনীয় তীর্থরাজ পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, কাশী, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি উত্তর ভারতের যোলটী প্রধান প্রধান তীর্থস্থানের বিবরণও এই পুস্তকের পরিশিষ্ট ভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তীর্থযাত্রার বিধি, তীর্থমাহাত্ম্য, তীর্থের উৎপত্তি, ইতিহাস,

বারাহী তন্ত্রোক্ত বচনাবলী, তীর্থ গমনাগমনের ব্যয়ের বিবরণ, প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্যের কথা, ক্রিয়া-কর্ম্মের বিধান, বাসের সুবিধা-অসুবিধা, এই পুস্তকে যথাসম্ভব স্থান পাইয়াছে। তীর্থযাত্রী কিম্বা ভ্রমণকারিগণ যদি ইহা দ্বারা যৎসামান্য সাহায্যও প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেই শ্রম সার্থক মনে করিব।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমি কোন দিন সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই নাই; আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে অনেকে উহাকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াই এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করতঃ এখন পরিণাম চিন্তা করিতেছি। কলিকাতার সুবিখ্যাত স্বর্ণপ্রেস অল্প সময়ের মধ্যে এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিয়াছে। তজ্জন্য স্বর্ণপ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাড়াতাড়ি ছাপার দরুণ অনেক ভুল-প্রমাদ ঘটিয়াছে; সুধী পাঠকগণ নিজগুণে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আমার সুহৃদ বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি, এ মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কয়েকটী প্রবন্ধ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করি। শৈব্যা ও সাবিত্রী রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ রায় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। জগদীশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন। পাঠকগণের প্রীতি সম্পাদনার্থে পনরখানি হাফ্‌টোন ছবিও সন্নিবেশিত করা গিয়াছে। ইতি—

ভেলানগর—ত্রিপুরা।
১৩২০ সাল।

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়।

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট—

চিত্র-সূচী

দরবারগৃহ—কলিকাতা

বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ

তীর্থবিবরণ লিখিতে হইলেই তীর্থের উৎপত্তি, মাহাত্ম্য ও দেশের বর্ণনা করা সঙ্গত। তাই প্রথমেই বাঙ্গালার সংক্ষিপ্ত ভৌগলিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা গেল। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব প্রান্তে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ, যাহার উত্তরে তুষারমণ্ডিত হিমগিরি, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের প্রান্ত হইতে ভোটানের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত নানাবিধ মনোহর বৃক্ষরাজিপরিপূর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী হিমাদ্রি সঙ্গে মিশিয়া এক প্রাকৃতিক দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকার সৃষ্টি করিয়াছে; দক্ষিণে বঙ্গ উপসাগরের সুনীল ফেনিল অম্বুরাশি সুগভীরগর্জ্জনে বেলাভূমিতে প্রতিহত হইয়া দুর্লঙ্ঘ্য পরিখাকারে ইহাকে রক্ষা করিতেছে—যাহার পশ্চিমে বর্ত্তমান যুক্ত-প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের পর্ব্বতসঙ্কুল অনুর্ব্বরা উচ্চভূমি সরল ভাবে বিস্তৃত, তাহারই নাম বঙ্গদেশ। শাসনকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে রাজপুরুষগণ বর্ত্তমানে এই বঙ্গদেশের আকার অনেকটা খর্ব্ব করিলেও সাধারণের নিকট এই সমগ্র ভূভাগ আজও 'বঙ্গদেশ' বলিয়াই পরিচিত।

মহাভারত ইত্যাদি পুরাণ শাস্ত্রগ্রন্থেও এই বঙ্গদেশের নামোল্লেখ আছে। প্রাচীন কালের মগধ রাজ্য (বেহার), উৎকল দেশ (উড়িষ্যা), প্রাগ্‌জ্যোতিষ (গৌহাটি), কামরূপ (আসামের নিম্ন প্রদেশ), হেরম্ব (কাছাড়), মণিপুর, কমলাঙ্ক (কুমিল্লা), ত্রিপুরা, চট্টল (চট্টগ্রাম), সুহ্ম (আরাকান), পৌণ্ড্র (পাণ্ডুয়ামালদহ) এবং বঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যসকল এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের অন্তর্ভূত। এই সুবিশাল রাজ্যের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র ও তৎশাখা যমুনা, এবং গঙ্গা ও তৎশাখা পদ্মা নামক দুইটী

বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ।

বিশালকায়া পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী পৃথিবীর মেরুদণ্ডসম হিমালয় হইতে বাহির হইয়া প্রবলবেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, এবং ইহাদের স্রোতরাশি অবিরত বালুকাকণা বহিয়া সাগরগর্ভে কত শত দেশের সৃষ্টি ও বঙ্গদেশকে ক্রমোর্ব্বরা করিতেছে।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান আকার ছিল না। ঢাকা, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জিলার অধিকাংশ স্থানই বঙ্গ উপসাগরের কুক্ষিগত ছিল। "করতোয়াং সমারভ্য যাবৎ দিক্করবাসিনী"—অর্থাৎ রংপুর হইতে ত্রিপুরার পশ্চিমবর্ত্তী ভূভাগ ব্রহ্মপুত্রের প্রবল স্রোতগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। ক্রমে বালুকাকণা সম্মিলনে চর পড়ায়, পাবনা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জিলার অনেকানেক পরগণার উৎপত্তি হইয়াছে। পুরাকালে রংপুরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণেই বঙ্গ উপসাগরের মোহনা ছিল। মহাভারতের সভাপর্ব্বে দিগ্‌বিজয় পর্ব্বাধ্যায়ে এবং অর্জ্জুনের মণিপুর-প্রবেশ ইত্যাদি বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই সকল স্থান তৎকালে জলময় ছিল। উত্তর-পূর্ব্ব দিকের পর্ব্বতভূমি দ্বারাই তখন যাতায়াত হইত। মোসলমান রাজত্বের এক সময়ে ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহের উত্তরে "দশ কাহনীয়া সেরপুর" নামক স্থানে ১০ মাইল পরিসরবিশিষ্ট ছিল; নদী পার হইতে দশ কাহন কার্ষাপণ পাটুনির মজুরী ছিল বলিয়া তাহাকে অদ্যাপি "দশ কাহনীয়া সেরপুর" কহে। এই নদ বর্ত্তমানে ক্রমে ভরট হইয়া একটী সামান্য-পরিসর-বিশিষ্ট নদীতে পরিণত হইয়াছে। সেনবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বসময়ে সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জের অপর তীরবর্ত্তী কলাগাছা ও বৈদ্যের বাজারের নিকটবর্ত্তী স্থান) প্রধান বাণিজ্য বন্দর ছিল; অর্ণবপোত ইত্যাদিতে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকায় ইহাকে "গুণ বৃক্ষের নগরী" বলিত। ইতিবৃত্তলেখকগণও তদ্দক্ষিণে বঙ্গসাগর ছিল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন।

পুরাণে ব্রহ্মপুত্রনদ লৌহিত্যসাগর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা

শত যোজন বিস্তৃত ছিল। ময়মনসিংহ, পাবনা ও ত্রিপুরার কতক স্থান কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ও জলনিমগ্ন ছিল। মহাভারতীয় মহাপ্রাস্থানিক পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে, পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান কালে পৃথিবী ভ্রমণ মানসে লৌহিত্য সাগরের পার দিয়া ক্রমে দক্ষিণবাহিনী হইয়া লবণসমুদ্রের (ভারতসাগর) উত্তর তট দিয়া পশ্চিমাভিমুখে দ্বারকাপুরী ও তথা হইতে উত্তরবাহিনী হইয়া হিমালয় গমন করিয়াছিলেন। বৈদিকযুগে ভারতবর্ষই ত্রিকোণ পৃথিবী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ইহাকে জম্বুদ্বীপ অন্তর্গত ভারতবর্ষ বলিত। তন্মধ্যে যে সকল জনপদে মহাত্মাগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, যেস্থানে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিম্বা পুণ্যতোয়া নদীসকল যে স্থান হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল বা তাহাদের তীরে যে যে স্থানে দেবতা কি ঋষি প্রভৃতির আশ্রম ছিল, কিম্বা যে যে স্থানে দেবগণ ও ঋষিগণ যজ্ঞাদি করিয়াছিলেন সেই সকল স্থানই পরম পবিত্র তীর্থ বলিয়া পুরাণাদিতে বর্ণিত। এই পুরাণ-বর্ণিত পৃথিবী ভ্রমণ করা মহান্ পুণ্য কার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

তন্ত্রচূড়ামণিমহাপীঠে উল্লেখ আছে দক্ষ-প্রজাপতির শিব-বিহীন মহাযজ্ঞে সতী দেবী পতি-নিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করিলে পর মহাদেব প্রাণ-প্রতিমা প্রিয়তমা সতীর মৃত দেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতে করিতে সমস্ত পৃথিবী (ভারতবর্ষ) পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণু সেই সতীদেহ চক্রদ্বারা বিখণ্ডিত করেন। যে যে স্থানে সতী-দেহ পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানই মহাপীঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রত্যেক পীঠস্থানে বিষ্ণুচক্র-পরিক্ষত আদ্যাশক্তির নিত্য চিন্ময় দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাতে যেমন এক একটী শক্তি-স্বরূপিণী মহামায়ার আবির্ভাব হইয়াছে তদ্রূপ ভোলানাথেরও এক একটী ভৈরবমূর্ত্তি তথায় দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ ভোলানাথ জগতে সতী-প্রেমের আদর্শ শিক্ষা দিবার মানসেই যেন ত্রৈলোক্য কল্যাণজনক ভৈরবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া

তথায় বিরাজ করিতেছেন। ধন্য অত্যাশ্চর্য্য অহৈতুক এই সতীপ্রেম! যে যে স্থানে সতী-অঙ্গ পতিত হইয়াছিল তাহাকেই মহাপীঠ বলে। ইহারা হিন্দুদিগের পরম পবিত্র তীর্থ। সমস্ত ভারতবর্ষে এবম্বিধ ৫১টী মহাপীঠ আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য বারাহীতন্ত্র-লিখিত দেবীর বাক্য স্থানান্তরে উদ্ধৃত করা গেল।

তীর্থযাত্রাবিধি।

১। শুদ্ধ কালে তীর্থ দর্শন করিবার বিধান শাস্ত্রে লিখিত আছে। অশুদ্ধকালে বিশ্বেশ্বর, পুরুষোত্তম, বৈদ্যনাথ, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনাদি দেবতা দর্শন ও গঙ্গা স্নানাদি নিষিদ্ধ বটে। যাঁহারা পূর্ব্বে একবার দর্শন বা স্নানাদি করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। গয়াক্ষেত্রে পিণ্ড দিবার জন্য কালদোষের বিচার নাই, কিন্তু মহাগুরু-নিপাতে সম্বৎসর কাল গয়াতে পিণ্ড দান, গঙ্গাদি তীর্থে স্নান ও অন্যান্য তীর্থে দেবদর্শনাদি যাবতীয় কার্য্যই নিষিদ্ধ।

২। তীর্থযাত্রা করিতে হইলে যাত্রার পূর্ব্ব তৃতীয় দিবসে হবিষ্যাহারী হইয়া সংযম করিবে, যাত্রার পূর্ব্ব দিনে মস্তকের কেশাদি মুণ্ডন ও উপবাস করিবে এবং যাত্রার দিন গণপতি দেবের পূজা, আদিত্যাদি নবগ্রহের পূজা, ইষ্টদেবের পূজা ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধাদি করিয়া ব্রাহ্মণাদি ভোজনের পর আহার করিয়া শুভ লগ্নে যাত্রা করিবে।

৩। তীর্থযাত্রাকারী সর্ব্বদা সংযত থাকিবেন, ছত্র, পাদুকা ও পাল্‌কী প্রভৃতি যান-বাহন পরিত্যাগ করিবেন। পদব্রজে কষ্টপূর্ব্বক তীর্থ-

দর্শন মহা পুণ্য কার্য্য বলিয়া উক্ত আছে। দূর দেশে যাইতে হইলে নৌকা, গাড়ী ইত্যাদি দূষ্য নহে। স্ত্রীসেবা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

৪। যাহার চিত্তসংযম হইয়াছে, যাহার হস্ত-পদাদি সংযত আছে, অর্থাৎ যাচ্ঞা, অবৈধ দানগ্রহণ, কুৎসিৎ স্থানে গমন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপরিমিত আহার, ইন্দ্রিয়-সেবন, ক্রোধাদি রিপুর অপব্যবহার কার্য্যাদি হইতে যিনি বিরত আছেন, যিনি তীর্থমাহাত্ম্যাদি অবগত আছেন, তিনিই তীর্থ-ফল লাভের সম্পূর্ণ অধিকারী।

৫। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

(ক) "নৃণাং পাপকৃতাং তীর্থে
ভবেৎ পাপস্য সংক্ষয়ঃ।
যত্নক্তং ফলদং তীর্থং
ভবেৎ শুদ্ধাত্মনাম্ নৃণাম্।"

অর্থাৎ তীর্থগমনে পাপকারিদিগের পাপ ক্ষয় হয়, কিন্তু চিত্তশুদ্ধ ব্যক্তি তীর্থের সম্পূর্ণ ফলভোগী হন।

(খ) "পিণ্ডদানং তপঃ শৌচং
তীর্থসেবা শ্রুতং তথা।
সর্ব্বান্যেতস্য তীর্থানি
যদি ভাবো ন নির্ম্মলঃ॥"

অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নির্ম্মল না হইলে পিণ্ডদান, তপস্যা, শৌচ, তীর্থসেবা সমস্তই নিষ্ফল।

(গ) "যো লুব্ধঃ পিশুনঃ ক্রূরো নাস্তিকো বিষয়াত্মকঃ।
সর্ব্বতীর্থেস্বপি স্নাতঃ পাপমলিন এব সঃ।
বিষয়েম্বতি সংরাগো মানসো মল উচ্যতে॥

অর্থাৎ যিনি লুব্ধ, পিশুন, ক্রূর, নাস্তিক, বিষয়ে একান্ত আসক্ত, ইত্যাদি মানসমল দ্বারা অনুরঞ্জিত তিনি সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলেও নিষ্পাপ

হইতে পারেন না। দেহস্থিত মল দূর হইলেও মানব নির্ম্মল হইতে পারে না। অতিরিক্ত বিষয়াসক্তিকে মানস মল কহে সুতরাং তাহা হইতে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য।

৬। তীর্থসকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে ; যথা—স্থাবর, জঙ্গম ও মানস।

(ক) স্থাবর তীর্থ—অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, কাশী, কাঞ্চি, পুষ্কর, প্রভাস, কুরুক্ষেত্র, গয়া ও গঙ্গা ইত্যাদি মোক্ষধাম ও মহাপুণ্য তীর্থ সকল স্থাবরতীর্থ বলিয়া পরিচিত, কেননা এই সকল স্থানে তীর্থমাহাত্ম্য স্থানেই নিবদ্ধ।

(খ) মুনিঋষি ও ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞানে, এবং শাস্ত্রজ্ঞানানুরূপ উপদেশ দানে, উপদেশানুরূপ অনুষ্ঠানে ও আদর্শে মানবগণের মনের মালিন্য দূর করেন বলিয়া তাঁহারা জঙ্গম তীর্থ নামে খ্যাত। অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেশ পালন এবং নির্ম্মলচিত্ত সাধু ব্রাহ্মণদের উপদেশ শ্রবণ ও তাহাদের সদনুষ্ঠানাদি অনুকরণাদিই জীবন্ত তীর্থ।

(গ) মানস তীর্থ যথা—সত্য, শৌচ, সর্ব্বভূতে দয়া, সারল্য, সংযম, ইন্দ্রিয়াদি দমন, সন্তোষ, ক্ষমা, চিত্তশুদ্ধি। ইহাদিগকে ভৌমতীর্থও কহে। যিনি এই সব তীর্থে স্নাত অর্থাৎ এবম্বিধ গুণসম্পন্ন হন তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন।

৭। তীর্থে গমনপূর্ব্বক তীর্থ ও তীর্থাধিষ্ঠিত দেবতার দর্শন, স্পর্শন, পূজা, প্রণাম, প্রদক্ষিণ, স্তোত্রাদি পাঠ, দান, ধ্যান, তীর্থ জলে স্নান, সংকল্প, তর্পণ, পিতৃলোকের কার্য্য, ব্রাহ্মণাদি ভোজন, দরিদ্র সেবা, সৎকথা শ্রবণ, সত্য ভাষণ, সর্ব্বথা মিথ্যা পরিহার পূর্ব্বক সাধ্যমত পরোপকার ইত্যাদি সদনুষ্ঠান করিতে হয় এবং পরের পীড়াদায়ক কোন কার্য্য করিতে নাই। হিংসাদি পরিবর্জ্জিত হইয়া যিনি তীর্থভ্রমণ করিতে পারেন তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে পরমপদ লাভ করেন।

মহাপীঠ

বাঁরাহী তন্ত্রোক্ত বচনাবলি।

ব্রহ্মরন্ধ্র হিঙ্গুলায়াং ভৈরবো ভীমলোচনঃ।
কোট্টরী সা মহামায়া ত্রিগুণা যা দিগম্বরী॥ ১
করবীরে ত্রিনেত্রং মে দেবী মহিষ-মর্দ্দিনী।
ক্রোধীশো ভৈরবস্তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥ ২
সুগন্ধায়াং নাসিকা মে দেবস্ত্রম্ব্যক ভৈরবঃ।
সুন্দরী সা মহাদেবী সুনন্দা তত্র দেবতা॥ ৩
কাশ্মীরে কণ্ঠদেশঞ্চ ত্রিসন্ধ্যেশ্বর ভৈরবঃ।
মহামায়া ভগবতী গুণাতীতা বরপ্রদা॥ ৪
জ্বালামুখ্যাং মহাজিহ্বা দেব উন্মত্ত ভৈরব অম্বিকা সিদ্ধিদানাম্নী॥ ৫
স্তনং জলন্ধরে মম ভীষণো ভৈরবস্তত্র দেবী ত্রিপুরমালিনী॥ ৬
হৃদ্যপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ দেবতা জয়দুর্গাখ্যা॥ ৭
নেপালে জানু মে শিব কপালী ভৈরব শ্রীমান্ মহামায়া চ দেবতা॥ ৮
মানসে দক্ষহস্তো মে দেবী দাক্ষায়ণী হর।
অমরো ভৈরবস্তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥ ৯
উৎকলে নাভিদেশস্তু বিরজা ক্ষেত্রমুচ্যতে।
বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ॥ ১০
গণ্ডক্যাং গণ্ডপাতশ্চ তত্রসিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ।
তত্র সা গণ্ডকী চণ্ডী চক্রপাণিস্তু ভৈরবঃ॥ ১১
বহুলায়াং বামবাহুর্ব্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরবো দেবঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥ ১২

উজ্জয়িন্যাং কুর্পরঞ্চ মাঙ্গল্যঃ কপিলাম্বরঃ।
ভৈরবঞ্চ সিদ্ধিদঃ সাক্ষাদ্দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা॥ ১৩
চট্টলে দক্ষবাহুর্মে ভৈরব শ্চন্দ্রশেখরঃ।
ব্যক্তবাপা ভগবতী ভবানী তত্র দেবতা।
বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে॥ ১৪
ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরসুন্দরী।
ভৈরব স্ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ॥ ১৫
ত্রিস্রোতায়াং বামপাদো ভ্রামরী ভৈরবোঽম্বরঃ॥ ১৬
যোনীপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা।
যত্রাস্তে মাধবঃ সাক্ষাদুমানন্দোঽথ ভৈরবঃ।
সর্ব্বদা বিহরেদ্দেবী তত্র মুক্তির্ন সংশয়ঃ।
তত্র শ্রীভৈরবী দেবী তত্র নক্ষত্র দেবতা।
প্রচণ্ড চণ্ডিকা তত্র মাতঙ্গী ত্রিপুরাম্বিকা
বগলা কমলা তত্র ভুবনেশী সুধূমিনী।
এতানি বর পীঠানি শংসন্তি বর ভৈরব।
এবং তা দেবতাঃ সর্ব্বা এবং তে দশভৈরবাঃ।
সর্ব্বত্র বিরলার্চাহং কামরূপে গৃহে গৃহে।
গৌরীশিখরমারুহ্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।
করতোয়াং সমারভ্য যাবদ্দিক্করবাসিনী।
শত যোজন বিস্তারং ত্রিকোণং সর্ব্বসিদ্ধিদং।
দেবা মরণমিচ্ছন্তি কিং পুনর্ম্মানবোদয়ঃ॥ ১৭
অঙ্গুলীবৃন্দং হস্তস্য প্রয়াগে ললিতাভবঃ॥ ১৮
জয়ন্ত্যাং বাম জঙ্ঘাচ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বরঃ॥ ১৯
ভূতধাত্রী মহামায়া ভৈরব ক্ষীরকণ্ঠকঃ।
যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠং পাদোমম॥ ২০

বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ।

নকুলীশ কালী পীঠে দক্ষপাদাঙ্গুলীষুচ।
সর্ব্বসিদ্ধিকরী দেবী কালিকা তত্র দেবতা॥ ২১
ভুবনেশী সিদ্ধিরূপা কিরীটস্থা কিরীটতঃ।
দেবতা বিমলা নাম্নী সম্বর্ত্তো ভৈরবস্তথা॥ ২২
বারাণস্যাং বিশালাক্ষী দেবতা কালভৈরবঃ।
মণিকর্ণীতি বিখ্যাতা কুণ্ডলঞ্চ মমশ্রুতেঃ॥ ২৩
কান্যাশ্রমে চ মে পৃষ্ঠং নিমেষো ভৈরবস্তথা
সর্ব্বানী দেবতা তত্র॥ ২৪
কুরুক্ষেত্রে চ গুল্ফতঃ স্থাণুনাম্নী চ সাবিত্রী অশ্বনাথস্তু ভৈরবঃ॥ ২৫
মণিবন্ধে চ গায়ত্রী সর্ব্বানন্দস্তু ভৈরবঃ॥ ২৬
শ্রীশৈলে চ মম গ্রীবা মহালক্ষ্মীস্তু দেবতা।
ভৈরবঃ সম্বরানন্দো দেশে দেশে ব্যবস্থিতঃ॥ ২৭
কাঞ্চীদেশে চ কঙ্কালো ভৈরবঃ রুরুনামকঃ
দেবতা দেবগর্ব্ভাখ্যা॥ ২৮
নিতম্বং কালমাধবে ভৈরবশ্চাসিতাঙ্গশ্চ দেবী কালী সুসিদ্ধিদা।
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা নমস্কৃত্য মন্ত্রসিদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ॥ ২৯
শোনাখ্যো ভদ্রসেনস্তু নর্ম্মদাখ্যা নিতম্বকে॥ ৩০
রামগিরৌ তথা নালা শিবানী চণ্ড ভৈরবঃ॥ ৩১
বৃন্দাবনে কেশ জাল উমানাম্নী চ দেবতা।
ভূতেশো ভৈরব স্তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥ ৩২
সংহারাখ্যা ঊর্দ্ধদন্তো দেবী নারায়ণী শুচৌ॥ ৩৩
অধদন্তো মহারুদ্রো বারাহী পঞ্চসাগরে॥ ৩৪
করতোয়াতটে তল্পং বামে বামন ভৈরবঃ।
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা॥ ৩৫
শ্রীপর্ব্বতে দক্ষগুল্ফঃ তত্র শ্রীসুন্দরী পরা।

সর্ব্বসিদ্ধিকরী সর্ব্বা স্বনন্দা নন্দ ভৈরবঃ॥ ৩৬

কপালিনী ভীমরূপা বামগুল্‌ফং বিভাসকে।

ভৈরবশ্চ মহাদেব সর্ব্বসিদ্ধ শুভপ্রদঃ॥ ৩৭

উদরঞ্চ প্রভাসে মে চন্দ্রভাগা যশস্বিনী বক্রতুণ্ডো ভৈরব॥ ৩৮

ঊর্দ্ধোষ্ঠো ভৈরবপর্ব্বতে অবন্ত্যাঞ্চ মহাদেবীলম্বকর্ণস্তু ভৈরবঃ॥ ৩৯

চিবুকে ভ্রামরী দেবী চিবুকাখ্যা জলে স্থলে।

ভৈরব সর্ব্বসিদ্ধীশ স্তত্র সিদ্ধিবনুত্তমা॥ ৪০

গণ্ডো গোদাবরীতীরে বিশ্বেশী বিশ্বমাতৃকা।

দণ্ডপাণি ভৈরবস্তু বামগণ্ডে তুরাকিনী।

ভৈরব বৎসনাভস্তু তত্র সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ॥ ৪১

রত্নবল্যাং দক্ষস্কন্ধঃ কুমারী ভৈরবঃ শিবঃ॥ ৪২

মিথিলায়াং উমাদেবী বামস্কন্ধো মহোদরঃ॥ ৪৩

নলহাট্টাং নলাপাতো যোগেশো ভৈরবস্তথা।

তত্র সা কালিকা দেবী সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িকা॥ ৪৪

কর্ণাটে চৈব কর্ণং মে অভীরুর্নাম ভৈরবঃ।

দেবতা জয়দুর্গাখ্যা নানাভোগপ্রদায়িনী॥ ৪৫

বক্রেশ্বরে মনঃপাতো বক্রনাথস্তু ভৈরবঃ।

নদী পাপহরা তত্র দেবী মহিষ-মর্দ্দিনী॥ ৪৬

যাশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী

চণ্ডশ্চ ভৈরব স্তত্র যত্র সিদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ॥ ৪৭

অট্টহাসে চৌষ্ঠপাতো দেবী সা ফুল্লরা স্মৃতা।

বিশ্বেশো ভৈরব স্তত্র সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ॥ ৪৮

হারপাতো নন্দীপুরে ভৈরবঃ নন্দিকেশ্বরঃ।

নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ॥ ৪৯

লঙ্কায়াং নূপুরঞ্চৈব ভৈরবো রাক্ষসেশ্বরঃ।

ইন্দ্রাক্ষি দেবতা তত্র ইন্দ্রেনোপাসিতা পুরা ॥ ৫০
বিরাটদেশমধ্যেতু পাদাঙ্গুলী নিপাতনং।
ভৈরবশ্চামৃতাখ্যশ্চ দেবী তত্রাম্বিকা স্মৃতা ॥ ৫১
অত্রান্তে কথিতা পুত্র পীঠনাথাদি দেবতাঃ।
ক্ষেত্রাধীশং বিনা দেব পূজয়েচ্চন্য দেবতাং।
ভৈরবৈ হ্রিয়তে সর্ব্বং জপ পূজাদি সাধনং।
অজ্ঞাত্বা ভৈরবপীঠং পীঠশক্তিঞ্চ শঙ্কর।
প্রাণনাথ ন সিধ্যেস্তু কল্প কোটি জপাদিভিঃ ॥

ইতি তন্ত্রচূড়ামণি পীঠ নির্ণয়ে।

উপরোক্ত মহাপীঠের মধ্যে বঙ্গদেশে যে সকল মহাপীঠ আছে এবং যাহার অনুসন্ধান সুচারুরূপে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার একটী সূচীপত্র প্রদত্ত হইল। পীঠের অধিষ্ঠাতা ভৈরব এবং পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ও তত্ত্ব না জানিয়া মহাপীঠ স্থানে নিজ ইষ্টদেবতার উপাসনা করিলে কোটী কল্প কাল ব্যাপিয়া জপাদির অনুষ্ঠানেও সাধকের সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই—এমত তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। মহাপীঠ ব্যতীত যে সকল সিদ্ধ পীঠ ও মহাত্মাগণের জন্ম স্থান ও পুণ্যতোয়া নদী সকল অবস্থিত আছে ও যথায় যথায় অবতারের আবির্ভাব হইয়াছিল সেই সকল স্থানের বিবরণই এই আখ্যায়িকায় লিপিবদ্ধ করা গেল।

GOVERNMENT LIBRARY * Cooch Behar *

ত্রিপুরাসুন্দরী

বা

দিক্করবাসিনী কালী।

"ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরসুন্দরী।
ভৈরব ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ॥"

ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে যে পর্ব্বতমালা উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিয়া ব্রহ্মদেশের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছে, ঐ সকল পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী কতক স্থানকে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা বা স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য কহে। ইহার উত্তরে কাছাড় ও শ্রীহট্ট, পূর্ব্বে লুসাই প্রদেশ, দক্ষিণে চট্টগ্রাম, পশ্চিমে শ্রীহট্ট, ব্রিটিশ ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জিলা। দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী চট্টগ্রাম পর্ব্বত মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। অতি প্রাচীনকালে দেবী ত্রিপুরা-রাজবংশের মহারাজ ধন্যমাণিক্য কর্ত্তৃক আনীত হইয়া তদীয় রাজধানী উদয়পুরে স্থাপিত হইয়াছিলেন। মহারাজ ধন্যমাণিক্য তাঁহার সেবার জন্য নানা সুনিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন। তদনুসারে সমারোহে দৈনন্দিন পূজাদি অদ্যাপি নির্ব্বাহিত হইতেছে। ইহার স্থাপয়িতা ত্রিপুর রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লেখা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করিয়া সে বিষয়েও কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

ত্রিপুরা অতি প্রাচীন রাজ্য। ভারতে যে সমস্ত হিন্দু নরপতিগণের রাজ্য বর্ত্তমান আছে, তাহাদের সকলেরই কালক্রমে পূর্ব্ব হইতে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু ত্রিপুররাজ্যের পরিসর ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও ইহার প্রাচীনত্ব কিম্বা রাজবংশের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। চন্দ্রবংশাবতংশ মহারাজ যযাতি তাঁহার পাঁচ পুত্র মধ্যে যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য ও অনুকে

অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকেই সাম্রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। পরিত্যক্ত পুত্রগণমধ্যে মহা বলশালী দ্রুহ্য কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে হস্তিনা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া কিরাত দেশীয় রাজন্যবৃন্দকে পরাজিত করতঃ এই নূতন রাজ্য সংস্থাপন করেন। মহারাজ দ্রুহ্যের ত্রিপুর নামে এক বিক্রমশালী পুত্র জন্মে, তিনি মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া নানাবিধ বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং নিজ নামানুসারে রাজ্যের নামানুকরণ করিয়াছিলেন। তদবধি যুগযুগান্তর পর্য্যন্ত সেই নামেই বর্ত্তমান থাকিয়া হিন্দু সমাজের গৌরব স্বরূপ স্বাধীন ত্রিপুরার রাজবংশ, ক্ষত্রকুলোচিত ক্রিয়াকলাপ, আচার-নীতি ও ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বে দিগ্‌বিজয়-পর্ব্বাধ্যায়ে এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রে ত্রিপুর রাজ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহার প্রাচীনত্ব বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

পুরাকালে এই রাজ্য অতি বিস্তৃত ছিল। উত্তরে কাছাড় হইতে দক্ষিণে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ত্রিপুর রাজ্যের শাসনাধীন ছিল। কথিত আছে প্রবল পরাক্রান্ত ত্রিপুররাজ মহারাজ ত্রিলোচন দক্ষিণে আরাকান রাজ্য ও পশ্চিমে গঙ্গানদীর তট পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ এক সময়ে জয় করিয়া, আপন নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য একটী অব্দ প্রচলিত করেন; অধুনা তাহাই ত্রিপুরাব্দ বলিয়া প্রচলিত। ইহা বাঙ্গালা সন হইতে তিন বৎসর প্রাচীন। মহারাজ ত্রিলোচনের ত্রিনেত্র ছিল। কুলাচার মতে রাজ্যাভিষেক সময়ে অদ্যাপি মহারাজগণের ললাটে একটী করিয়া অতিরিক্ত নেত্র অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে এবং শালগ্রাম শিলার উপর সিংহাসন স্থাপন করিয়া তদুপরি অভিষেক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। ত্রিপুররাজবংশ শৌর্য্যে বীর্য্যে চন্দ্রবংশীয় নরপতিদিগের ন্যায়ই বীরত্ব প্রদর্শনে রাজ্য শাসন করিতেন; এক সময়ে গৌরেশ্বরের প্রবল পরাক্রান্ত এক সৈন্যবাহিনী ত্রিপুর রাজ্য মথিত করিবার উদ্যম করিলে তৎকালীন রাজ্ঞী সেনাপতিগণকে আহ্বান করিয়া স্বয়ং হস্তী আরোহণে রণবেশে

যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া ভীষণ সংগ্রামে রণক্ষেত্রে শত্রু বিনাশপূর্ব্বক বিজয়মাল্যে সুশোভিতা হইয়াছিলেন। ত্রিপুররমণীর এই বীরত্বগাথার ন্যায় বীরত্বকাহিনী সমস্ত হিন্দুস্থানেও ২।৩টীর অধিক দৃষ্ট হয় না।

ত্রিপুরা-রাজবংশে ধর্ম্মমাণিক্য নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি প্রকৃতই ধর্ম্মের অবতার ছিলেন। তাঁহার রাজত্বসময়ে নানাবিধ সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, কুমিল্লা সহরে সুবৃহৎ ধর্ম্মসাগর নামক দীর্ঘিকা বহু অর্থব্যয়ে দুই বৎসরে তাঁহার আজ্ঞায় খনিত হইয়াছিল। তিনি বঙ্গের তাৎকালিক মুসলমান রাজধানী সুবর্ণগ্রাম আক্রমণপূর্ব্বক সুলতান আবুল আহাম্মদ সাহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং সুবর্ণগ্রাম লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্নের সহিত প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মহারাজ ধন্য মাণিক্য চতুর্দ্দশ শকাব্দাতে পৈত্রিক সিংহাসনে আরূঢ় হন। তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া চট্টলাচলের নিভৃত অরণ্যমধ্যে লুক্কায়িত দেবী ত্রিপুরা সুন্দরীর আবিষ্কার করেন। আপন রাজধানী উদয়পুর মধ্যে আনিয়া ইঁহাকে স্থাপন করিয়া ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির নির্ম্মাণ ও এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করিয়া দেন। কালক্রমে উদয়পুর রাজধানী পরিত্যক্ত হইলে আগরতলায় রাজধানী আনীত হয়। ত্রিপুরা রাজবংশ দানশীলতাগুণে বিখ্যাত। মহারাজদিগের প্রদত্ত কত দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর জমী ও দেবালয়, বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা—ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জিলায় অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের গৌরব ও দানশীলতার পরিচয় দিতেছে।

১২৭২ ত্রিপুরা অব্দে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর রাজাসনে আরূঢ় হন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে আত্ম-কলহ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার রাজত্বের উত্তরাধিকারী নির্ণয় নিমিত্ত ব্রিটিশ বিচারাদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। মোগল বাদশাহগণের সময় হইতে ত্রিপুর রাজ্যের সীমানা নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। পর্ব্বতের নিম্নস্থ পরগণাসকল চাকলা রোসেনাবাদ নামে একটী স্থায়ী করদ রাজ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত

হয় এবং পর্ব্বতভূমি স্বাধীন রাজ্যরূপে মহারাজের সর্ব্বপ্রকার শাসনাধীনে থাকে। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীনেও সেই নিয়মই অত্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ইংরাজী, বাঙ্গালা, পারসী প্রভৃতি নানাবিধ ভাষায়, এবং সঙ্গীত, শিল্প, চিত্র প্রভৃতি যাবতীয় বিত্যায় অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়েই ব্রিটীশ রাজ্যের অনুকরণে রাজত্বের আইন কানুন, আফিস অফিসর ইত্যাদি সমস্ত সংস্কৃত হয়, এবং আগরতলা রাজধানীর অধীনে শাসন কার্য্য সুচারুরূপ পরিচালন জন্য কৈলা সহর, উদয়পুর, সোণামুড়া, বিলুনীয়া নামে চারিটী সবডিবিসন হয় ও তথায় উপযুক্ত রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়। রাজস্ব, সিভিল, মিলিটরী, পুলীশ, আবকারী, মেডিকেল, শিক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় বিভাগই বর্ত্তমান আছে। এতদ্ভিন্ন মন্ত্রি-আফিসে, সর্ব্বোচ্চ বিচারাদালতে এবং দরবারে সমস্ত রাজকার্য্যের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। বর্ত্তমান রাজ্যেশ্বর পঞ্চশ্রী শ্রীযুৎ মহারাজ বীরেন্দ্র-কিশোর মাণিক্য বাহাদুর। ইনি বয়সে প্রবীণ না হইলেও বিত্যা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় রাজ্যের যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই রাজ্যের আয় বিশ লক্ষেরও উপর। রাজ্যের পরিমাণ ৪০৮৬ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ১৬৭৪৪১।

কথিত আছে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে রাজবংশীয় কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর নামক এক ব্যক্তি তাড়িত হইয়া ত্রিপুর রাজ্যের কোনও সীমান্তর্ব্বর্ত্তী স্থানে বানাংইথংঙ্গি নামক কুকী রাজের আশ্রয়ে যাইয়া তাহার সহিত মিত্রতা করেন এবং রাজ্যের অনিষ্ট সাধন মানসে মহারাজের জমিদারী খণ্ডল পরগণায় পর্ব্বতনিবাসী অসভ্য উলঙ্গ দুর্দ্ধর্ষ কুকীগণ দ্বারা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে শীত ঋতুতে মুন্সীরখীল বাজারে সন্নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে এমন লোমহর্ষণ ভীষণ অত্যাচার করেন যে, সে কাহিনী শ্রবণ করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। পর্ব্বত হইতে প্রায় পাঁচ শত কুকী নানাবিধ অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ

আক্রমণ করতঃ নিরীহ নিরাশ্রয় প্রজাদিগকে নির্দ্দয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক হত্যা করে। ইহারা পনর থানা গ্রামের অধিবাসী, গো, মহিষ ইত্যাদি জীবকে অকাতরে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া অগ্নিসংযোগে গৃহাদি বিনষ্ট করত স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস পত্র সহ অসংখ্য রমণীগণকে, তাহাদের শিশু সন্তানগণকে চক্ষুর সম্মুখে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া, পশুপালের ন্যায় বন্ধন করত আপন রাজ্যে লইয়া গিয়াছিল। সেজন্য ঐ স্থানটীকে অদ্যাপি কুকীকাটা খণ্ডল কহে। এই নৃশংস ব্যাপার শেষ হইলে ভবিষ্যতে সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ও ত্রিপুর রাজ দরবার হইতে সৈন্যের গারদ নিযুক্ত হইয়াছিল। কালে সমস্তই লয় পায়। উক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর শেষ জীবনে কুকীরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাধীন ত্রিপুরায় একছরীর পুর্ব্বে সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া চাকমা, রিয়াং প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত জুমিয়া প্রজা বসাইয়া একটী পরগণা বিনা রাজস্বে নিজেই ভোগ দখল করিতেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকার কালে এই ভীষণ প্রকৃতির ঠাকুরকে বশে আনিয়া তাঁহার রাজস্ব নির্দ্ধারণ জন্য, মন্ত্রীপ্রবর ঠাকুর দীনবন্ধু নাজীর সাহেব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি এই কার্য্যে বৃত হইয়াছিলাম। আমার সাহায্য জন্য শ্রী শ্রীযুত সাক্ষাতের অনুজ্ঞাক্রমে গোরখা সেনানায়ক দলবীর সীং সুবেদার একদল সৈন্যসহ আমার অনুগমন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন এরাজ্যের বন্দুকধারী পুলীশ কনেষ্টবলও কতিপয় আমার সঙ্গে গিয়াছিল। আমরা একটী ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী সাজাইয়া সুদূর পর্ব্বতপ্রান্তে গিয়াছিলাম।

পাঠকগণের মধ্যে ফেণী নদীর নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। আসাম বেঙ্গল রেল লাইনে চট্টগ্রাম যাইতে এই নদীর উপর এক সুদীর্ঘ লৌহ সেতু দৃষ্ট হয়। বৈশাখ মাসের শেষে আমরা নৌকাযোগে এই ফেণী নদীর পথে সেই দুর্গম স্থানে যাইবার জন্য যাত্রা করিলাম। প্রথম দিন মনু নামক ছড়া নদীর মুখে নৌকার বহর নঙ্গর করিয়া রহিল। নৌকাগুলি
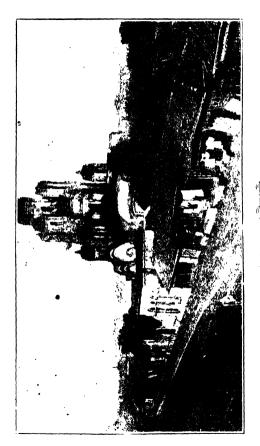
পুরাতন কালীবাড়ী

বঙ্গদেশীয় নৌকা নহে, ইহা বৈদিক যুগের উড়ুপ। পর্ব্বতজাত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ক্ষোদিয়া ইহা প্রস্তুত হয়, প্রস্থে ৪।৫ ফিট, দীর্ঘে ৩০ ফিটেরও উর্দ্ধে, অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ ক্রমে সূক্ষ্ম, উপরে দরমার সামান্য ছাপর আছে, পর্ব্বতাঞ্চলেই এসব নৌকার প্রচলন সমধিক, ইহাদিগকে লঙ্গ নৌকা বলে। প্রত্যেক নৌকায় ৩।৪ জন লোকের অধিক থকিতে পারে না। পর দিবস সমস্ত দিনে সবরুং নামক থানায় উপস্থিত হই, তথাকার পুলীশ কার্য্যকারক আমাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আতিথ্য-সৎকারে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

ফেণী নদী ত্রিপুর রাজ্যকে ব্রিটীশ শাসনাধীন "হিলট্রেকট্ চট্টগ্রাম" হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। আমরা এই নদীপথে গোরাকাপা নামক স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম, তথায় মহারাজা বাহাদুরের একটী পুলীশ ষ্টেসন আছে। তথাকার চাক্মা সরদার আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া স্থান দিয়াছিলেন, এবং আহারের জন্য সরু চাউল, কুমর ও কচু প্রভৃতি তরকারী, মহিষের দুগ্ধ ও দধি ইত্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করিয়াছিলেন। আমাদের সঙ্গেও প্রচুর আহার্য্য সামগ্রী ছিল, তথাপি মহারাজের লোক বলিয়া এইরূপ আতিথ্য সৎকারের হাত হইতে নিস্তার পাই নাই। চাক্মা সরদার ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের প্রজা। এথান হইতে নৌকা বিদায় দিয়া আমাদিগকে পদব্রজে যাইতে হইবে। কুলীসংগ্রহের জন্য একদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এথানে অর্থ দ্বারায় কুলী পাওয়া যায় না। জুমিয়া প্রজা ভিন্ন অন্য প্রজা নাই। জঙ্গল কাটিয়া অগ্নি সংযোগে পোড়াইয়া ফেলিয়া দাঁর সাহায্যে ধান্য, তিল, কার্পাস ইত্যাদির বীজ রোপণপূর্ব্বক যে শস্য উৎপাদন করা হয় তাহার নাম জুম কৃষি। যাহারা এই জুমক্ষেত্র করে তাহাদিগকে জুমিয়া কহে। উহারা স্বামী স্ত্রীতে এক পরিবার বা ঘর বলিয়া কথিত হয়। ভূমির পরিমাণ নাই ; এক পরিবারে গাছ জঙ্গল কাটিয়া যত ইচ্ছা কৃষি উৎপন্ন করিতে পারে ;—কেবল ঘরচুক্তি নির্দ্দিষ্ট একটী

জমা দিতে হয়। ইহারা নানা জাতিতে বিভক্ত—যথা, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, ত্রিপুরা, রিয়াং ও কুকী। ত্রিপুরাগণ অপেক্ষাকৃত নম্রস্বভাব, প্রথম তিন শ্রেণীতে ইহারা বিভক্ত; রিয়াং জাতি উগ্রপ্রকৃতি, উহারা অর্দ্ধউলঙ্গ; চাক্‌মা ও মগগণ পার্ব্বত্য ত্রিপুরার স্থায়ী অধিবাসী নহে; উহারা সময় সময় চট্টগ্রামের পাহাড় হইতে জুমের কৃষি করিবার জন্য আসিয়া থাকে। মণিপুরী নামক এক জাতি আছে তাহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ও অনেকাংশে সভ্য। কুকীরা সর্ব্বদা উলঙ্গ থাকে ও আম মাংস ভোজন করে। ইহারা পর্ব্বত হইতে নীচে আসিতে হইলে একটা কাপড় দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করিয়া থাকে। এই কুকীজাতি মহারাজকে নির্দ্দিষ্ট কোন কর দেয় না; মহারাজ বাহাদুরের আদেশ সর্ব্বথা মান্য করিয়া সময় সময় নজর ও উপঢৌকন দেয়। প্রয়োজন মতে কুলীর কার্য্যও করিয়া থাকে। উহারা বড়ই দুর্দ্দান্ত! প্রাণের ভয় নাই, যুদ্ধ বিদ্যাদিতে অভ্যস্ত। কুকী প্রদেশে প্রজাদিগের ঘন বসতি নাই, ৮।১০ মাইল অন্তর এক একটী পল্লী আছে, তথায় একজন সরদারের অধীনে অনেকগুলি করিয়া জুমিয়া প্রজা বাস করে। সরদারের নামানুসারে পল্লীর নাম হয়। ইহারা ঘরের মধ্যে ৪।৫ ফিট উচ্চ বাঁশের মাচা বাঁধিয়া তদুপরি বাস করিয়া থাকে, বংশনির্ম্মিত ঘরগুলি ছন ও পাতা দ্বারায় ছানী দিয়া থাকে। রাজকার্য্য উপলক্ষে যখন কুলীর দরকার হয়, তখন প্রত্যেক পল্লী হইতে মজুর সংগ্রহ করা হয়। উহারা এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে দ্রব্য সামগ্রী পিঠে করিয়া বহিয়া নিয়া পঁহুছাইয়া দিয়া থাকে। আমাদের জন্যও নিকটবর্ত্তী প্রথম পল্লী হইতে প্রয়োজন মত কুলী সংগ্রহ করিতে হইল। আমরা ১০ টার মধ্যে আহারাদি সমাপন করিয়া মাল পত্র কুলীগণের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া রওনা হইলাম।

প্রথম বয়স—নব উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া দলবল সহ চলিতে আরম্ভ করিলাম। বেলা যখন প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, তখন নিবিড় অরণ্য

মধ্যে প্রবেশ করিলাম। অরণ্যমধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া ক্রমে চলিতে লাগিলাম। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, তৃষ্ণা হইলে জল পানের উপায় নাই, সেই জনশূন্য, জলশূন্য অরণ্যের মধ্য দিয়া আমরা অবিশ্রান্ত চলিতেছি। বড়ই গভীর অরণ্য, ভয়ঙ্কর পথ। দুইধারে ঘনসন্নিবিষ্ট, অসূর্য্যম্পশ্য, মেঘমালাবৎ তমোময় অরণ্যতলের মধ্যে হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুনিচয় সদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে,—এইরূপ আভাস পাইতে লাগিলাম। ক্রমেই গতি হ্রাস হইতে লাগিল, পার্ব্বত্য বন্ধুর পথ যেন নিতান্ত কষ্টকর বোধ হইল। চতুর্দ্দিকে গাঢ় জঙ্গল,—কেবল গাছ, বাঁশ, ঝোপ ইত্যাদি! যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সে দিকই গভীর বনে পরিপূরিত। পথগুলি ভাল নহে, সর্ব্বদা লোক চলাচল নাই, জুমিয়া প্রজাগণের উৎপন্ন শস্যাদি দূরবর্ত্তী বাজারসমূহে নীত হইবার জন্য সামান্য যা কিছু বন্য রাস্তা মাত্র।

একান্ত ক্লান্ত হইয়া একটী বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রামার্থ সকলে উপবেশন করিলাম। তৃষ্ণায় যেন বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। পথিপার্শ্বে ছোট ছোট আমলকী বৃক্ষে ফল রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া তাহাদের কতক উদরসাৎ করিলাম; সঙ্গীয় একজন ভৃত্য অনুসন্ধান করিয়া ঝরণা হইতে জল আনিয়া দিল, পান করিয়া দেখি মিশ্রির সরবৎতুল্য মিষ্ট। আমলকী সেবন করিয়া জল পান করিলে সে জল চিনির সরবৎ হইতেও মিষ্ট বোধ হয়। তখনই পুরাণাদির বর্ণিত যোগীঋষিবৃন্দের কথা মনে পড়িল। সারাদিন তপস্যা করিয়া অনেকে কেবল মাত্র আমলকী ফল সেবন করিয়াই প্রাণ ধারণ করিতেন। সে পর্ব্বতময় প্রদেশে জনমানবের সমাগম নাই, কোন কোলাহল নাই; নিবিড় নিস্তব্ধতায় পূর্ণ। মধ্যে মধ্যে বৃক্ষারূঢ় বিহঙ্গকুলের সুললিত কাকলি ধ্বনিতে সংসারের অনিত্যতা জানাইয়া যেন বৈরাগ্যের উদ্রেক করিয়া দেয়; বোধ হয় মুনিগণ এই জন্যই তপস্যার নিমিত্ত এরূপ নিভৃত গিরিকন্দরে স্থান নির্ব্বাচন করিতেন। কতক্ষণ

বিশ্রামসুখ উপভোগ করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম এবং সারাদিন হাঁটিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটী পল্লীতে আশ্রয় লইলাম।

আমাদিগকে পল্লীতে পঁহুছাইয়া সঙ্গীয় কুলীগণ অন্তর্ধান হইল। আমাদের রাত্রিবাসের জন্য অধিবাসীরা কয়েকটী কুটীর ছাড়িয়া দিল। সঙ্গে আহার্য্য ছিল, যাহা পাক হইল তাহাই সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর অমৃতবোধে আহার করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলাম। পরদিন জাগ্রত হইয়া দেখি সূর্য্যদেব পূর্ব্ব আকাশে উদিত হইয়াছেন—কিন্তু চতুর্দ্দিক গাঢ় কুয়াশাবৃত হওয়ায় ভালরূপে কিরণজাল বিকীর্ণ করিতে পারিতেছেন না। গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক সকাল সকাল রান্না প্রস্তুতের জন্য আদেশ দিয়া পল্লীটী ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া লইলাম। তৎপর কুলী সংগ্রহের জন্য সিপাহী মোতায়েন করিয়া স্নানে গেলাম এবং দেড় প্রহরের মধ্যেই আহারাদি সমাপন করিয়া পূর্ব্ব দিনের ন্যায় পদব্রজে রওনা হইলাম। ক্রমে চারিদিবসে পর্ব্বতের বহুদূর আসিয়া পড়িলাম। এখানে প্রস্তরের সংখ্যা অধিক, ছোট ছোট গাছ বড় নাই, বড় বড় বৃক্ষ যেন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, কোন কোন বৃক্ষ বিবিধ লতা পাতায় বেষ্টিত এবং তাহা দ্বারাই পর্ব্বতভূমি সমাচ্ছাদিত। পথ ভাল নাই, অনেক সময় ২।১ ঘণ্টা কেবল পর্ব্বত নিসৃত ছড়া (নালাবিশেষ) পথে জল ভাঙ্গিয়াই চলিতে হইয়াছিল। পাঠক! আপনারা সেই বহু পরিসর ফেণী নদী দেখিয়াছেন কিম্বা অনেকে তাহার নাম অবশ্যই শুনিয়াছেন, আমরা পাঁচদিনে সেই নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলাম। ইহা এত অল্পপরিসর যে লোকে অনায়াসে উল্লম্ফন করিয়া যাইতে পারে। এই ফেণী নদী ও কুমিল্লা সহরের নিম্নের গোমতী নদী একই পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়াছে; ক্রমে পর্ব্বতস্থ অসংখ্য ঝরণা ও ছড়ার সহিত মিলিত হইয়া সমতলভূমিতে বৃহদাকার ধারণ করিয়া নদীতে পরিণত হইয়াছে। আমরা সমস্ত দিন হাঁটিয়া গন্তব্যস্থান সেই বিখ্যাত

কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুরের পল্লীতে উপস্থিত হইলাম। আমাদের বাসার জন্য কয়েক খানা কুর্চ্চা পাতার ছানী দেওয়া, বাঁশের মাচাবিশিষ্ট ঘর নির্দ্দিষ্ট হইল। আমরা কয়েকদিন এখানে থাকিয়া নিভৃত অরণ্যবাসের প্রকৃত আস্বাদ পাইলাম। পল্লীর নিম্নেই একটী ছড়া ছিল—তাহার সুশীতল জলে স্নান করিতাম; একে নিদাঘ কাল তাহাতে বৃক্ষাবলী সমাচ্ছাদিত সুশীতল প্রস্তরবাহী সলিলরাশি, স্নানে অনুপম আনন্দ অনুভব করিতাম। আমরা প্রথম প্রথম সুখেই ছিলাম, মিলিটরী সুবেদার দলবীর সিংহ বড়ই আমোদ-প্রিয় ভদ্রলোক ছিলেন, যুদ্ধ সংক্রান্ত নানাবিধ কৌতূহলপূর্ণ গল্প করিয়া আমাদিগকে পরিতোষ দিতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ আমাদের গোরখা সৈন্যাবাসে কলেরা দেখা দিল। দুইজন সিপাহী সহসাই মৃত্যুমুখে পতিত হইল; দুই একটী আরোগ্যও হইল। পাঠ্যাবস্থা হইতেই আমার একটু একটু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত পরিচয় ছিল, সঙ্গে কিছু ঔষধ থাকিত। তাহা সেবনে অনেকে ফল পাইল। তাড়াতাড়ি কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে মহারাজা বাহাদুরের সমধিক লাভজনক রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম।

আমরা যেস্থানে আসিয়াছি তাহা অতি দুর্গমস্থান, উভয় রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী। নিম্নে আসিবার ভাল পথ নাই, পাহাড় অতি উচ্চ। চট্টগ্রামের সীমানা হইতে উত্তরাভিমুখে আসিয়া ত্রিপুরা পর্ব্বতের পূর্ব্ব-প্রান্তের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, এখন পশ্চিমাভিমুখে কুমিল্লা সহরের নিকট যাইতে হইবে। এখান হইতে হাঁটিয়া এক দিনে একছরি নামক স্থানে আসিলাম। একছরি একটী অপ্রশস্ত নদী, ডুম্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ডুম্বর একটী অত্যাশ্চর্য্য জলপ্রপাত। সর্ব্বোচ্চ চম্পাই নামক পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে একটী সামান্য জলধারা নির্গত হইয়া ডুম্বর নামক স্থানে প্রস্তরের উপর দিয়া শত ফিট ঊর্দ্ধ হইতে ঘোররবে প্রবলধারায় নিম্নে

পতিত হইতেছে, আবার তখনই সেই নিম্ননিক্ষিপ্ত জলরাশি উচ্ছ্বসিত-বেগে ঊর্দ্ধধারায় উপরে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। যেন একটী কলসহযোগে জল প্রবলবেগে উঠিতেছে ও পড়িতেছে।

মরি মরি! কি অপূর্ব্ব স্থান! প্রাকৃতিক কতই না সৌন্দর্য্য ইহার চতুর্দ্দিক সুশোভিত করিয়াছে। সূর্য্যরশ্মি জলরাশিতে প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় নানাবিধ বিচিত্র বর্ণ প্রতিফলিত হইতেছে। যদিও জলপ্রপাতটী ভূগোল-লিখিত অন্যান্য জলপ্রপাতের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র তথাপি আমাদিগের নিকট ইহা বড়ই মনোরম বলিয়া বোধ হইল।

একছরিতে নির্ম্মিত মলী বাঁশের উপরে ছনের ছানিওয়ালা ছাপরযুক্ত জলগামী ভেলা আমাদের জন্য প্রস্তুত ছিল, পার্ব্বতীয় জুমিয়া প্রজারাই বিনা ব্যয়ে ঐ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিল। প্রত্যেক ভেলাতে অতি কষ্টে দুই জনের স্থান হইল। বাহিরে থাকিয়া এক এক জন জুমিয়া কুলী সেগুলি বাহিয়া এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীর ঘাটে দিয়া চলিয়া যাইত; পুনরায় তথা হইতে কুলী সংগ্রহ করিয়া অন্য পল্লীতে গমন করিতে হইত। এই ভাবে তিন দিনে আমরা প্রসিদ্ধ উদয়পুর নামক প্রাচীন রাজধানী ও আমাদের আখ্যায়িকায় বর্ণিত প্রধান দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থানে উপনীত হইলাম। ভেলায় থাকার কালে পদ্মা-পুরাণোক্ত বেহুলার কথা স্মৃতিপথে অনেক বার উদয় হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে পার্ব্বতীয় নদীপথে গমনাগমন জন্য নৌকাদি আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে বোধ হয় সহজ মনুষ্যবুদ্ধিতে বাঁশ, গাছ ইত্যাদি দ্বারাই এইরূপ ভেলা বা ভোরা নির্ম্মিত হইত। এখনও বঙ্গদেশের অনেক স্থানে কদলী গাছসমন্বিত ভেলা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পর্ব্বতবাসীরা এই প্রকার ভেলা ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ক্ষোদিয়া কোন্দা ও লঙ্গ নৌকা দ্বারা অদ্যাপি গমনাগমন করিয়া থাকে। পথিমধ্যে "দেবতা-মোরা" নামক একটী স্থান দৃষ্টে বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। গুমতী নদী এক স্থানে পর্ব্বত ভেদ

করিয়া চলিয়াছে, উভয় পার্শ্বেই কঠিন প্রস্তরের অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, মধ্যে নদীর জল অত্যন্ত গভীর, স্রোতবেগ প্রবল; এইরূপ সঙ্কটজনক স্থানে নদীর এক পার্শ্বে পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত বহুতর মূর্ত্তি। ঐ সমস্তের আকার চিত্রলিখিত দৈত্যদানবগণের ন্যায়, কোন কোন জন্তুর মূর্ত্তিও সঙ্গে আছে—যেন একটী সুবিস্তৃত চিত্রপট। কোন সময়ে কাহার দ্বারা এসব চিত্র এরূপ দুরারোহ সঙ্কটজনক স্থানে ক্ষোদিত হইয়াছিল, তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। সকলেই ইহাকে দৈব কার্য্য মনে করিয়া এই পর্ব্বতকে দেবতা মুড়া নামে অভিহিত করিয়া থাকে। কোন কোন ইংরেজ ভ্রমণকারী ইহাদিগকে বৌদ্ধ যুগের চিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

উদয়পুর অতি প্রাচীন রাজধানী। ত্রিপুর রাজবংশের অনেক তাম্রফলক ইত্যাদিতে ও রাজকীয় সনন্দাদিতে রাজধানী "হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর" এরূপ লিপি দৃষ্ট হয়। চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যযাতির রাজধানী হস্তিনাপুরেই ছিল; তাঁহার সন্তান দ্রুহ্য কর্ত্তৃক সুদূর বঙ্গরাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশে স্থাপিত এই রাজ্য সহস্র সহস্র বৎসর পরেও মূল রাজধানীর নাম বিস্মৃত হইতে পারে নাই। আইন-ই আকবরীতেও সরকার উদয়পুরের উল্লেখ আছে। উদয়পুর গুমতী নদীর তটবর্ত্তী। নদীর উভয় পার্শ্বেই প্রাচীন রাজধানীর ভগ্ন অট্টালিকাদির নিদর্শন দৃষ্ট হয়। নদীতটস্থিত একটী জলবিহারমন্দিরের ভগ্নাবস্থা অদ্যাপি প্রাচীন স্থপতি কার্য্যের পরাকাষ্ঠা ও রাজাদিগের সুরুচিপূর্ণ বিলাসিতার নিদর্শন সপ্রমাণ করিতেছে। কথিত আছে, জলসিক্ত নির্ম্মল বায়ু সেবনার্থে নদীর গর্ভ হইতে প্রাচীর উঠাইয়া এই সুরম্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। উদয়পুর একটী সুপ্রশস্ত সমতল উপত্যকা ভূমি। এখানে পূর্ব্ব নিদর্শন স্বরূপ বহুতর বাঙ্গালী প্রজার বসতি আছে। কালীমাতার সেবাইত পুরোহিত ও সেবক ভৃত্যাদি সকলেই

বাঙ্গালী। একটী বড় বাজার আছে। এখানে পূর্ব্বে মহারাজের এক দল সিপাহী সর্ব্বদাই থাকিত, সবডিভিসন হওয়া অবধি অফিসার ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের অধিষ্ঠান হইয়াছে। এখানে হলাদি দ্বারা কৃষি করে এরূপ প্রজাও আছে, তাহারা পার্ব্বতীয় ত্রিপুরা ও বাঙ্গালী।

বাজার হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর বাড়ী। মহারাজ ধন্য মাণিক্য বাহাদুর চট্টলের পর্ব্বত হইতে দেবীকে আনিয়া আপন রাজধানীতে স্থাপন করিয়া যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার আকার দেখিলেই প্রাচীনত্ব বিষয়ে সংশয় থাকে না। মন্দিরগাত্রে একখণ্ড প্রস্তরে ক্ষোদিত শ্লোকের অনুলিপি দেখা গেল, ইহা সহজপাঠ্য নহে, অনেক অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।* ১৪২৩ শকাব্দে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের পূর্ব্ব দিকেই একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, তাহা অতি গভীর ও স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ, জল এত নির্ম্মল যে ৪।৫ হাত নিম্নের বড় বড় বালুকাকণাগুলিও দৃষ্টিগোচর হয়। যাত্রীগণ এই দীর্ঘিকার জলেই স্নান করিয়া থাকে। মন্দিরমধ্যে নানালঙ্কারভূষিতা পাষাণময়ী চতুর্ভুজা কালিকা মূর্ত্তি। এখানে দেবীর দক্ষিণ পাদ পতিত হইয়াছিল, দেবীর নাম ত্রিপুরাসুন্দরী, ভৈরব ত্রিপুরেশ্বর। ইহা ৫১ পীঠের এক মহাপীঠ। এখানে ভৈরব নাই, ত্রিপুরেশই ভৈরবস্থানীয়। পুরাকালে রাজা ত্রিলোচনের ত্রিনেত্র ছিল, তিনিই ভৈরব ছিলেন। ত্রিপুরার অধীশ্বরগণ শালগ্রাম শীলার উপরে সিংহাসনে পূজিত হইয়া থাকেন।

দেবীর পূজার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যহ ছাগ বলি দ্বারা পূজা হয়, প্রতি অমাবস্যাতে মহিষ বলি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ

---

* "আসীৎ পূর্ব্বং নরেন্দ্র সকলগুণযুতো ধন্য মাণিক্য দেবো। যস্য হ্যধীশঃ ক্ষিতিতলে মগমৎ কর্ণতুল্যস্তু দানে শাকে বহ্ন্যক্ষি বেধুমুখ ধরণীযুতে লোক মাত্রে হৃষিকা[illegible]ং সেবিতায়ৈ সাদরৈঃ॥ মন্দিরগাত্র সং[illegible]

পর্ব্ব উপলক্ষে সরকারী ও যাত্রীগণের প্রদত্ত বহুতর পশ্বাদি হত হইয়া থাকে। শুনা যায় পুরাকালে এই মুণ্ডমালিনী কালী দেবীর সম্মুখে অসংখ্য নরবলি হইত। এখানে যাত্রীগণের মধ্যে সাধু সন্ন্যাসীই অধিক। যাত্রীগণের থাকার ভাল বন্দোবস্ত আছে। পাণ্ডার ব্যবহার প্রশংসনীয়। পূজার সমস্ত উপকরণাদি মার মন্দিরের নিকটস্থ বাজারে পাওয়া যায়।

উদয়পুর কুমিল্লা সহর হইতে প্রায় ২৮ মাইল, এক দিনেই যাওয়া যায়। একটী রাজপথ আছে। নৌকায় যাইতে হইলে কুমিল্লা হইতে গুমতী নদী পথে তিন দিন। দশটাকা ভাড়ার দরকার। আমরা উদয়পুরে দুই দিন বাস করিয়া নৌকাযোগে কুমিল্লা সহরের ৬ মাইল দূরবর্ত্তী সোনামুড়া নামক সবডিবিসনে আসিয়াছিলাম। কুমিল্লা সহর হইতে সোনামুড়া ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি সমস্ত যানেই যাওয়া যায়। আসাম বেঙ্গল রেল লাইনে কুমিল্লা চাঁদপুর হইতে ৪৬ মাইল, ভাড়া ॥৶৬ আনা। চাঁদপুর হইতে গোয়ালন্দ ৬৫ মাইল, ভাড়া ১।০ এবং গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতা ১৫০ মাইল, ভাড়া ১৸৶০। আর কুমিল্লা হইতে কলিকাতা ২৭৫ মাইল, ভাড়া ৩৸৶০ আনা মাত্র।

চন্দ্রশেখর

বা

চন্দ্রনাথ তীর্থ।

"চট্টলে দক্ষবাহুর্মে ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ।
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী তত্র দেবতা।
বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে॥
তন্ত্র চূড়ামণি বারাহী তন্ত্র

১৩১৬ সনে আষাঢ় মাসে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালার মৃত্যুতে বড়ই শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। মনে শান্তি না পাইয়া চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনমানসে একদিন দিবা ১২ টার সময় একটী মাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া এ, বি, রেলের কুমিল্লা ষ্টেসনে চট্টগ্রামগামী গাড়ীতে সীতাকুণ্ড নামক ষ্টেসনের এক একখান টিকেট ১৶০ আনা হিসাবে খরিদ করিয়া কামরাতে উঠিয়া বসিলাম। লৌহশকট এক ঘণ্টার মধ্যেই লাকসাম নামক জংসনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই লাইনে লাকসাম প্রকাণ্ড জংসন ষ্টেসন। এখানে চাঁদপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও আসামের গাড়ীর একত্র সম্মিলন হয়। গাড়ী এখানে অনেক সময় অপেক্ষা করে। বহুলোকের সমাগম হয়। অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে লোকের হুড়াহুড়ী, দৌড়াদৌড়ী, উঠা নামা, গাড়ী পরিবর্ত্তন ইত্যাদি কার্য্যের গণ্ডগোল শেষ হইলে, আমাদের গাড়ী পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে ষ্টেসনের পর ষ্টেসন পার হইয়া যাইতে লাগিল। ফেণী নদীর পুল ভিন্ন পথে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন বিষয় দেখিলাম না। ফেণী ত্রিপুরা পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গসাগরে

পতিত হইয়াছে, ফেণী নামক ষ্টেসন হইতে সাগর মুখ বহুদূরবর্ত্তী নয়। বাঁনের সময় উত্তাল তরঙ্গমালায় তটভূমি আবৃত হওয়া কালীন উৎক্ষিপ্ত জলরাশির দৃশ্য বড়ই মনোহর। নদী এখানে প্রশস্ত, পুলটীও বিস্তৃত এবং উচ্চ। পুল পার হইয়া বেলা ৫ ঘটিকার পূর্ব্বে আমরা চন্দ্রনাথের উচ্চ পাঁহাড়ের সানুদেশে সীতাকুণ্ড নামক ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম। ষ্টেসনের কম্পাউণ্ড পার হইলেই পাণ্ডাদের মধ্যে পড়িলাম। সকলেই বাঁবু আমার বাটীতে আসুন বলিয়া ঘন ঘন ডাক হাক্ ছাড়িতে লাগিল। পাণ্ডার হাত এড়াইতে হইলে একজন পাণ্ডার নাম করিতে হয়। তীর্থ-যাত্রিগণের আপনাদের পরিচিত পাণ্ডা না থাকিলে, যে পাণ্ডার বাটীতে যাইবেন পূর্ব্বেই তাহা স্থির করিয়া নাম বলিলেই সেই পাণ্ডার লোকে নিরাপদে পাণ্ডার বাটীতে লইয়া যায়; অন্য পাণ্ডা আর তখন কোন গোলযোগ করে না। আমি শ্রীমহাভারত পাণ্ডা মহাশয়ের নাম করিবা মাত্র ঐ পাণ্ডার একজন চট্টগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ গোমস্তা আমাকে তাঁহাদিগের বাটীতে সাদরে লইয়া গেলেন। বাটীটী অতি বিস্তৃত, চতুর্দ্দিকে গাছের খুটীর বেড়া, ভিতরে পাটের গুদামের ন্যায় লম্বা লম্বা ৭।৮ খানা যাত্রী থাকার ছনের ঘর। মধ্যে একটি পাণ্ডা থাকার আটচালা বা কাছারী ঘর। আমি এই ঘরে বাসা লইলাম। পাঁণ্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে অন্য কিছুই দর্শনাদি হইবে না বলিলেন সুতরাং হাত মুখ ধুইয়া জলযোগপূর্ব্বক স্থানটী দেখিতে বাহির হইলাম। আষাঢ়ের লম্বা দিন, তখনও বেলা রহিয়াছে।

বঙ্গদেশের পূর্ব্ব প্রান্তে যে সকল পর্ব্বতশ্রেণী আরাকান হইতে উত্তরে তুষারধবল হিমাদ্রি সহিত মিলিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে চট্টগ্রাম জিলার ক্রোড়দেশে চন্দ্রনাথ তীর্থ বিরাজমান। চট্টগ্রাম ষ্টেসন হইতে ২৩ মাইল উত্তরে সীতাকুণ্ড নামক আসাম বেঙ্গল রেলের যে ষ্টেসন আছে, "চন্দ্রনাথ" তাহার পূর্ব্বদিকে দুই মাইল ব্যবধান পর্ব্বতোপরি অবস্থিত।

এই পর্ব্বত উচ্চে ১১৫৫ ফিট, এখানে সচ্ছিদ্র আগ্নেয় প্রস্তর ও লৌহসংশ্লিষ্ট নিরেট পাথর দেখা যায়। এই স্থানের নৈসর্গিক শোভা অতুলনীয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও বিশ্বনিয়ন্তার নানাবিধ চমৎকারিত্বে অন্যান্য তীর্থ-সকলে একাধারে এমত নয়নাভিরাম চিত্তহারক ভগবানের বিচিত্র-লীলা-ব্যঞ্জক অনন্ত জ্ঞান ও প্রেমের একত্র সম্মিলন অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। চন্দ্রশেখরের অত্যুচ্চ শৃঙ্গোপরি আরোহণ করিয়া সম্মুখস্থ মেখলার ন্যায় বিস্তৃত জলধির নীলিমা শোভা ; উত্তাল তরঙ্গমালার ন্যায় উন্নত ও অবনত-ভাবে দূরস্থ ধূসর বর্ণের পর্ব্বতসমূহের শোভা ; নিম্নে উপত্যকাসমূহে শ্যামলশস্যপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহের ও নানাবিধ পাদপসমাচ্ছন্ন অসংখ্য গ্রামা-বলীর একত্রীকরণ শোভা ; বাড়বকুণ্ডে জলের উপরে ভাসমান অগ্নির ক্রীড়া শোভা ; জ্যোতির্ম্ময় ও গুরুধূনীতে ভূগর্ভস্থ সদা উদীয়মান অগ্নির নীলাভ জ্যোতির শোভা ; পর্ব্বতমধ্যবর্ত্তী সহস্রধারা জল-প্রপাতের সুমধুর ধ্বনি ইত্যাদি নানা প্রকৃতির লীলানিকেতন পর্ব্বতরাজির অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যরাশি যিনি নিবিষ্টচিত্তে দর্শন বা শ্রবণ করিবেন তিনি গৃহী কি সন্ন্যাসী, সাধু কি পাপী, সুখী কি তাপী যিনিই হউন, একবার সংসার ভুলিয়া ঈশ্বর প্রেমে বিভোর হইয়া অনন্তময়ের অনন্ত মহিমায় আত্মহারা হইবেন। তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইবে। যাঁহার এ ভাব জন্মিবে তিনিই এই তীর্থের প্রকৃত মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছেন।

সীতাকুণ্ড স্থানটী চাঁদপুর হইতে ৯০ মাইল, ভাড়া ১।৶০ আনা। লাক্‌সাম জংসনে গাড়ী বদলাইতে হয়। এখানে মুনসেফী আদালত, সবরেজেষ্টরী আফিস, পুলীস ষ্টেসন ও একটী বাজার আছে। পাণ্ডার সংখ্যা অধিক নয়, মূল পাণ্ডা ৭ ঘর কিন্তু অনেকেই পাণ্ডা ব্যবসায়ী হইয়া এক একটী বাসা করিয়া যাত্রী আনিয়া পাণ্ডার কার্য্য করিয়া থাকেন। রেলের ষ্টেসনের পশ্চিম দক্ষিণেই বাজার ও পাণ্ডার বাসা

সকল অবস্থিত। বাজার হইতে একটী প্রশস্ত সড়ক চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের সানুদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে, দুই ধারে দোকান ও যাত্রীদিগের থাকিার স্থান। পর্ব্বতের নিম্নে, রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বেই মোহন্তের বাটীর নিকটে একটী স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী আছে এবং বাজারের সন্নিকটে একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে, ইহার জল পরিষ্কার নহে বলিয়া পর্ব্বত হইতে একটী পরিষ্কার ছড়ার জল নলসংযোগে বাজারের ভিতর আনীত হইয়াছে। ইহার জলই সকলে পান করে। এই লোকহিতকর কার্য্যের জন্য পূর্ব্ববঙ্গের ধনকুবের রাজা শ্রীনাথ রায় কয়েক সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। বাজারে অনেক কাঁচা মাটির ঘর দেখিলাম, উপরে টিনের ছাউনি কিন্তু নিম্ন হইতে ইষ্টকালয় বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বাজারে প্রত্যহ হাট বসে, সাধারণের খাদ্য সামগ্রীর অভাব নাই। দুগ্ধ প্রচুর পাওয়া যায় এবং সুলভও বটে। সর্ব্বদাই যাত্রী সমাগম আছে কিন্তু ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দ্দশী পর্ব্ব উপলক্ষে একটী মহামেলা হয়, তৎকালে ২০।২৫ সহস্রেরও উর্দ্ধে লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, পৌষ সংক্রান্তি, দোল, শ্রীপঞ্চমী, কার্ত্তিক পূর্ণিমা, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষেও বহুতর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। তাহাদের বাসের জন্য অধিকারী পাণ্ডাগণের পর্য্যাপ্ত সংখ্যক বাসা বাড়ী আছে, পাণ্ডারা যাত্রিগণ হইতে কোন ভাড়া লয় না। যাত্রীগণপ্রদত্ত বস্ত্র তৈজসাদি ও বিদায় দক্ষিণা অধিকারীর প্রাপ্য। মোহন্ত কেবল কর পান। এখানে অনেকগুলি তীর্থের একত্র সমাবেশ হইয়াছে। তন্মধ্যে সীতাকুণ্ড, ব্যাসকুণ্ড, জ্যোতির্ম্ময়, ভবানী, শম্ভুনাথ, মন্দাকিনী, জগন্নাথ দেবের বাটী, গয়াক্ষেত্র, ছত্রশীলা, বিরূপাক্ষ, হরগৌরী শিব, চন্দ্রনাথ, লবণাক্ষ সহস্র-ধারা, বাড়বানল, গুরুধূনী ও কুমারীকুণ্ড প্রভৃতি প্রধান। ইহাদের বিবরণ পর্য্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ হইল। প্রবাদ আছে বুদ্ধদেবের শরীরাংশ চন্দ্রনাথের পর্ব্বতে একস্থানে প্রোথিত হইয়াছিল, তদুপলক্ষে প্রতি

চৈত্রসংক্রান্তিতে বৌদ্ধদিগের একটী মেলা হয়, অনেক লোক মৃত আত্মীয়গণের অস্থি বুদ্ধ কূপে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে মুক্ত মনে করে।

সীতাকুণ্ড অতি প্রাচীন তীর্থ। পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। কথিত আছে, ত্রেতাযুগে পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র পিতৃ-সত্য পালনার্থে বনগমনকালে এখানে আসিয়া সীতা দেবীর স্নানার্থে জ্ঞান বলে যে একটী কুণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাকেই সীতাকুণ্ড বলে। কালক্রমে তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে মনুষ্যের বসতি হইলে সেই গ্রামটীই সীতাকুণ্ড নামে অভিহিত হইয়াছে। সীতাকুণ্ড এখন লুপ্তপ্রায়, গভীর অরণ্য মধ্যে নির্ঝরিণীতটে ভগ্ন মন্দিরের চিহ্ন মাত্র বর্ত্তমান আছে।

১। সীতাকুণ্ড

কথিত আছে, মহর্ষি বেদব্যাস মোক্ষধাম বারাণসী ক্ষেত্রে অপমানিত হইয়া তপোবলে নূতন কাশী সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে ভগবতী অন্নপূর্ণার মায়ামোহে বিফলমনোরথ হইয়া ব্যাসকাশী পরিত্যাগে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আসিয়া তপস্যানিরত হইয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া আশুতোষ মহাদেব ঊনকোটি তীর্থে কলিযুগে উমাসহ সর্ব্বদা বাস করিবেন এবং ইহা জীবের সর্ব্বপাপহর নির্ব্বাণক্ষেত্র দ্বিতীয় কাশীধাম স্বরূপ হইবে, এইরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি নিজ ত্রিশূল দ্বারা মেদিনী বিদ্ধ করিয়া একটী কুণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন ঐ কুণ্ডই ব্যাসকুণ্ড নামে বিখ্যাত এবং মহাদেবের বরপ্রভাবে যাবতীয় তীর্থ এই পবিত্র পুণ্যময় চন্দ্রশেখরপর্ব্বতে আগমন করিয়াছিলেন। ইহাকে পদগয়াও বলিয়া থাকে।

২। ব্যাসকুণ্ড

কুণ্ডের পশ্চিম পারে ধ্যানমগ্ন ব্যাসদেবের প্রস্তরমূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই কুণ্ড পূর্ব্বে ত্রিকোণাকৃতি চারি হাত বিস্তার বিশিষ্ট ছিল—যাত্রীগণের স্নানাদির সুবিধার্থে কোন ভক্তের ব্যয়ে ইহা সরোবরে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সরোবরের কথা বলা হইয়াছে

এই সরোবর তাহারই পার্শ্বে। যাত্রীগণ এখানে আসিয়া প্রথমতঃ সংকল্প, স্নান, তর্পণ করিয়া মন্দিরস্থ ব্যাস দেব, ভৈরব, চণ্ডী প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি দর্শন, স্পর্শ ও পূজা করিয়া থাকেন। কুণ্ডের উত্তর পারস্থিত বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট অতি প্রাচীনকালের অশ্বত্থ বট বৃক্ষকে ভগবান জ্ঞানে অর্চ্চনা করিয়া তন্নিম্নে মাটির ৫টী ঢেলা নিক্ষেপ করিতে হয়। ভগবান্ বেদ ব্যাস এই সরোবর তীরে মুনিগণ সহ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এখানে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। ব্যাসকুণ্ডের অগ্নিকোণে সতীর দক্ষিণ হস্ত পতিত হইয়াছিল, দেবীর নাম ভবানী এবং ভৈরব চন্দ্রশেখর। সরোবরের পূর্ব্ব পারে শিবের নির্ব্বাণক্ষেত্র শ্মশানভূমি, এখানে মৃত দেহাদি সৎকার করা হয়। মুমূর্ষ ব্যক্তিদিগকে রাখার জন্য একটী টিনের ঘর আছে। আমরা এই সরোবরে স্নান তর্পণ ও পার্ব্বণাদি সমাপনান্তে শম্ভুনাথ দর্শনে গেলাম। পথিমধ্যে জ্যোতির্ময়ের দর্শন হইল।

৩। জ্যোতির্ম্ময় ও গুরুধূনী

ব্যাসকুণ্ড হইতে বরাবর পূর্ব্ব দিকে কিছু দূর যাইয়া পর্ব্বতারোহণ করিলেই দক্ষিণ পার্শ্বে শিবের নেত্রানলরূপী ভূগর্ভ হইতে জ্যোতির্ম্ময়রূপী নীলবর্ণ অগ্নিশিখা ঝড়, বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া দিবা রাত্রি জ্বলিতেছে। তৃণ কাষ্ঠাদি দিলে জ্বলিয়া যায়; ভক্তবৃন্দ এস্থানে ঘৃত, বিল্বপত্রাদি দ্বারায় হোম করিয়া থাকেন। অগ্নি শিখাতে আমি হস্তক্ষেপ করিয়া দেখিলাম সেই নীলবর্ণশিখার প্রচুর দাহিকা শক্তি আছে। এখানে অগ্নির জ্যোতিদর্শন, স্পর্শন ও অর্চ্চনা করিতে হয়। স্থানটী প্রস্তরময়, নিম্নে কোন ছিদ্র দৃষ্ট হয় না, একস্থান হইতেই অগ্নিশিখা উপরে উঠিতে থাকে; পার্শ্বের শিলাখণ্ডে যেন সতত উদীয়মান অগ্নিশিখার কৃষ্ণবর্ণ ধূমসকল জমিয়া রহিয়াছে। এখান হইতে ভবানী মন্দির দর্শনে চলিলাম, সঙ্গে পাণ্ডার চর নানাবিধ মনোমুগ্ধকর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ধর্ম্মের গল্প বলিতে লাগিল।

জ্যোতির্ম্ময়ের অল্প পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধ ভবানীর মন্দির কালী বাড়ী। ইনিই মহাপীঠাধিষ্ঠাত্রী আদ্যাশক্তি স্বরূপিণী কালী। এখানে সতীর দক্ষিণবাহু পতিত হইয়াছিল, দেবীর নাম ভবানী, ভৈরব চন্দ্রশেখর। মন্দির মধ্যে বেদীর উপরে চতুর্ভুজা প্রস্তর নির্ম্মিত কালী মূর্ত্তি। মার সুন্দর মূর্ত্তি বর ও অভয়প্রদ, দর্শনে ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। ছাগাদি পশু বধে মহামায়ার পূজা প্রদত্ত হয়। পুরাতন মন্দির ভগ্ন হওয়ায় ময়মনসিংহ সন্তোষের দানে মুক্তহস্তা পুণ্যবতী বিখ্যাত ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী চৌধুরাণীর দানশীলতায় ভবানী দেবীর মন্দির পুনঃ সংস্কার হইয়াছে। এই কালীবাড়ী হইয়াই ৺শম্ভুনাথের মন্দিরে উঠিবার পথ এবং নিম্নদেশে অবরোহণ করিবার জন্য ইষ্টক নির্ম্মিত অসংখ্য সোপান আছে। কালীবাড়ীর সম্মুখেই শম্ভুনাথের নহবতখানা।

৪। ভবানী মন্দির বা কালীবাড়ী

নহবতখানার পূর্ব্বদিকে উপরে উঠিবার অনেকগুলি সিঁড়ি আছে। উহা পার হইলেই শম্ভুনাথের প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রশস্ত আঙ্গিনা ও চতুর্দ্দিকে প্রাচীর। প্রাচীরমধ্যে অনেকগুলি ঘর ও মন্দির আছে। পশ্চিমের মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান, প্রাচীন ও বৃহৎ। আদিলিঙ্গ শম্ভুনাথ এই মন্দিরেই অধিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরের প্রথম প্রকোষ্ঠে তীর্থগুরু মোহন্তের বসিবার স্থান। চৌকীর উপর উচ্চ গদী ও তাকিয়া শুভ্রবর্ণের আস্তরণে আচ্ছাদিত। মোহন্ত এখানে সর্ব্বদা আসেন না, বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে যাত্রীর সমাগম হইলে দর্শন দিয়া থাকেন। তৎকালে যাত্রীগণ মোহন্তের পদধূলী গ্রহণ করিয়া ইচ্ছামত দর্শনী দেয়। ইহাই মোহন্তের প্রাপ্য, এতদ্ভিন্ন দেবসেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট বহুতর স্থাবর সম্পত্তি আছে। পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট দর্শনী ছিল—যাত্রীর উপর অত্যাচার হইত বলিয়া সদাশয় গবর্ণমেণ্ট

৫। ৺ শম্ভুনাথের বাড়ী।

ঐ নিয়ম ও টেক্‌সাদি রহিত করিয়া দেওয়ায় এখন দীন দুঃখীর পক্ষেও দেবদর্শন সহজসাধ্য হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব মোহন্ত কিশোরী বন্ গৌরবর্ণ সুশ্রী পুরুষ ছিলেন, ইংরাজি বাঙ্গালা নানাবিধ বিদ্যায় পারদর্শী ও বর্ত্তমান-কালানুযায়ী সুসভ্য, সদাশয় ও মিষ্টভাষী ছিলেন। আমার সঙ্গে সাক্ষাতে অতি ভদ্রতার সহিত নানাবিধ আলাপ করিয়াছিলেন। কিছুদিন হইল তিনি দুষ্টকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, তাঁহার পুত্র বর্ত্তমান আছেন। গদীর উত্তরাধিকারী সাব্যস্তের জন্য মোকদ্দমা চলিতেছে। ৺ শম্ভুনাথের মন্দিরের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে অষ্ট শক্তি, অষ্টমূর্ত্তিসমন্বিত আদি স্বয়ম্ভু ৺ শম্ভুনাথ পর্ব্বতের সহিত সংলগ্ন অতি আশ্চর্য্য লিঙ্গমূর্ত্তি। যে যে স্থানে শিবলিঙ্গ দেখিয়াছি এমত সুন্দর মূর্ত্তি আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। লিঙ্গমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে লৌহ নির্ম্মিত রেল। মধ্যে প্রবেশ করিয়া লিঙ্গ দর্শন, স্পর্শন, পূজা, প্রদক্ষিণ ও স্তোত্রাদি-পাঠ করিতে হয়। কি আশ্চর্য্য মহিমা, রেলের দরজা পার হইয়া লিঙ্গমূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই যেন মনপ্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া যায়। এখানেও ইচ্ছামতে প্রণামী দিতে হয়। রাজমালা পাঠে জানা যায় ত্রিপুরেশ মহারাজ ধন্য মাণিক্য ৺শম্ভুনাথের অলৌকিক সংবাদে আকৃষ্ট হইয়া লিঙ্গমূর্ত্তিটি রাজধানী উদয়পুরে লইয়া যাইবার জন্য উহার চতুর্দ্দিক খনন করিয়াছিলেন; যতই নীচের দিকে খনন করিতে লাগিলেন লিঙ্গমূর্ত্তির ততই বিস্তার দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারাজ স্বয়ং বহুলোকজন সহ শিবলিঙ্গ উত্তোলনে অসমর্থ হইয়া অবশেষে হস্তীদ্বারা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও উত্তোলনে অকৃতকার্য্য হইয়া হত্যা দিয়াছিলেন এবং স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হইলেন, '৺ শম্ভুনাথ আদিলিঙ্গ পর্ব্বতসহিত যোজিত আছেন তাহা কোনমতেই স্থানান্তরিত হইতে পারিবে না।' মহারাজ দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীকে স্বরাজ্যে স্থাপন করিবার আদেশ স্বপ্নে অবগত হইয়া ৺শম্ভুনাথকে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হন। মহারাজ ধন্য মাণিক্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত শম্ভুনাথের

মন্দিরগাত্রে শিলালিপিতে ১৪২৩ শকাব্দা ১৫০২ খৃষ্টাব্দ ক্ষোদিত আছে। প্রাঙ্গন মধ্যস্থ আরও দুইটী মন্দিরে দেবমূর্ত্তি আছে। এই প্রাঙ্গনেই ভোগের ঘর, ভাণ্ডার ঘর, পাণ্ডাদের বসিবার ঘর, চাকরদের ঘর প্রভৃতি অনেকগুলি ঘর আছে এবং ৺ শম্ভুনাথের স্নান-ভোগের জন্য মন্দাকিনী নাম্নী দেবছড়ার জল সুকৌশলে প্রাঙ্গনমধ্যে এক পার্শ্বে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

উচ্চ পর্ব্বত শিখর হইতে একটী নির্ম্মল জলধারা ক্রমে নিম্ন বহিয়া শম্ভুনাথের মন্দিরের পাদমূল বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকেই স্বর্গের পুণ্যতোয়া স্রোতধারা মন্দাকিনী কহে। যাত্রীগণ এই জল মস্তকে ধারণ করিয়া আপনাকে পবিত্র মনে করে। এই মন্দাকিনীর পূত সলিলেই শম্ভুনাথের পূজা, স্নান, ভোগ ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। পাকশালার নিকটেই একটী প্রস্তর নির্ম্মিত জলাধার আছে।

৬। মন্দাকিনী।

৺.শম্ভুনাথের বাটীর পূর্ব্বদিকে জগন্নাথ দেবের বাটী। তথায় কোন মূর্ত্তি নাই, মন্দিরগুলি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর মূর্ত্তি ছিল। ভগ্ন মন্দিরগুলি পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক করিবার জন্যই যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এস্থানে শম্ভুনাথের পূজার জন্য একটী ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান আছে।

৭। জগন্নাথ দেবের মন্দির।

জগন্নাথবাড়ীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিক দিয়া নিম্নে নামিয়া গেলেই মন্মথ-নদের তীরে গয়াক্ষেত্র নামে পিতৃতীর্থ। এখানে পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থে মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক পার্ব্বণশ্রাদ্ধান্তে পিণ্ড দিতে হয়। ইহাকে পদগয়া কহে। পূর্ব্বে যে স্থানে গয়াশ্রাদ্ধের পিণ্ড প্রদত্ত হইত তথায় কোন ঘর ছিল না, রবির খর কিরণে তাপিত হইয়া যাত্রীগণ সর্ব্বদাই কষ্ট পাইত। ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধা দানশীলা রাণী শ্রীমতী দীনময়ী চৌধুরাণীর বদান্যতায় এই উচ্চ পর্ব্বতোপরি লৌহস্তম্ভবিশিষ্ট ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হওয়ায় যাত্রীগণের সুমহান্ অভাব বিদূরীত হইয়াছে। ধন্য রাণীর দানশীলতা! পরদুঃখে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া অজস্র অর্থব্যয়ে এই

৮। গয়াক্ষেত্র।

মরজগতে অক্ষয়কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। আমি তন্মধ্যে বসিয়াই শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপন করিলাম, পার্শ্বেই একটী বাঁধান কুণ্ড আছে, তাহাতেই পিণ্ডাদি ফেলাইয়া দিতে হয়। এস্থানের পাণ্ডাগণ বাঙ্গালী চট্টগ্রামবাসী। তাঁহাদের উচ্চারিত মাতৃ ষোড়শী, পিতৃ ষোড়শী, স্ত্রী ষোড়শী প্রভৃতি শ্রাদ্ধের মন্ত্রগুলি বড়ই করুণরসমিশ্রিত শ্রুতিমধুর। এই পবিত্র পর্ব্বতের নিস্তব্ধতাময় গভীর অরণ্যে মন্মথ নদের কল কল সুমধুর ধ্বনিতে বেদমন্ত্রাদি পাঠে মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়া চক্ষু অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া যায়।

গয়াক্ষেত্রের কিঞ্চিৎ উত্তরে অষ্টধারাস্রোতবিধৌত ছত্রশীলা নাম্নী পর্ব্বতগুহায় ঊনকোটি শিবলিঙ্গের একত্র সমাবেশ। মন্দাকিনী নাম্নী নদীর জল তন্মধ্য দিয়া প্রবাহিত সুতরাং তৎবারিকণাসিক্ত অগণিত শিবলিঙ্গাদিদর্শনে মনে ভক্তির সঞ্চার হয়। স্থানটী বড়ই স্নিগ্ধ ও নির্জ্জন, অতি গ্রীষ্মকালেও শীতানুভব হয়। নানাবিধ বৃক্ষ লতাদির ঘনছায়াবিশিষ্ট নিবিড় নিস্তব্ধতাময় অরণ্যে কলকণ্ঠ পক্ষীগণের সুমধুর ধ্বনিতে ঈশ্বরপ্রেম জাগাইয়া দেয়। এখানে শিবলিঙ্গাদি দর্শন, স্পর্শন ও অর্চ্চনা করিতে হয়।

৯। ছত্রশীলা বা সরস্বতীশীলা।

পর্ব্বতশিখরে বিরূপাক্ষ মহাদেবের মন্দির অতিশয় উচ্চ, তথায় দাঁড়াইয়া সম্মুখস্থ সুদূরবর্ত্তী লবণসমুদ্র প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উহা একটী মেখলার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে ভগবানের অনন্ত মহিমায় হৃদয়কে মোহিত করে, প্রাণে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার হয়। আমি যে সকল তীর্থ দর্শন করিয়াছি, তন্মধ্যে কোন তীর্থেই চন্দ্রনাথতীর্থের ন্যায় এবংবিধ নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তে যুগপৎ ভয়,বিস্ময়,প্রেম, ভক্তি ও আনন্দের উদয় উপলব্ধি করি নাই। এই জন্যই মুনিগণ চন্দ্রনাথে ঊনকোটি তীর্থ বিরাজমান আছেন এমত বলিয়া গিয়াছেন। ইহা যোগতপস্যার প্রধান

১০। বিরূপাক্ষ।

স্থানই বটে। মন্দিরমধ্যে বিরূপাক্ষ মহাদেবমূর্ত্তি দর্শন, পূজন, স্পর্শ ও প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কারান্তে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিতে হয়।

বিরূপাক্ষ শিবের মন্দিরের নিম্নদেশে পাতালপুরী নামক স্থানে একটী প্রস্তর উপরে মহাদেব গৌরীসহ উপবিষ্ট। স্থানটি চতুর্দ্দিকে বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন, উপরে অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ; মধ্যাহ্ন সময়েও রবির খর কিরণজাল সমধিক প্রভা বিস্তার করিতে পারে না। সর্ব্বদা নিবিড় নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ। ঋষিদিগের তপস্যার স্থান।

১১। হর-গৌরী শিব।

বিরূপাক্ষের বাটী হইতে আরও উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে আখ্যায়িকার প্রধান দেবতা চন্দ্রনাথদেবের মন্দির। এই পর্ব্বত অতীব দুরারোহ। উপরে উঠিবার ভাল পথ নাই, অনেক স্থানে লতা ও গাছের সাহায্যে উপরে উঠিতে হয়, একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই, শত শত হস্ত নিম্নে গহ্বরে পতিত হইতে হইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ প্রাণের কিঞ্চিন্মাত্রও মমতা না করিয়া হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ রবে সেই আদি দেবের নাম স্মরণে এই কষ্টসঙ্কুল স্থান আরোহণ ও অবরোহণ করিতেছে। ধর্ম্মের কতই জোর! অশীতিপর বৃদ্ধকেও ধর্ম্মনামে এই উচ্চ শিখরে উঠিতে দেখা গিয়াছে। চন্দ্রনাথের মন্দির সমতল ভূমি হইতে সুনীল উচ্চ গগনে চিত্রিত রহিয়াছে এমত বোধ হয় এবং বর্ষার মেঘমালা মন্দিরের চূড়া লঙ্ঘনভয়েই যেন কিছু নীচু হইয়া ধীরে ধীরে সুদূর আকাশে ছুটিয়া যাইতেছে। কামাখ্যায় ভুবনেশ্বরীর মন্দির, পুষ্করতীর্থে সাবিত্রী দেবীর মন্দির, হরিদ্বারে তুঙ্গশৃঙ্গে মায়া দেবীর মন্দির দেখিয়াছি; কিন্তু আমার নিকট চন্দ্রনাথদেবের মন্দিরই যেন সর্ব্বোচ্চ বলিয়া বোধ হইল। স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য বাহাদুর ১৩১২ খৃষ্টাব্দে এই তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গে চন্দ্রনাথদেবের প্রাচীন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া

১২। চন্দ্রনাথ।

অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৫ অব্দে ভূমিকম্পের পর সাওরাতলীর জমিদার রামসুন্দর সেন মহাশয়ের অর্থে ঐ মন্দিরের পুনঃ সংস্কার হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দুস্থানী ও মারোয়ারী ধনিগণ যাত্রী-দিগের সুবিধার জন্য প্রত্যেক তীর্থস্থানে, বড় বড় রেল ষ্টেসনে ও নগরে লক্ষ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে বহুতর মনোহর ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকাদি নির্ম্মাণে ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন। বঙ্গদেশেও অনেক রাজা, মহারাজা ও ধনকুবেরগণ বর্ত্তমান আছেন; তাঁহাদের মধ্যে যদি কোন মহাত্মা চন্দ্রনাথপর্ব্বতশিখরে উঠিবার অগম্য পথটীকে সুগম করিয়া দিতেন তাহা হইলে যাত্রীগণের কতই না সুবিধা হইত, নিজেরাও অসংখ্য লোকের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারিতেন। মন্দিরমধ্যস্থিত শিবলিঙ্গ মূর্ত্তির পূজাদির কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। দর্শন, স্পর্শন, নমস্কারাদি করিয়া ২।৪টী পয়সা দিয়াও অনেকে চলিয়া যান।

চন্দ্রনাথের মন্দিরের পার্শ্বে বসিলে উপরে অনন্ত সুনীল আকাশ, সম্মুখে নীল জলধিবারি, দক্ষিণে ও বামে অসংখ্য দুরারোহ উচ্চ পর্ব্বতমালা দৃষ্টিগোচর হইবে এবং সুমতলভূমিস্থিত গ্রামগুলি নিবিড় বৃক্ষাবলী সমাচ্ছন্ন হইয়া যেন প্রকৃতির একটী ছোট খাট উদ্যান মৃত্তিকা সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে মনে হইবে। এ সমস্ত নিবিষ্টমনে চিন্তা করিলে কোন্ পাষাণ হৃদয়ে ভগবৎপ্রেমের সঞ্চার না হয়।

১৩। লবণাক্ষ।

শম্ভুনাথের বাটীর উত্তরে লবণাক্ষ কুণ্ড নামে একটী কুণ্ড আছে; তাহাতে অগ্নিদেব নীল জিহ্বা হুঙ্কারের সহিত প্রসারিত করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, ক্ষণে ক্ষণে নির্ব্বাপিত হইয়া পুনঃ প্রবল-বেগে বাহির হইয়া কুণ্ডজলের সঙ্গেই যেন প্রেমালিঙ্গন করিতে থাকে। মরি মরি! কি চমৎকার শোভা! এই কুণ্ডে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে অনেক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিও দূরীভূত হইয়া যায়। লবণাক্ষে

স্নান তর্পণ করিয়া সূর্য্যকুণ্ডে অভিষেক করিতে হয়। ইহার নিকটেই সতত উষ্ণবারিপূর্ণ ব্রহ্মকুণ্ড নামে অপর একটী কুণ্ড আছে।

লবণাক্ষ কুণ্ডের অনতিদূরে পূর্ব্বদিকে পর্ব্বতশৃঙ্গে সহস্রধারা নামক এক আশ্চর্য্য জলপ্রপাত। এখানে তিনটী পর্ব্বতস্রোত তিন দিক হইতে আসিয়া একত্রে মিলিত হইয়াছে, ইহাকে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিবেণীসঙ্গম কহে। উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে উক্ত জলরাশি নিম্নস্থ পাষাণে সহস্র ধারায় পতিত হইতেছে। জলের উচ্ছ্বসিত ও কল্লোলিত শব্দ এবং তাহাতে উদ্ভাষিত বারিকণাতে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া নানা বর্ণের দৃশ্য বড়ই মনোহর ও চিত্তপ্রসাদক। তথায় কোন কোন সময় জলপতন বারণ থাকে, তৎকালে উচ্চরবে হর হর, ব্যোম্ ব্যোম্ মহাদেব বলিয়া চীৎকার করিলে উপর হইতে অজস্র জলধারা পতিত হইয়া থাকে। ইহাও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। প্রতিধ্বনিতে সঞ্চিত জলরাশি আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া প্রবলবেগে নিম্নে পতিত হয়।

১৪। সহস্র ধারা।

বাড়বের দক্ষিণে কর্করিনদীতটে কুমারী কুণ্ড নামে একটী কুণ্ড আছে। ইহার পরিমাণ চারিহাত। ইহার সলিলরাশির উপরে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, এবং একবার জ্বলিয়া উঠে আবার নিবিয়া যায়। যাত্রীগণ এখানে স্নানতর্পণাদি করিয়া থাকে। এ সমস্ত বিস্তারিতরূপে লিখিতে হইলে এক চন্দ্রনাথতীর্থের বিবরণেই প্রকাণ্ড বই লিখা যাইতে পারে।

১৫। কুমারী কুণ্ড।

সীতাকুণ্ড ষ্টেসন হইতে দক্ষিণ দিকে চার মাইল ব্যবধানে অত্যাশ্চর্য্য বিশ্ববিশ্রুত বাড়বানল বা বাড়বকুণ্ড। দিন নাই, রাত্রি নাই, বিরাম নাই, সেই বাড়বাগ্নি লোলজিহ্বায় প্রচণ্ডবেগে সলিল উপরে জ্বলিতেছে। যে অগ্নি সামান্য মাত্র জলকণাসংযোগে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, এখানে বিশ্বরচয়িতার কি আশ্চর্য্য কৌশলে অগ্নিরাশি সলিল

১৬। বাড়ব কুণ্ড বা বাড়বানল।

উপরেই সদা জ্বলিতেছে। কুণ্ডে নামিয়া স্নান তর্পণ করিবার সময় অগ্নিদেবের দাহিকা শক্তি যেন লয় পাইয়া শিখাগুলি যাত্রীগণের গাত্র উপরে খেলা করিয়া থাকে। একবার জ্বলে, পরক্ষণেই নিবিয়া যায়; আবার ধূম বাহির হইয়া সঙ্গে সঙ্গে অগ্নির লোল জিহ্বা কুণ্ড মধ্যস্থ সলিল রাশি উপরে দৌড়িয়া বেড়ায়। এখানে স্নান, তর্পণ, হোম, পূজা ও ভৈরব দর্শন করিয়া পৃথক্ রূপে দান দক্ষিণা করিতে হয়। কেননা বাড়বের পাণ্ডা স্বতন্ত্র। সীতাকুণ্ড হইতে এস্থানে রেলে আসা যায়, ভাড়া ৴১৫ পয়সা মাত্র। আমরা এই তীর্থের দর্শনাদি কার্য্য সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পাণ্ডা মহাশয়ের বিদায়াশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় কুমিল্লা রওনা হইলাম।

জয়ন্তী দেবী।

"জয়ন্ত্যাং বামজঙ্ঘাচ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বরঃ।
ভূতধাত্রী মহামায়া ভৈরবঃ ক্ষীরকণ্ঠকঃ॥

জয়ন্তীয়া পাহাড় আসাম প্রদেশের উপবিভাগ, সাধারণে ইহাকে জোবাই বলে। উত্তরে নওগাঁ, পূর্ব্বে কাছাড়, দক্ষিণে শ্রীহট্ট, পশ্চিমে খসিয়া পাহাড়, এই চতুঃসীমাবদ্ধ ভূভাগকেই জয়ন্তীয়া কহে। কলিকাতা হইতে নারায়ণগঞ্জ হইয়া ষ্টিম নেভিগেসন কোম্পানীর কাছাড়গামী জাহাজে মারকুলী, তথা হইতে ডেইলি ফিডার সার্বিস ষ্টিমারে শ্রীহট্ট যাইয়া নৌকা-যোগে কানাইর ঘাট নামিয়া পদব্রজে ৫ মাইল গেলে জয়ন্তীয়া কালী বাড়ী। কলিকাতা হইতে মারকুলী ৬৪০ মাইল, ভাড়া ৩॥৵০আনা এবং মারকুলী হইতে শ্রীহট্ট ৭৩ মাইল, ভাড়া ৷৵০ আনা মোট ৩৸৴০ আনা জাহাজ ভাড়া। প্রাচীন কালে ইহা একটী ক্ষুদ্র রাজ্যমধ্যেই পরিগণিত ছিল, স্বাধীন হিন্দুনৃপতিগণ এই জয়ন্তীয়ায় রাজত্ব করিতেন। জয়ন্তীয়ার শেষ রাজা রাজেন্দ্র সিংহ কয়েকজন প্রজাকে জয়ন্তীশ্বরীর বাটীতে বলি প্রদান করায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। তদবধি এই রাজ্য শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। হরিনদীর তটে পুরাতন রাজধানী জয়ন্তীপুর ছিল। বর্ত্তমানে রাজার উত্তরাধিকারীগণ নির্দ্দিষ্ট কয়েক সহস্র টাকা বৃত্তি পান। জোবাই সহরে কমিসনর সাহেবের আফিস আছে। জয়ন্তীয়া রাজ্য এখন - ২৩টী পরগণায় বিভক্ত; পার্ব্বতীয় অংশ খসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়ের অন্তর্ভুক্ত। ব্রহ্মখণ্ড ও দিগ্বিজয়প্রকাশ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে এই রাজ্যটীকে জয়ন্তরাজ্য নামে বঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত দেখা যায়। দেশাবলী মতে এখানে জয়ন্তেশী দেবী বিরাজমান। বারাহী ও বৃহন্নলী তন্ত্র প্রভৃতিতে ইহাকে মহাপীঠ বলিয়া

উল্লেখ করা হইয়াছে। সতীদেবীর বামজঙ্ঘা এই পর্ব্বতে পতিত হইয়াছিল। দেবীর নাম জয়ন্তী দেবী, ভৈরবের নাম ক্রমদীশ্বর। জয়ন্তীয়া পরগণায় থসিয়া নামক পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে দেবীর বাম উরু পতিত হইয়া সেই গ্রামটিকে অদ্যাপি বাউরভাগ বলিয়া থাকে। সেই পর্ব্বতের সানুদেশে প্রস্তরময় উরুর প্রতিকৃতি আছে। তন্ত্রে উল্লেখ আছে "জয়ন্ত বিজয়ন্তশ্চ সর্ব্বকল্যাণদং প্রিয়ে।" জয়ন্তেশী দেবী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালিনী লোলজিহ্বা কালীমূর্ত্তি মন্দিরমধ্যে স্থাপিতা। মন্দিরটী জঙ্গল মধ্যে পুরাতন বলিয়াই বোধ হয়। এখানে পূজাদি রীতিমত হইয়া থাকে, জয়ন্তীরাজের স্বাধীনতাকালে এখানে নরবলি দিবার প্রথা ছিল। এখানে যাত্রীদের থাকার বিশেষ কোন বন্দোবস্ত নাই, রাস্তা ঘাটও দুর্গম, এজন্য ইহা এক প্রকার লুপ্তপ্রায় তীর্থমধ্যে পরিগণিত হইতে বসিয়াছে।

শ্রীশৈলে মহালক্ষ্মী।

"শ্রীশৈলেচ মমগ্রীবা মহালক্ষ্মীস্তু দেবতা।
ভৈরবঃ সম্বরানন্দো দেশে দেশে ব্যবস্থিতঃ॥"

আসাম প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জিলাস্থিত পার্ব্বত্য ভূমিকেই শাস্ত্রে শ্রীশৈল নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান শ্রীহট্ট সহঁরের এক ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে গোটটীকর নামে একটী স্থান আছে, তথায় শিব টীলার উপরে ভৈরব সম্বরানন্দের এবং তন্নিকটেই জৈনপুর নামক স্থানে মহালক্ষ্মী নাম্নী সতী দেবীর পীঠস্থান আছে। জৈনপুরে দেবীর গ্রীবাদেশ পতিত হইয়াছিল। মহালক্ষ্মী দেবীর মন্দিরে পূজাদি হইয়া থাকে। যাত্রীগণ আপন ইচ্ছানুসারে দেবীর দর্শন, পূজন ও দক্ষিণাদি দান করিয়া থাকেন, পাণ্ডাগণের বিশেষ কোন বাঁধা নিয়ম নাই। চৈত্র মাসে আশোকাষ্টমীর সময় দেবীর মন্দিরসম্মুখে একটী বৃহতী মেলায় বহু লোকের সমাগম হয়। ফাল্গুনের শিব চতুর্দ্দশীর সময় ভৈরব-মহাদেব বাটীতেও মেলা হইয়া থাকে। অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হেতু সেই সময় এই স্থানে পুলীশ কর্ত্তৃক শান্তি রক্ষিত হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে নারায়ণগঞ্জ হইয়া ষ্টিম নেভিগেসন কোম্পানীর ষ্টিমারে মারকুলী তথা হইতে শ্রীহট্ট যাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত জাহাজ ভাড়া ৩৸৹ আনা মাত্র।

কামাখ্যা বা কামগিরি।

"যোনিপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা
যত্রাস্তে মাধবঃ সাক্ষাতুমানন্দোথ ভৈরবঃ।"

কামাখ্যা তীর্থে যাইবার জন্য দুইটি প্রশস্ত লাইন বিদ্যমান আছে (১) কলিকাতা হইতে ই, বি, রেল ও ষ্টিমার যোগে চাঁদপুর আসিয়া এ, বি, রেলে লামডিং জংসনে গাড়ী বদলাইয়া গৌহাটী (২) নারায়ণগঞ্জ হইতে রেলে জগন্নাথগঞ্জ ও তথা হইতে ষ্টিমারে গৌহাটি। কলিকাতা হইতে চাঁদপুর ২২৯ মাইল এবং তথা হইতে গৌহাটী ৪৬০ মাইল, ভাড়া ৯৸৶৬ আনা এবং কলিকাতা হইতে নারায়ণগঞ্জ ২৫৪ মাইল, ভাড়া ৩৶৯ পাই ও নারায়ণগঞ্জ হইতে জগন্নাথগঞ্জ ১৩৮ মাইল, ভাড়া ১৫৯ ও জগন্নাথগঞ্জ হইতে গৌহাটী ষ্টিমার ভাড়া ৩।৶০ আনা মোট ৮।৶০ আনা ভাড়া।

৺কামাখ্যাধাম শাক্ত হিন্দুদিগের ৫১ পীঠের একটী প্রধান পীঠ, ইহা আসাম প্রদেশের গৌহাটী জিলার অন্তর্গত। অম্বুবাচী ও শারদীয় পূজা উপলক্ষে এখানে বহুতর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। আমরা ১৩১০ সনের শারদীয় পূজার পূর্ব্বে ঢাকা ময়মনসিংহ রেলে জগন্নাথগঞ্জ ষ্টেসন পর্য্যন্ত যাইয়া গোয়ালন্দের মেইল ষ্টীমারে বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় আরোহণ করি। ক্রমাগত চলিয়া পর দিন প্রাতে ১০ ঘণ্টার সময় ষ্টীমার ধুবরী সহরে নঙ্গর করে, যাত্রীগণ স্নানাহার সম্পাদন করিয়া লয়। ধুবরী সহরটী ছোট হইলেও দেখিতে সুন্দর, সহরের দুই পার্শ্বেই সুপ্রশস্ত ব্রহ্মপুত্রের খরস্রোত বহমান, তটদেশে বণিকদিগের ও গবর্ণমেণ্টের আফিস ও আফিসারদিগের সুন্দর সুন্দর সৌধরাজি

সমুন্নত বৃক্ষাবলীর নিম্নে পরম রমণীয় দৃশ্যে সুশোভিত। দূরস্থ ধূসরবর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী তরঙ্গমালার ন্যায় উন্নত ও অবনত ভাবে আমাদের নয়নপথ অবরোধ করিল। ব্রহ্মপুত্রের বিপুল সৈকত ভূমি কাশকুসুমের ধবল সৌন্দর্য্যে অপরূপ শোভা সমন্বিত। এখানে উত্তর পূর্ব্ববঙ্গ রেলের ধুবরী লইনের শেষ সীমা। নেতা ধোপানীর ঘাট বলিয়া পদ্মাপুরাণে বেহুলার উপাখ্যানে যে একটী প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় তাহা ধুবরী সহরের দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মপুত্র নদের তটেই বটে। বড় একখণ্ড প্রস্তর যাহাতে ধোপানী কাপড় কাচিত তাহা ব্রিটীশ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক যত্নে রক্ষিত হইয়াছে; তদ্দৃষ্টে তদানীন্তন কালের লোকের বৃহদাকৃতির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

ষ্টীমার বেলা এগারটার সময় পুনঃ চলিতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোয়ালপাড়া সহরের কিঞ্চিৎ ভাটীতে নঙ্গর করে, নদীতে চর পড়ায় ষ্টীমার সহরের ঘাটে যায় না। দূরস্থ পর্ব্বতরাজি অতি মনোহর মেঘমালার ন্যায় বোধ হইল, একটি পর্ব্বতশৃঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আফিস গৃহাদি দৃষ্ট হইল। এখান হইতে বহুতর শাল বৃক্ষ বঙ্গদেশে নীত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহা স্বতন্ত্র জিলা ছিল, এখন ইহাকে গৌহাটীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটী মহকুমায় পরিণত করা হইয়াছে।

ষ্টীমার অল্পক্ষণ পরে চলিতে আরম্ভ করিয়া অবিরাম গতিতে শনিবার বেলা দশটার সময় আমাদিগকে গৌহাটী সহরের সদর ঘাটে নামাইয়া দিল। এখান হইতে কামাখ্যাদিষ্ঠাত্রী দেবীর নীলাচল পর্ব্বতের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গোপরি ৺ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির দেখা যায়। আমরা প্রায় তিন মাইল পথ হাঁটিয়া পর্ব্বতের সানুদেশে উপনীত হইলাম। পর্ব্বতে উঠিবার একটী মাত্র পথ; পথটী বাঁকা, প্রশস্ত প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান-শ্রেণীমণ্ডিত। পথের উভয় প্রান্তে দুইটী সিংহদ্বার। কিম্বদন্তি আছে, পুরাকালে ইহা রাজা নরকাসুর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল; বোধ হয়

শত্রু হইতে পুরী রক্ষা করার মানসেই এমত ভাবে দ্বারটীকে সুদৃঢ় করা হইয়াছিল। পথের পার্শ্বে স্থানে স্থানে পর্ব্বত গাত্রে নানাবিধ বিকট মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে।

আমরা এক মাইল পথ পর্ব্বতারোহণ করিয়া দেবীর মন্দিরপ্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটী অতি প্রাচীন, প্রস্তর ও ইষ্টক বিনির্ম্মিত, উপরে গোম্বুজ ও চূড়া, সম্মুখে নাটমন্দির। ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে ক্রমে ৬।৭ ফিট নীচে মৃত্তিকাভ্যন্তরে যাইতে হয়, একটী ভিন্ন দ্বার নাই। কি দিবায় কি রাত্রিতে প্রদীপের সাহায্য ভিন্ন বিশেষ কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। মন্দির মধ্যে সম্মুখেই দেবীর প্রতিমূর্ত্তি অষ্টধাতু নির্ম্মিত দশভূজা উচ্চবেদীতে সমাসীন। তৎসমীপে প্রতিনিয়ত বহুতর বলি ও ভোগাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে। দেওয়ালে ক্ষোদিত নানাবিধ মূর্ত্তির সঙ্গে কোচবেহারাধিপতি জনৈক স্বর্গীয় মহারাজার একটী প্রতিমূর্ত্তি আছে।

মন্দিরের নিম্ন স্থলে প্রস্তরে দেবীর প্রধান পীঠ যোনিমুদ্রা। কোন মূর্ত্তি নাই, হস্ত মাত্র প্রবিষ্ট হইতে পারে এমত একটী ছিদ্র হইতে প্রস্রবণ আকারে অবিরত জল নিঃসৃত হইতেছে। যাত্রীগণ এস্থানে পূজা ও জপাদি করিয়া দর্শন করে। দেবীর মন্দির ব্যতীত দশমহাবিদ্যার আরও দশটী বাড়ী আছে, তন্মধ্যে ভুবনেশ্বরীর বাড়ীই উল্লেখযোগ্য। তাহা কামাখ্যা দেবীর বাড়ী হইতে অনূ্যন অর্দ্ধ মাইল উচ্চ একটী পর্ব্বত-শৃঙ্গে স্থাপিত, বিগত ভূমিকম্পে মন্দির ভগ্ন হইলে দ্বারবঙ্গের মহারাজার সাহায্যে পুনঃ নির্ম্মিত হইয়াছে; ইহা নির্জ্জন শান্তিপ্রদ আশ্রম বিশেষ। এখানে পরম যোগী শ্রীঅভয়ানন্দ স্বামী বাস করেন, তাঁহার উদ্যমে বহু অর্থব্যয়ে সাধুদিগের জন্য একটী ধর্ম্মশালা স্থাপিত হইয়াছে।

আমরা পূজার কয়েক দিন এখানে ছিলাম, অষ্টমী ও নবমী পূজার দিন শত সহস্র লোকের সমাগম হয়, বহুতর ছাগ মহিষাদি জীব হত্যা হইয়া

থাকে। পাণ্ডারা পরম যত্নের সহিত যাত্রীদিগকে স্থান দেয়, অন্যান্য তীর্থের তুলনায় এথাকার পাণ্ডাদের ব্যবহার সন্তোষজনক।

দেবীর মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশিখরে, ব্রাহ্মণ পাণ্ডা, শূদ্র চাকর, নাপিত, মালাকার, মালী ইত্যাদি অন্যূন তিনশত ঘর লোকের বাস। গৃহাদি মৃত্তিকা নির্ম্মিত। দেয়ালের উপর বাঁশের চাল, ছনের ছানী। এখানে জলের বড়ই অভাব, সচরাচর ঝরণার জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে উহা দুষ্প্রাপ্য। দেবীর প্রাঙ্গনে একটী ছোট বাজার আছে, খাদ্য সামগ্রী প্রয়োজন মত পাওয়া যায়।

বিজয়ার দিন ভাসান দেখিবার জন্য আমরা গৌহাটী সহরে আসিয়াছিলাম, ব্রহ্মপুত্রের ধারে প্রায় দুই মাইল স্থান পর্য্যন্ত নানাবিধ বেশভূষায় সজ্জিত সহস্র সহস্র নরনারী সমবেত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে মেলা, বাজারে অগণিত পণ্যবীথিকায় স্ত্রী পুরুষ ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। নদীতে দৌড়ের নৌকার মিছিল, গীত বাদ্য, ও দেবী দশভুজার মূর্ত্তি। অতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আসামীগণ এই ভাসান দেখিতে আসিয়া থাকে; স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। যে কয়েকটী দুর্গামূর্ত্তি দেখিলাম তন্মধ্যে গৌহাটীর আমলাবর্গের কৃত কাঠামই অতি সুদৃশ্য ও মূল্যবান সাজ সজ্জায় সজ্জিত। ইহারা বহু ব্যয়ে উৎকৃষ্ট যাত্রাদলের গান দিয়াছিল। দেশীয় ঢোল সানাই গুলি বড়ই বিশ্রী, কিছুই উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

গৌহাটী সহরটী বড়ই মনোরম। ইহার পূর্ব্বধারে সুবিস্তীর্ণ ব্রহ্মপুত্র অপর তীরস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর আমূল বিধৌত করিয়া ধনুর আকারে বহমান, পশ্চিমে সমুন্নত পর্ব্বতমালা প্রাকারের ন্যায় বিস্তৃত। মধ্যে সমতল স্থান, পরিষ্কার প্রস্তরময় পথ, উভয় পার্শ্বে সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষ বিরাজ করিতেছে, নদীর ধারে গভর্ণমেণ্টের সুরম্য আফিসগৃহ ও রাজকর্ম্মচারিগণের আবাস বাটী গুলি নানাবিধ ফল ফুলের বৃক্ষাবলীদ্বারা

সুশোভিত এবং স্থানে স্থানে দূর্ব্বাদলমণ্ডিত লতাগুল্মাদিদ্বারা সজ্জিত ভূমিখণ্ড নয়নযুগলের তৃপ্তি সম্পাদন করে। কলেজ বাটী একটী প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। জলের কলের স্থানটী পরম রমণীয়। ব্যবসায়ী-দিগের মধ্যে মারোয়ারিই প্রধান। আসাম বেঙ্গল রেলের একটী শাখা রেল লামডিং হইতে এখানে আসিয়াছে।

গৌহাটী সহরে মাছ, তরকারি, দুগ্ধ ও ফলাদি অতি সুলভ। দেশীয় চাউল অতি মোটা সুতরাং অপেক্ষাকৃত উচ্চ মূল্যের বালাম চাউল খাইতে হয়। এখানে স্ত্রীস্বাধীনতা বেশী, স্ত্রীলোকেরাই হাট বাজার ও বেচাকিনি করিয়া থাকে।

আসামী স্ত্রী পুরুষ সকলেই কর্ম্মঠ, ইহারা অলস মসীজীবী বাঙ্গালী-দিগের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী নহে, উচ্চ শ্রেণীর আসামীদের মধ্যে বিলাতি সভ্যতার কিছু আভাস পড়িয়াছে। কিন্তু ইহারা স্বদেশজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে ভালবাসে। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলের বাটীতেই তাঁতের কাজ আছে। এণ্ডি মুগা ইত্যাদির চাষ এত বিস্তৃত হইয়াছে যে ফেনসী বাজারের প্রধান প্রধান মারোয়ারি দোকানে ইহারই এক মাত্র কারবার চলিতেছে। স্ত্রীলোকেরা কাপড়ে অতি সূক্ষ্ম সূচীর কাজ করিয়া থাকে, ইহাদের নির্ম্মিত কাঁসা পিত্তলের জিনিসগুলি গঠনে সুন্দর না হইলেও খাঁটি ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া সাদরে গৃহীত হয়।

ইহারা স্ত্রীপুরুষে একসঙ্গে কাজ করে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসে, পাহাড়িয়াদিগের ন্যায় ইহাদের নাসিকা চেপ্টা নহে, স্ত্রী-গুলি অপেক্ষাকৃত সুশ্রী। ধান্যই প্রধান ফসল, ভূমি অতি উর্ব্বরা, লোক-সংখ্যা অল্প, আবাদের উপযুক্ত বহুতর ভূমি পতিত রহিয়াছে, চাকুরীপিপাসী বাঙ্গালীগণ এদেশে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র খুলিলে যথেষ্ট লাভবান হইতে পারেন।

ব্রহ্মপুত্রনদীগর্ভে সহরের পূর্ব্ব দিকে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে কামাখ্যার

ভৈরব উমানন্দ মহাদেবের মন্দির। দ্বীপটী এক খণ্ড বৃহৎ পর্ব্বতশৃঙ্গ মাত্র। সমস্তই প্রস্তরময়, পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত পাহাড় মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের একটী স্রোতে মূল পর্ব্বত হইতে যেন ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে জলের প্রবল স্রোত বহমান। নৌকা ভাড়া করিয়া আমরা সেই দ্বীপে মহাদেব দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। এই ভৈরবের পূজা না করিলে কামাখ্যা দর্শন সফল হয় না। ইনি কামাখ্যা পীঠের ভৈরব উমানন্দ। এখানে মহাদেব লিঙ্গমূর্ত্তি নহেন। ইহা পিতল নির্ম্মিত পঞ্চমুণ্ড বিশিষ্ট শিব মূর্ত্তি। দেখিতে বড়ই সুন্দর; দর্শনে, পূজনে ভক্তির উদয় হয়। মন্দিরটি প্রস্তরনির্ম্মিত, ইহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর। প্রাচীরের বাহিরে সামান্য খোলা ভূমি অতি বৃহৎ কয়েকটি বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন, বানর ও উল্লুক (শুক্কো) গণ চরিয়া বেড়াইতেছে। চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মপুত্রের শ্বেত বারিবেষ্টিত কৃষ্ণ প্রস্তরের দ্বীপটি দেখিতে বড়ই সুন্দর এবং নিবিড় নিস্তব্ধতায় শান্তিপ্রদ বটে।

কামরূপের দক্ষিণ প্রান্তে পর্ব্বতোপরি একটি প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ আছে। কিম্বদন্তী এই যে, এই গৃহ চাঁদ সদাগরের নির্ম্মিত লক্ষ্মীন্দরের বাসর ঘর। ঘরটী এক দরজাবিশিষ্ট। বেহুলার কৌশলে ও নেতা ধোপানীর অনুগ্রহে কালনাগদংশিত লক্ষ্মীন্দর পুনর্জীবিত হয়েন। ধুবরী সহরে নেতা ধোপানীর ঘাট এবং কাপড় কাচার একখানা বৃহৎ প্রস্তর এখনও যাত্রীগণকে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

তেজপুরে আর একটী প্রস্তরগৃহের ভগ্নাবশেষকে তথাকার লোকে বাণরাজকন্যা ঊষা দেবীর প্রাসাদ বলিয়া থাকে এবং নওগাঁয় একটী পর্ব্বতোপরি বহু প্রস্তরপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপ আছে। প্রবাদ উহা হংসধ্বজ রাজার রাজধানীর চিহ্ন। আসাম পর্ব্বতে এরূপ প্রাচীন কীর্ত্তির বহু চিহ্ন নানা স্থানে দৃষ্ট হয়, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহার অনুসন্ধান করিলে অনেক লুপ্ত কীর্ত্তির উদ্ধার হইতে পারে।

সুগন্ধায় সুনন্দাদেবী।

"সুগন্ধায়াঞ্চ নাসিকা দেবস্ত্র্যম্বক নামাথ সুনন্দা তত্র দেবতা।"

বরিশাল সহরের প্রায় দ্বাদশ মাইল উত্তরে শিকারপুর গ্রামে সুগন্ধা নামক মহাপীঠ। ইহার বর্ত্তমান নাম সোঁধা, গঙ্গার শাখা হইতে এই নামের উদ্ভব। দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণে সতীদেবী জগতে সতীর আদর্শ দেখাইবার জন্যই প্রাণ পরিত্যাগ করেন্। মহাদেব সতী-শোকে অধীর হইয়া, সতীদেহ স্কন্ধে বহন করতঃ উন্মত্তের ন্যায় ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণু চক্র দ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন; যে যে স্থানে সতীদেহ পতিত হইয়াছিল তাহাই মহাপীঠ নামে খ্যাত। প্রত্যেক পীঠস্থানে আদ্যাশক্তির চিন্ময় দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাতে যেমন মহামায়ার আবির্ভাব হইয়াছে, তদ্রূপ মহাদেবেরও এক একটী ভৈরব মূর্ত্তি আছে। এখানে দেবীর নাসিকা পতিত হইয়াছিল, দেবীর নাম সুনন্দা এবং ভৈরবের নাম ত্র্যম্বক। দেবীর নাসিকা পতিত হওয়ায় স্থানের নাম সুগন্ধা হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে। এখানে যথারীতি অর্চ্চনাদি হইয়া থাকে, বিশেষ কোন জাঁকজমক নাই। বিদেশী যাত্রীর সমাগম অধিক হয় না। কলিকাতা আর্ম্মাণি ঘাট হইতে ষ্টিমার রাত্রি দশ ঘটিকার সময় বরিশালাভিমুখে রওনা হইয়া চতুর্থ দিন প্রাতে বরিশাল পহুঁছে। ভাড়া ২।৵৬ আনা। নারায়ণগঞ্জ হইতে যাঁহারা বরিশাল আসিবেন, তাঁহাদের ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর ডাউন কাছাড় ষ্টিমারে আসাই সুবিধা।

যশোরে যশোরেশ্বরী।

"যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী
চণ্ডশ্চ ভৈরবস্তত্র যত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥"

যশোরে দেবীর পাণিপদ্ম পতিত হইয়াছিল। দেবীর নাম যশোরেশ্বরী এবং ভৈরবের নাম চণ্ড। এখানে যথারীতি দেবীর আরাধনায় সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যশোর সহর কলিকাতার উত্তরপূর্ব্বদিকে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে রেলপথে বসিরহাট পর্য্যন্ত রেল ভাড়া ৸৶০ আনা; তথা হইতে হিঙ্গনগঞ্জহাট ৴০ আনা। হিঙ্গনগঞ্জ হইতে ঈশ্বরীপুর পীঠস্থান ১৪ মাইল। রবিবার ও বৃহস্পতিবারে নৌকায় যাওয়া যায়, পদব্রজেও যাইতে পারা যায়, পথ ভাল নহে। কলিকাতা বেলেঘাটা হইতে নৌকা-যোগে পীঠস্থানে যাইতে পারা যায়, নৌকা ভাড়া করিয়া গেলে অধিক ব্যয় পড়ে। ইহা কলিকাতা সদর প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সুন্দরবন প্রদেশ। এক সময়ে ইহা হিন্দু কায়েস্থ রাজার অধীনে একটি বিশাল রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। ইহার রাজধানী ধূমঘাট তাৎকালিক গৌড় নগরী অপেক্ষাও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল বলিয়া কথিত। গৌড় নগরীর যশশ্রী হরণ করিয়াছিল বলিয়াই রাজ্যের নাম যশোহর হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে পীঠস্থান ঈশ্বরীপুর গ্রাম খুলনা জিলার সাতক্ষিরা সবডিভিসনের অধীন। সাতক্ষিরা পূর্ব্বে যশোরের অন্তর্গত ছিল, এখন খুলনা পৃথক জিলা হওয়ায় তাহার অধীন। যশোরেশ্বরী দেবীর বিবরণ যশোর-রাজবংশের ইতিহাসের সহিত জড়িত, সুতরাং তদানীন্তন যশোহর রাজবংশের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গেশ্বর দায়ুদের প্রধান অমাত্য পদে রাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্তরায় নিযুক্ত ছিলেন। দায়ুদ ধন ও

সৈন্যবলে বলীয়ান্ হইয়া মোগল দুর্গ অধিকার করেন। মোগল সম্রাট্ বিদ্রোহী নবাবকে দমন করিবার জন্য সেনাপতি মোনেম খাঁ ও রাজা তুদরমল্লকে প্রেরণ করেন। দায়ুদ যুদ্ধের পূর্ব্বেই রাজকোষের সমস্ত ধনরত্ন গোপনে স্থানান্তরে রাখিবার জন্য বিশ্বাসী অমাত্যদ্বয়কে আদেশ করেন; তদনুসারে ভ্রাতৃদ্বয় সমস্ত ধনরত্ন সমভিব্যাহারে ধুমঘাট নামক স্থানে আসিয়া নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করেন। তাঁহাদের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হওয়ায় রাজমহলের যুদ্ধে দায়ুদ পরাজিত ও নিহত হয়েন, সুতরাং তাঁহারাই সেই অতুল ধনরত্নের অধিকারী হইলেন। বঙ্গদেশ মোগল শাসনাধীন হইলে মহারাজ তুদরমল্ল তাহার বন্দোবস্তের জন্য আদিষ্ট হন, তৎকালে রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের সহায়তায় তুদরমল্ল সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপে দিল্লি-দরবার হইতে তাঁহারা সুন্দরবন প্রদেশের রাজত্বের ফরমাণ প্রাপ্ত হন এবং ভাগীরথী হইতে সমুদ্র-তট পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশে এক বিশাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহারা অর্থব্যয়ে বহু সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিগণকে আনিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে যশোহর নগরের নানাপ্রকার সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্যে গৌড়নগরী বীতশ্রী হইয়াছিল। সুন্দরবন মধ্যে অদ্যাপি ধ্বংসাবশিষ্ট উচ্চ উচ্চ প্রাসাদ, তোরণ, প্রাচীর, গড় ইত্যাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং মৃত্তিকাদি খনন করিতে প্রস্তরনির্ম্মিত কড়ীকাঠ, জানালা, দরজা বিশিষ্ট মন্দির, ভগ্ন সৌধাবলীর অনেক প্রাচীন চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রতাপাদিত্য নামে এক পুত্র ছিল। তিনি বাল্যকাল হইতেই বলবান্, সাহসী ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। দিল্লির দরবারে তৎকালে রাজাদিগের এক এক জন প্রতিনিধি থাকার রীতি ছিল, যশোহররাজ-পক্ষে দিল্লিতে প্রতিনিধিস্বরূপ থাকিয়া তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা রাজনীতি, যুদ্ধনীতি ইত্যাদির কৌশল শিক্ষা করিয়া চক্রান্তপূর্ব্বক পিতা ও খুল্লতাতের নামের পরিবর্ত্তে যশোহর রাজত্বের ফরমাণ স্বয়ং প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি মহারাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়া স্বীয় বুদ্ধি ও বাহুবলে বঙ্গের দ্বাদশ ভুঞার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন এবং স্বাধীন পতাকা উড়াইয়াছিলেন।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য কালীদেবীর সেবক ছিলেন। কালী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জনপ্রবাদ ছিল। যশোহর ধূমঘাটের সন্নিকটে বনমধ্যে রাত্রিকালে এক স্থান হইতে রক্তবর্ণ শিখা গগনাভিমুখে ধাবিত হইত। মহারাজ প্রতাপাদিত্য প্রত্যাদেশ অনুসারে সেই স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া যশোরেশ্বরীদেবীকে স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নামানুসারে ঐ স্থানের নাম ঈশ্বরীপুর রাখিয়াছিলেন। এই নাম অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূজার জন্য যে বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন তন্মধ্যে ঈশ্বরীপুর গ্রাম সেবাইতগণ ব্রিটীশ রাজত্বেও ভোগ করিতেছেন। প্রতাপাদিত্য প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্ত্তি ও মন্দির বর্ত্তমান আছে। মুখ ভিন্ন মায়ের মূর্ত্তির অন্য কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই এবং মন্দিরের ছাদ মধ্যে কতটুকু স্থান ফাঁক্ আছে। প্রবাদ আছে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সাতদিন পর্য্যন্ত কপাট বন্ধ রাখার স্বপ্নে আদেশ হইয়াছিল। মহারাজ মন্দির প্রস্তুত পূর্ব্বক চারিদিন মাত্র দ্বার বন্ধ রাখিয়া স্বীয় ইষ্টদেবীর অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিলেন, দেবীর সম্পূর্ণ অবয়ব প্রকাশিত না হইয়া কেবল মুখের অংশ মাত্র প্রকাশ পাইয়াছে; রাজার ব্যস্ততার জন্য দেবীর পূর্ণমূর্ত্তি প্রকাশিত হয় নাই। যশোরেশ্বরী দেবীর মূর্ত্তি ত্রিনয়না, লোলজিহ্বা,—একখানি মুখমণ্ডল মাত্র। দেবী জ্বালাময়ী, সেই জন্য ছাদ যত বার দেওয়া হইয়াছিল, তত বারই ফাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং শেষবার রন্ধন শালার ধূম নির্গমনের পথের ন্যায় একটী ছিদ্র রাখা হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের যশ বল সমস্তই দেবীপ্রতিষ্ঠার পর বৃদ্ধি

হওয়ায় লোকে তাঁহাকে দেবীর বরপুত্র বলিত; যুদ্ধ কালে কেহ তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিত না, সেই জন্য বঙ্গের কবি ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর গাহিয়াছেন—

"যশোহর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়েস্থ
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বাহান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধ কালে সেনাপতি কালী॥

রাজা বসন্ত রায় মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রতাপাদিত্যকে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, প্রতাপ তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। এই সময় প্রতাপাদিত্যের রাজত্ব ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কালীঘাটের নিকটেই ও নৈহাটীতে গঙ্গাবাসের জন্য বসন্তরায়ের প্রাসাদ ছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য অমিত বলদৃপ্তে গর্ব্বিত হইয়া স্বেচ্ছাচারী ও পাপে মগ্ন হইয়াছিলেন। পিতৃব্য বসন্তরায়কে চক্রান্ত করিয়া হত্যা করেন। নিজ কন্যা বিন্দুবাসিনীর জামাতা, চক্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়কেও হত্যা করিতে চেষ্টা করিলে তিনি কৌশলে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। এদিকে দিল্লির রাজস্ব প্রেরণে ক্ষান্ত হওয়ায় তাঁহাকে নির্য্যাতন জন্য দিল্লি হইতে সসৈন্যে মহারাজ মানসিংহ আসিয়া তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় করিয়া বন্দী করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দেবীও অন্তর্ধান হইলেন। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে নানাবিধ প্রবাদ বাক্য আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা লেখা গেল না।

কালীঘাটে কালী

"নকুলীশঃ কালীপীঠে দক্ষপাদাঙ্গুলীষুচ
সর্ব্বসিদ্ধিকরী দেবী কালিকা তত্র দেবতা।"

কলিকাতার প্রায় চারি মাইল দক্ষিণে আদি গঙ্গার পূর্ব্ব পারে কালীঘাট। এখানে সতী দেবীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুলি পতিত হইয়াছিল, ইহা মহাপীঠ। দেবীর নাম কালিকা, ভৈরব নকুলেশ্বর। নারায়ণগঞ্জ হইতে শিয়ালদহ ভাড়া ৩৵১৫ পাই, শিয়ালদহ হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত ট্রামের ভাড়া ৵৩ পাই, ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া দেড় টাকা। ট্রাম গাড়ী হইতে কালীবাড়ী যাইবার পথে নকুলেশ্বর-মহাদেবের মন্দির। কালীবাড়ীর সিংহ দরজা হইতে বরাবর পশ্চিমে গঙ্গা পর্য্যন্ত সড়ক আছে, গঙ্গাতে সুপ্রশস্ত সিঁড়ি বাঁধা ঘাট, সড়কের দুই ধারে নানাবিধ উপকরণাদি সমন্বিত দোকান শ্রেণী। গঙ্গাতে স্নান, তর্পণ ও দানাদি করিয়া কালী দর্শন করিতে হয়। কালীবাড়ীর চতুর্দ্দিকই প্রাচীর ঘেরা, সিংহদরজার উপরেই নহবত; আঙ্গিনার মধ্যে নাট মন্দির, মারবেলপ্রস্তরনির্ম্মিত মেজে, নাট মন্দিরের উত্তরে কালী মন্দির, আকার দেখিলেই উহার প্রাচীনত্ব স্বীকার করিতে হয়। নাট মন্দিরের দক্ষিণেই বলির স্থান, প্রতি দিন বহু ছাগ বলি হইয়া থাকে। পূর্ব্ব দিকের ঘরে ভোগ হয়। পশ্চিম উত্তর দিকে ঠাকুর-বাড়ী ও দোল মঞ্চ, এতদ্ভিন্ন আরও ঘর আছে। মন্দিরের ভিত্তি উচ্চ, মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে পশ্চিম দক্ষিণ কোণের সিঁড়ি দিয়া উত্তর দিক ঘুরিয়া পূর্ব্ব দরজায় প্রবেশ করিতে হয়, ও দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়া নামিতে হয়। সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইয়া দর্শন করিতে হয়, প্রবেশ জন্য একটী মাত্র পয়সা দিতে হয়। কালীমন্দিরের মধ্যস্থান নিম্ন, কয়েক

কালীঘাটের কালীমূর্ত্তি

সিঁড়ি নীচে নামিলেই লৌহনির্ম্মিত রেল বেষ্টিত সুবর্ণমণ্ডিত চতুর্হস্ত সমন্বিত, স্বর্ণকীরিটসুশোভিনী, লোলজিহ্বা, মুণ্ডমালাধারিণী বিরাট কালীমূর্ত্তি !

এখানে বহু পাণ্ডা আছেন। কালী মাতার সেবাইতগণই পাণ্ডার কার্য্য করিয়া থাকেন। যাত্রিগণ আপন পাণ্ডা সহ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রতিমা দর্শন করতঃ পূজা ও অঞ্জলি দান করিয়া, ডালি ভোগ যাহা ইচ্ছা দিতে পারেন; পূজা পঞ্চোপচার হইতে যোড়শোপচারে দিতে পারেন। দক্ষিণার বাঁধা নিয়ম নাই, যাঁহারা বলি দেন তাঁহাদিগকে তদ্দরুণ অতিরিক্ত দিতে হয়। ডালি এক আনা হইতে উর্দ্ধে যত মূল্যের ইচ্ছা দেওয়া যায়। পাণ্ডার কোন অত্যাচার নাই, যাত্রী সন্তুষ্ট হইয়া যাহা কিছু দেন তাহাতেই সন্তুষ্ট, না দিলেও দর্শনের কোন বাধা নাই। শনি-মঙ্গলবার, অমাবস্যা, দুর্গোৎসব, যুগাদ্যা, দ্বীপান্বিতা, ও বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে এবং পৌষ মাঘ মাসে শত সহস্র লোকের সমাবেশে এমত ভিড় হয় যে, তখন মন্দিরপ্রবেশ কি কালীদর্শন দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। একবার গ্রহণের সময় আমরা দর্শনে যে কষ্ট ভোগ করিয়াছিলাম তাহা চিরকাল স্মরণ থাকিবে। বর্ত্তমান সনে কালীমন্দিরের অতি সুন্দর রূপে সংস্কার করা হইয়াছে। ভিত্তি, মেজ, দেওয়াল সিঁড়ি ইত্যাদি সমস্ত মার্ব্বেল ও নানাবিধ বর্ণের বিলাতি পাথরে মণ্ডিত করা হইয়াছে। বারান্দার উপরে ছাদ দেওয়া হইয়াছে, জানা যায় ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের হরিচরণ সাহু খাবার দোকানের আয় হইতে বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া এই পুণ্য কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এখানে কোন ধর্ম্মশালা নাই, যাত্রী থাকার জন্য বাজারে অনেক বাসা বাড়ী আছে। অন্যতম পাণ্ডা বদান্যবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও আনুকূল্যে কালী বাড়ীর দক্ষিণ দিকে উপেন্দ্র কুটির নামে একটী ধর্ম্মশালা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে যাত্রিগণ বিনা ভাড়ায় থাকিতে পারেন। উপেন্দ্র-কুটিরে শাস্ত্রা-

লোচনার জন্য একটী চতুষ্পাঠী আছে এবং কালী-মন্দিরের নিকট শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরীর মন্দিরে তৎপুত্র কান্তি চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতি যত্নের সহিত পাণ্ডার কার্য্য করিয়া থাকেন, পূর্ব্ববঙ্গের বহু লোক ইঁহাদের ব্যবহারে বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছেন।

কথিত আছে, পুরাকালে কালীঘাট নিবিড় অরণ্য ছিল। তখন আদি গঙ্গার পরিসর অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্মুখের মোহনায় বালির চর পড়িয়া ভরট হইয়া আলিপুর সহর হইয়াছে। পূর্ব্ব স্রোত বন্ধ হইয়া পশ্চিম দিকে সরিয়া বড় গঙ্গা নামে সাগরে মিলিত হইয়াছে। কালীবাড়ীর পার্শ্বে সঙ্কীর্ণ একটী গঙ্গাস্রোত আদি গঙ্গার পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। উক্ত অরণ্য মধ্যে দেবী পীঠ বহুকাল লুক্কায়িত ছিল। একজন কাপালিক সেই অরণ্য মধ্যে বাস করিতেন; তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া জ্যোতির্ম্ময় শিলারূপিণী দেবীর দর্শন পান এবং শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে দেবীর অর্চ্চনা করিতেন। দৈবযোগে একজন বণিক বাণিজ্যপূর্ণ নৌকাসহ গঙ্গা নদী পথে যাইবার সময় অরণ্য মধ্যে শঙ্খ ঘণ্টাদির রবে আকৃষ্ট হইয়া কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, এক স্থানে একজন সাধু ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। সাধুর ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে একজন লোককে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া, তাহাকে সাদরে বসাইয়া দেবী সম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। বণিক সেই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলি শ্রবণে ভক্তিভাবে অঙ্গীকার করিলেন যে, এবারের বাণিজ্য-লব্ধ অর্থ দ্বারা দেবীর মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিবেন। বণিক ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান হইয়া, এই স্থানের জঙ্গল কাটাইয়া মন্দির প্রস্তুত করাইলেন; তন্মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় প্রস্তর খণ্ড স্থাপন করিয়া তদুপরি দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলে চতুর্দ্দিকে মায়ের মহিমা প্রকাশ হইয়া পড়িল। কিছুকাল কাপালিকই মায়ের পূজা করিয়াছিলেন। তদনন্তর চণ্ডীবর নামক জনৈক তপস্বীর প্রতি দেবীর পূজার ভার ন্যস্ত হয়। চণ্ডীবরের

উমানাম্নী এক কন্যা ছিল, ভবানীদাসের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। উমাদেবীর গর্ভে ভবানীর চারি পুত্র জন্মিয়াছিল ; ভবানী দাসের পূর্ব্ব স্ত্রীর গর্ভজাত এক পুত্র ছিল। ভবানীদাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পাঁচ পুত্রই মায়ের পূজা করিতেন। বড়িয়ার সাবর্ণ চৌধুরী জমিদারগণ দেবীর মালিক ছিলেন, তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে পূজার আয় না থাকায় চৌধুরী মহাশয়গণ মায়ের সমস্ত স্বত্ব উক্ত পূজারী হালদারদিগকে দান করেন। মোসলমান রাজত্ব সময় বঙ্গদেশ বহু হাওলায় বিভক্ত ছিল ; নবাব সরকার হইতে ইঁহাদের উপর হাওলার কর আদায়ের ভার অর্পিত হওয়াবধি ইঁহারা হাওলাদার উপাধিতে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ভবানীদাসের অধস্তন বংশধর ও দৌহিত্রগণই নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া কালীমাতার পাণ্ডা ও সেবাইতস্বরূপে অধিকারী। কালক্রমে মায়ের যথেষ্ট আয় ও দেবোত্তর সম্পত্তি হইয়াছে। হালদার বংশ বৃদ্ধি হওয়ায়, সেবার কোন বিশৃঙ্খল না ঘটিবার জন্য, একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা হইয়াছে। সভ্যগণের মতানুসারে যাবতীয় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়।

কালীবাড়ীর পূর্ব্ব উত্তর দিকে, ভৈরব নকুলেশ্বরমহাদেবের সুন্দর মন্দির, ইহার চতুর্দ্দিক খোলা ও রেলিং দেওয়া। মধ্যস্থলে একটী কুণ্ডের ন্যায় গর্ত্ত আছে, তন্মধ্যে লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজমান। এখানেও দরজার সম্মুখে একজন পাণ্ডা বসিয়া থাকেন ; একটী পয়সা দর্শনি দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। গঙ্গাজল, পুষ্প, বিল্বপত্র ও নৈবেদ্য এখানে ইচ্ছা মতে ক্রয় করিয়া মহাদেবের অর্চ্চনা করা যায় ও দক্ষিণা দিতে পারা যায়। পূর্ব্বে সামান্য কুটীর ছিল, তারাসিংহ নামক জনৈক পাঞ্জাবী সদাগরের অর্থে এই সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। কালীঘাটে শ্যামরায় ও গোবিন্দ জিউ নামে অপর দুইটী প্রাচীন বিগ্রহমূর্ত্তি আছে।

ক্ষীরগ্রামে দেবী যোগাদ্যা।

"ভূতধাত্রী মহামায়া ভৈরবঃ ক্ষীরকণ্ঠকঃ।
যোগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠঃ পদোমম॥"

বৰ্দ্ধমান জেলায় সদর রেলষ্টেসনের ২০ মাইল উত্তরে এবং হুগলী-কাটোয়া রেলে দাইহাট কিম্বা কাটোয়া ষ্টেসনের প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ক্ষীরগ্রাম নামে একটী গণ্ড গ্রাম আছে, ঐ গ্রামটী সতী পীঠ নামে কথিত। শ্রীবিষ্ণুচক্র পরিক্ষত সতীদেবীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ এথানে পতিত হইয়াছিল। ইহা মহাপীঠ, দেবীর নাম যোগাদ্যা মহামায়া এবং ভৈরবের নাম ক্ষীরকণ্ঠ। এই ভৈরবের নামানুসারেই গ্রামের নামও ক্ষীরকণ্ঠ হইয়াছে। বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে দেবীর বাড়ীর সম্মুখে একটী মেলা হয়; তৎকালে চতুষ্পার্শ্বের গ্রামসমূহ হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে বৰ্দ্ধমান ৬৭ মাইল, রেলভাড়া ৸৵০ আনা। তথা হইতে দুই টাকায় একটী গরুর গাড়ী ভাড়া করিলে কিম্বা পদব্রজে পীঠ স্থানে যাওয়া যায়।

বহুলাদেবী

"বহুলায়াং বামবাহুর্ব্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরবস্তত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥"

বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটোয়া নামক একটী সুপ্রসিদ্ধ সবডিবিসন আছে। এই কাটোয়া নগরীতে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে, নিমাই পণ্ডিত লোক শিক্ষা দিবার জন্য গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বর পুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র নামে সমস্ত ভারতে ঈশ্বরাবতাররূপে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও নাম মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই কাটোয়া তদবধি প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কাটোয়া হইতে ৮ মাইল ব্যবধানে কেতুগ্রাম নামে একটী গ্রাম আছে। তথায় সতীদেবীর বামবাহু পতিত হইয়াছিল বলিয়া উহাকে বহুলা বলে। এখানে পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম বহুলা। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক ভৈরবের নাম ভীরুক। কালীবাড়ী সিদ্ধিপীঠই বটে। হাবড়া হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত রেল হইয়াছে, বাণ্ডেল ষ্টেসনে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। কলিকাতা আহেরীটোলা ঘাট হইতে ষ্টীমারে ৸৵০ আনা ভাড়ায় কাটোয়া পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, তথা হইতে পীঠ স্থানে পদব্রজে যাইতে হয়।

নন্দিপুরে নন্দিনী।

"হারপাতো নন্দিপুরে ভৈরবঃ নন্দিকেশ্বরঃ।
নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধির্নসংশয়ঃ ॥"

বীরভূম জিলায় সাঁইথিয়া নামক স্থানের সন্নিকটে এই পীঠস্থান। পুরাকালে বোধ হয় স্থানের নাম নন্দিপুর ছিল, কালে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সাঁইথিয়ায় ইষ্টইণ্ডিয়া রেলের লুপ লাইনের একটী ষ্টেসন আছে। কলিকাতা হইতে সাঁইথিয়া ১১৯ মাইল, ভাড়া ১৷৶৬ পাই। সাঁইথিয়া একটী জংসন। নিকটে বড় বাজার আছে। যাঁহারা এই তীর্থ দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা হাবড়া হইতে লুপ লাইনের গাড়ীতে কিম্বা বর্দ্ধমান ছাড়াইয়া খানা নামক জংসনে গাড়ী বদলাইয়া সাঁইথিয়া আসিতে পারেন। ষ্টেসনের নিকটেই পীঠ স্থান কালীবাড়ী। নিকটে গ্রাম ও বহুলোকের বাস আছে। এখানে দেবীর কোন মূর্ত্তি নাই এবং মন্দিরও নাই। দুইটী বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে, তাহার মধ্যস্থানে, প্রস্তর বাঁধা বেদী বা আসন। এখানে সতীদেবীর গলার হার পতিত হইয়াছিল। দেবীর নাম নন্দিনী, ভৈরবের নাম নন্দিকেশ্বর। পীঠস্থানের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর আছে। কথিত আছে, এই স্থানের চারিদিক প্রাচীর ঘেরা থাকিতে পারে না, দৈবশক্তি বলে কোন না কোন স্থান ভাঙ্গিয়া পড়ে। পূজারীর বাড়ী কিছু দূরে, মধ্যাহ্ন কালে পূজা দিবার মানসে গ্রাম হইতে আসিয়া থাকেন এবং পূজান্তে বাড়ী চলিয়া যান। কালীবাড়ী সদাই নির্জ্জন, সাধনার স্থান। পূজায় বিশেষ আড়ম্বর নাই; যাত্রিগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দেয় তাহাতেই পাণ্ডাগণ সন্তুষ্ট—দ্বিরুক্তি করেন না। পূজার উপকরণাদি নিকটবর্ত্তী বাজারে পাওয়া যায়। শনিবার ও বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে যাত্রী-সমাগম অধিক হয়। বাজারে থাকিবার বাসা পাওয়া যায়।

অট্টহাসে ফুল্লরাদেবী।

"অট্টহাসে চৌষ্ঠপাতো দেবী সা ফুল্লরা স্মৃতা।
বিশ্বেশো ভৈরব স্তত্র সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ॥

বীরভূম জিলার অধীন লাভপুর নামক একটী গ্রাম আছে, তথায় সতীদেবীর ওষ্ঠ পতিত হইয়াছিল। ইহাকে মহাপীঠ কহে। দেবীর নাম ফুল্লরা এবং ভৈরবের নাম বিশ্বেশ। লাভপুর ইষ্টইণ্ডিয়া রেলের লুপ লাইনের আমুদপুর নামক ষ্টেসন হইতে ৭ মাইল ব্যবধান। হাবড়া হইতে আমুদপুর ১১১ মাইল ভাড়া ১৷৵৬ আনা, প্রসিদ্ধ বোলপুরের উত্তরে একটী মাত্র ষ্টেসনের পরই আমুদপুর। আমুদপুর হইতে পদব্রজে কিম্বা যান বাহনেও যাওয়া যায়। এখানে দেবীর মূর্ত্তি অতিভয়াবহ ও আশ্চর্য্য-জনক। বিশাল শিলামূর্ত্তি—অধরোষ্ঠের আকৃতিই ১০।১২ হাত হইবেক। ভৈরব শিবলিঙ্গমূর্ত্তি নিকটেই স্থাপিত। শনিবার ও অমাবস্যা ও বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে যাত্রী সমাগম হয়। পুরোহিত পাণ্ডাগণ নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে আসিয়া পূজা দেন। এখানে থাকার সুবিধা নাই; বিশেষ পূজার দ্রব্যাদি আমুদপুরের বাজার হইতে না আনিলে পাওয়া যায় না; এখানে সামান্য মাত্র পাওয়া যায়। এই স্থানের শিবাবলি একটী দেখিবার বিষয়। মায়ের পূজার মহাপ্রসাদ কিম্বা যাত্রী-প্রদত্ত ভোগাদি শিবাবলিরূপে প্রদান করিলে, বহুলোকের মধ্যবর্ত্তী ভোগ ও বলি শৃগাল আসিয়া অকুতোভয়ে লইয়া যায়।

বক্রেশ্বরে মহিষমর্দ্দিনী।

"বক্রেশ্বরে মনঃপাতো বক্রনাথস্তু ভৈরবঃ।
নদীপাপহরা তত্র দেবী মহিষমর্দ্দিনী॥"

ইষ্ট ইণ্ডিয়া লুপ রেল লাইন আসানসোল হইয়া উত্তরাভিমুখে গিয়াছে, ঐ লাইনে বোলপুর নামক একটী প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকর স্থান আছে। এখানে আদি-ব্রাহ্মসমাজের মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নামক প্রকাণ্ড আশ্রম বিদ্যমান। মহর্ষি প্রথম জীবনে এখানে সাধনা করিতেন, তাঁহার আশ্রম বাড়ী ও সাধনার স্থান দর্শন করিলে মনে আনন্দ ও পবিত্র ভাবের সঞ্চার হয়। বঙ্গদেশীয় বালকবৃন্দকে এই আশ্রমে রাখিয়া আর্য্যদিগের গুরুগৃহে বাসের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত বিহিত ব্রহ্মচর্য্যাদি বিধানানুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে ৭।৮ বৎসরের শিশুগণও আত্মীয়-স্বজনবিচ্ছিন্ন হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে। এই বোলপুরের ২০ মাইল উত্তরে আমুদপুর ষ্টেসনের ১০ মাইল ব্যবধানে বক্রেশ্বর নামক মহাপীঠ। কলিকাতা হইতে আমুদপুরের রেলভাড়া ১।৶৯ পাই। ষ্টেসন হইতে পীঠস্থানে হাঁটিয়া যাইতে হয়। সতীদেবীর ভ্রূমধ্য বা মন এখানে পতিত হইয়াছিল, দেবীর নাম মহিষমর্দ্দিনী, ভৈরবের নাম বক্রনাথ। নিকটেই পাপহরানাম্নী নদী বহমান। পীঠস্থানের চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত। মন্দির প্রাচীন ধরণের, সিঁড়ি দিয়া নিম্নদিকে গেলেই দেবী দর্শন করা যায়। দেবী অষ্টধাতু বিনির্ম্মিত। ভৈরব অষ্টবক্রেশ্বরও সেই ধাতু নির্ম্মিত। এখানে অধিক যাত্রীর সমাগম হয়। মায়ের বাটী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পাণ্ডাদিগেরও যথেষ্ট আয় আছে। পাণ্ডাদের বাটী মন্দির হইতে ব্যবধান, পাণ্ডার বাটীতে

থাকা যায় ; যাত্রিগণ প্রথম যে পাণ্ডার সাক্ষাৎ পান, তাঁহাকেই পাণ্ডা স্বীকার করিতে হয়। পাণ্ডা সঙ্গে থাকিয়া এখানকার সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন করাইয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহাকে পৃথক্ কিছু দক্ষিণা দিতে হয়। পূজার কোন বাঁধা নিয়ম নাই। দেবীর সম্মুখে বলি হয়। কথিত আছে, পুরাকালে এখানে মহর্ষি অষ্টাবক্র তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

পাপহরা নদীর জল বড়ই আশ্চর্য্য। নদীর জল গভীর নহে, নীচের বালুকারাশি পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। দেবীর মন্দিরের সম্মুখে ৪।৫ শত হাত পর্য্যন্ত স্থানের নদীর জল অত্যুষ্ণ। ইহার উত্তর দক্ষিণ উভয় দিকের জল স্বাভাবিক শীতল। এই জল সর্ব্বদাই উষ্ণ থাকে, এই উষ্ণ জলে স্নান করিলে পাপ বিনাশ হয় বলিয়া ইহা পাপহরা নদী নামে খ্যাত। যাত্রীদিগকে এই উষ্ণ জলে স্নান-তর্পণ করিতে হয়। এই তপ্তনদী ভিন্ন আরো তিনটী কুণ্ড আছে, দুইটীর জলই উষ্ণ, একটীর জল শীতল। উষ্ণ কুণ্ড মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যের পণা দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাবক্র মন্দিরের অপর দিকে ৬০।৭০ হস্ত দীর্ঘ একটী জলের নালা আছে, তাহার কতক স্থানের জল উষ্ণ ও কতক স্থান শীতল। এই সমস্ত উষ্ণ জল মন্ত্রপূর্ব্বক স্পর্শ করিয়া পাণ্ডার দক্ষিণা দিতে হয়। শীতল ও উষ্ণ জলের সংযোগ-স্থলে হস্ত প্রসারণ করিলে এক অঙ্গুলীতে উষ্ণতা ও অপর অঙ্গুলীতে শীতলতা অনুভূত হয়। পাণ্ডারা, অজ্ঞ যাত্রী, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক-দিগকে এ সব দেখাইয়া কিছু বিশেষ দক্ষিণা আদায় করিয়া থাকে।

নলহাটীতে কালিকাদেবী।

"নলহাট্যাং নলাপাতো যোগীশো ভৈরব স্তথা।
তত্র সা কালিকাদেবী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা॥"

বীরভূম জিলায় রামপুরহাট সবডিবিসনের উত্তর পূর্ব্বদিকে নলহাটী নামে অতি প্রাচীন একটী গ্রাম। সতীদেবীর গলনলী এখানে পতিত হওয়ায় ইহা ৫১ পীঠের অন্যতর পীঠস্থান। নলী পতন হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম নলহাটী হইয়াছে। এখানে দেবীর নাম কালিকা, এবং ভৈরবের নাম যোগীশ মহাদেব। স্থানীয় লোকেরা ইঁহাকে ললাটেশ্বরী বলিয়া থাকে। নলহাটী ইষ্টইণ্ডিয়া রেলের একটী জংসন ষ্টেসন, আজীমগঞ্জ ব্রেঞ্চরেলের সহিত সংযুক্ত। হাবড়া হইতে ১৪৫ মাইল, ভাড়া ১৮৬ আনা। ষ্টেসন হইতে অৰ্দ্ধ মাইল ব্যবধানেই পীঠস্থান। ইহা পর্ব্বতময় বন্ধুর প্রদেশ, পর্ব্বতের একটী টিলার উপরে মন্দির অবস্থিত, উপরে উঠিবার জন্য সোপানাবলী আছে। মন্দিরটী প্রাচীন বলিয়াই অনেকে বিশ্বাস করেন। চতুর্দ্দিকে প্রাচীর, সম্মুখে সিংহদ্বার, তদুপরি নহবতখানা; এখন এখানে কোন বাদ্যাদি হয় না, সময়ে সময়ে যাত্রিগণ বসিয়া থাকে। কালীবাড়ীর চতুর্দ্দিক বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষরাজিতে সমাচ্ছন্ন থাকায় দূর হইতে মন্দিরের চূড়া মাত্র দৃষ্ট হয়। স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনোহর। মন্দিরটী মঠাকৃতি, পিছনের প্রাচীর পর্ব্বত গাত্র সংলগ্ন; মন্দিরাভ্যন্তরে প্রাচীরগাত্রে কালিকাদেবীর মূর্ত্তি সর্ব্বদা সিন্দূরমণ্ডিত থাকায় স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় না। মোহন্ত ব্রহ্মচারী প্রধান পাণ্ডা ও দেবীর সেবক; পূজা করার জন্য পৃথক্ ব্রাহ্মণ আছে। এখানে দীপান্বিতার সময় বহু যাত্রী হয়। বাজার ভিন্ন থাকার অন্য স্থান নাই। নলহাটীর নিকটবর্ত্তী অরণ্যে প্রাচীন মন্দির ও প্রাসাদাদির অনেক ধ্বংসাবশেষ ইতস্ততঃ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ যে এখানে পুরাকালে নল রাজার রাজধানী ছিল। স্থানটী অতি প্রাচীন বটে।

বিভাসকে কপালিনী।

"কপালিনী ভীমরূপা বামগুল্‌ফং বিভাসকে।
ভৈরবশ্চ মহাদেবঃ সর্ব্বানন্দঃ শুভপ্রদঃ।"

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত তমলুকের প্রান্তভাগে বিভাসক নামে একটী স্থান আছে। সতীদেবীর প্রাণশূন্য দেহ স্কন্ধে করিয়া মহাদেব যখন ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন শ্রীবিষ্ণুর চক্রপরিক্ষত সতী দেবীর বাম গুল্‌ফ এখানে পতিত হইয়াছিল বলিয়া আদর্শ সতী কপালিনী নামে এখানে বিরাজিতা। ভগবান্ ভোলানাথ জগতে সতীপ্রেমের আদর্শ শিক্ষা দিবার মানসেই, ত্রৈলোক্য কল্যাণজনক সর্ব্বানন্দ ভৈরব নাম গ্রহণে মহামায়ার পার্শ্বে অবস্থিত আছেন। এস্থানে ভীমরূপা কপালিনী দেবীর দর্শন লালসায় ভক্ত সাধু যাত্রিগণ পর্ব্বাদি উপলক্ষে সমবেত হন। নিকটস্থ গ্রামবাসিগণ শনি-মঙ্গলবারে মায়ের পূজা দিয়া থাকে। দর্শনাকাঙ্ক্ষিগণ কলিকাতা হইতে সি, এম, এন কোম্পানীর ষ্টিমারে তমলুক পর্য্যন্ত যাইতে পারেন; কিম্বা বেঙ্গল নাগপুর রেলে কোলাঘাট পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে ষ্টিমারে যাইতে পারেন। কোলাঘাটের ভাড়া ।৵৫ আনা; তমলুকের ষ্টিমার ভাড়া ৮৵০ আনা মাত্র।

উৎকলে বিমলাদেবী।

"উৎকলে নাভিদেশস্তু বিরজা ক্ষেত্রমুচ্যতে।
বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ॥"

উৎকল বা উড়িষ্যা প্রদেশে জগন্নাথ সর্ব্বপ্রধান তীর্থ। নারদপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পুরুষোত্তমপুরাণ ও কপিল-সংহিতা প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র-গ্রন্থে, জগন্নাথদেব ও তৎক্ষেত্র-মাহাত্ম্যের সবিস্তার বর্ণনা আছে। কি উচ্চ, কি নীচ, ভারতবাসী হিন্দু মাত্রেরই ইহা অতি আদরের পুণ্যস্থান। এখানে ছোট-বড় বিচার নাই, রাজা-প্রজা জ্ঞান নাই, জাতিবর্ণ ভেদ নাই; ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল সকলেই সমান! এই পুণ্যক্ষেত্রে জাতিনির্ব্বিশেষে সকলে একত্রে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করে; কোন হিংসাদ্বেষ নাই; এখানেই স্বর্গদ্বার, এখানেই বৈকুণ্ঠ; ভক্তিমুক্তিদাতা স্বয়ং ভগবান্ দারুব্রহ্মরূপে সতত বিরাজমান। এমন শান্ত ও বিশ্বজনীন প্রেমের চরম উৎকর্ষ হিন্দুস্থানে আর দ্বিতীয় নাই। রাজাধিরাজ হইতে জীর্ণকন্থামাত্রসম্বল সামান্য ভিক্ষুও এখানে হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া সাম্যভাব ধারণ করে। ইহা নির্ব্বাণ-মুক্তির স্থান। শত সহস্র লোক কত কষ্ট ভোগ করিয়া মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের দর্শন লালসায়, অনবরত আগমন করিতেছে। পূর্ব্বে জগন্নাথ দর্শন বড়ই কষ্টকর ছিল—সমুদ্র পথে প্রবল বাত্যায় জাহাজ ডুবিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে; খালের পথে ৩।৪ দিন উপবাস থাকিয়া কতই না কষ্ট ভোগ করিয়াছে; শুষ্ক পথে পনর দিবস পর্য্যন্ত অনবরত হাঁটিয়া দস্যু-তস্করের নিকট কত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে। এখন বি, এন, আর রেলে দ্বাদশ ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতা হইতে পুরী যাওয়া যায়! ধন্য ইংরেজ! তোমার অর্থ ও বুদ্ধিকে শত ধন্যবাদ। হাবড়া হইতে পুরী যাইবার কয়েকটী ট্রেণই আছে, তন্মধ্যে মান্দ্রাজ মেইলে

জগন্নাথের মন্দির

সময়ের লাঘব হয়, কিন্তু ভাড়া অধিক, ৪/৬ পাই স্থলে ৪৶৬ আনা দিতে হয়; আবার তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর সংখ্যা বড়ই কম। ১৩১৮ সনে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষে আমরা ছয় টাকা মূল্যে ইণ্টার ক্লাসের টিকেট ক্রয় করিয়া হাবড়া হইতে রাত্রি ৮২ ঘণ্টার সময় রওয়ানা হই, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই খুর্‌দা ষ্টেসনে পুরীগামী কয়েকখান গাড়ী কাটিয়া মেইল ট্রেণ মান্দ্রাজের দিকে চলিয়া গেল। কিছুকাল পরে পুরীগামী লোকেল ট্রেণ আমাদিগের কয়েকখানা গাড়ীসহ রওয়ানা হইল। আমরা প্রাতে ৮ ঘণ্টার সময় পুরী ষ্টেসনে নামিয়া আট আনায় ঘোড়ার গাড়ী করিয়া পুরীর মন্দিরের সন্নিকটে একজন পাণ্ডার বাটীতে অশ্রয় লইলাম।

বাসাতে জিনিষাদি রক্ষা করিয়া পাণ্ডার পরিচিত একজন লোকসহ স্নানার্থে স্বর্গদ্বার মহোদধি তীরে গমন করিলাম। ইহা প্রধান মন্দির হইতে নৈঋ্ঁত কোণে প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যবধান। বঙ্গ উপসাগরের নীল বাঁরিরাশি দূরে এক থানা কাল মেঘের ন্যায় যেন আকাশ সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। নিকটে সৈকত ভূমে উচ্চ তরঙ্গগুলি একটীর পর একটী আহত হইতেছে; বিক্ষোভিত তরঙ্গমালা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া নীলের উপর শ্বেতাভ বিস্তার করিতেছে; একটী তরঙ্গ সরিয়া না যাইতে, অপর একটী আসিয়া পড়িতেছে। অনবরত তরঙ্গগুলি বেলা-ভূমিতে প্রতিহত হইয়া বড়ই সুন্দর দৃশ্য দেখাইতে লাগিল। আমি ইতিপূর্ব্বে সমুদ্র দর্শন করি নাই; উপরে অনন্ত নীলাকাশ, সম্মুখে, পার্শ্বে যতদূর দৃষ্টি চলে তত দূরই নীল সমুদ্র বারি! আহা কি সুন্দর! মনোহর! আমরা অনেকক্ষণ সমুদ্রে দাঁড়াইয়া স্নান করিলাম। তরঙ্গের পর তরঙ্গগুলি কখনও আমাদের গাত্রে আহত হইতেছে, কখনও বা মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। আঘাতের সময় তরঙ্গবেগে তটের দিকে চলিয়া যাইতেছি, পরক্ষণেই স্রোতবেগে নিম্নে সরিয়া আসিতেছি। সমুদ্রস্নান বড়ই আমোদপ্রদ এবং উপকারী। লবণসংযুক্ত সমুদ্রবারি

পাঁচড়ার অমোঘ ঔষধ। কলিকাতার একজন বাবু এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া আমাদের বাসায়ই ছিলেন; ৩।৪ দিন সমুদ্রস্নানের পরই তাঁহার রোগ আরোগ্য হইয়াছিল।

আমরা স্নানান্তে মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শনে গেলাম। জগন্নাথদেবের বাটী সুরক্ষিত প্রকাণ্ড দুর্গ বিশেষ! চতুর্দ্দিকে মুগ্‌ণী পাথরের গাথুনিযুক্ত ১৬ হাত উচ্চ মেঘ নামক প্রাচীর! ইহা রাজা পুরুষোত্তম দেব বিনির্ম্মিত, অতি প্রাচীন! একটী পর্ব্বত শৃঙ্গ কিম্বা স্তুপোপরি অবস্থিত। চারিদিকে চারিটী প্রকাণ্ড দ্বার। পূর্ব্বদ্বারকে সিংহদ্বার কহে, দুই পার্শ্বে দুইটী সিংহ মূর্ত্তি, এই দরজা কাল কষ্টিক প্রস্তরের নানাবিধ কারু-কার্য্যখচিত, শাল কাঠের অতি পুরু কপাট; সিংহদ্বারের সম্মুখে ২৮ হাত উচ্চ কৃষ্ণপ্রস্তরের অতি মসৃণ অরুণ স্তম্ভ। উত্তরের দ্বারকে হস্তীদ্বার কহে, দ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটী প্রস্তরের হস্তী। পশ্চিমের দ্বারকে খাঞ্জাদ্বার কহে। দক্ষিণের দ্বারকে অশ্বদ্বার কহে, এখানে দুইটী অশ্বমূর্ত্তি আছে। দ্বারগুলি সর্ব্বদাই প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত। মন্দিরটী দৈর্ঘ্যে ৪৪২ হাত, প্রস্থে ৪২৬ হাত, চারিদিকের দ্বার দিয়াই ভিতরে প্রবেশ করা যায়, কিন্তু ক্রমেই সোপানাবলী দ্বারায় উপরে উঠিতে হয়। পূর্ব্ব দ্বারের সম্মুখ প্রাঙ্গণে মিষ্ট মহাপ্রসাদের দোকান সমূহ; উত্তর দ্বারে প্রবেশ করিলেই আনন্দ বাজার, এখানে মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয়; দক্ষিণ দ্বারে প্রবেশ করিলে ভোগশালা, ভাণ্ডার ঘর, গোশালা, জলের কূপ ও কর্ম্মচারিগণের বাসের বহুতর ঘর; পশ্চিম দ্বারে প্রবেশ করিলেই প্রাঙ্গণে বহুতর দেবমন্দির দৃষ্ট হয়। প্রথম প্রাচীর পার হইলে, ভিতরে আর একটী প্রাচীর ও তৎসংলগ্ন বহুতর ঘর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর কয়েক সিঁড়ি উপরে উঠিলে প্রাঙ্গণ মধ্যবর্ত্তী শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মহামন্দির। এই মন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণ দিক বন্ধ; পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে উপরে উঠিবার জন্য সোপানা-বলী রহিয়াছে। পশ্চিম দিকে জগন্নাথ দেবের মূল মন্দির, তৎসংলগ্ন

মোহন মন্দির, তাহার পর নাট মন্দির, এবং নাটমন্দিরের সংলগ্ন ভোগ রাখার স্থান। নাটমন্দির ও ভোগমন্দির নানাবিধ দেব দেবীর মূর্ত্তি-খচিত অশেষ শিল্পনৈপুণ্যবিশিষ্ট। ইহার ছাদ পিরামিড আকারে। মহারাজ চোরগঙ্গ কর্ত্তৃক মূল মন্দিরের যে চূড়া নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা ১৯২ ফিট উচ্চ, বহু সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও সিংহাদি নানাবিধ জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত। চূড়ার উপরে নিশান প্রোথিত। মোহন মন্দির হইতে মূল মন্দির ৩।৪ ফুট নিম্ন। একটী মাত্র দ্বার, সূর্য্যের আলো প্রবেশ করিতে পারে না, দিবা রাত্রি সুগন্ধি প্রদীপ জ্বলিয়া থাকে। মন্দির মধ্যে ৪ ফিট উচ্চ ও ১৬ ফিট দীর্ঘ প্রস্তর নির্ম্মিত রত্ন-বেদী। বেদীর উপরে দারুব্রহ্ম-মূর্ত্তি শ্রীশ্রীজগন্নাথ (শ্রীকৃষ্ণ), দক্ষিণে বলরাম, মধ্যে সুভদ্রা বা লক্ষ্মীদেবী, দণ্ডায়মান অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। বাম দিকে সুদর্শনের চক্রমূর্ত্তি। বেদীর নিম্নে স্বর্ণনির্ম্মিত লক্ষ্মীমূর্ত্তি, রূপার বিশ্বধাত্রীমূর্ত্তি, পিতলের মাধবমূর্ত্তি আছে। রত্নবেদীর মধ্যে লক্ষ শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে এমত পাণ্ডাজি বলিলেন। এই বেদীর মাহাত্ম্যই সমধিক। এখানে সতী দেবীর নাভি পতিত হইয়াছিল ; দেবীর নাম বিমলা। মধ্য-আঙ্গিনায় পৃথক্ মন্দিরে সংস্থিত ; ভৈরব স্বয়ং শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব। দিবসে দেবদর্শন সুবিধাজনক নহে, রাত্রে ভোগের পর শৃঙ্গার বেশ দর্শনে মহানন্দ জন্মে, তৎকালে বহু যাত্রীসমাগম হয়, একদল দর্শন করিয়া বাহির হইলেই অন্য দল যাইবার নিয়ম ; সুতরাং দর্শন জন্য ব্যস্ত না হইয়া নাট মন্দিরে অপেক্ষা করিয়া সুবিধা মতে দর্শন, নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করা কর্ত্তব্য। আমরা দর্শনান্তে প্রসাদ ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করিলাম।

পরদিন স্বর্গদ্বারে স্নান করিয়া পার্ব্বণশ্রাদ্ধাদি সম্পাদনে মহামন্দিরে আসিয়া পুনরায় দেবদর্শন করিলাম। মহামন্দিরের তিন দিকেই বহুতর দেবমন্দির আছে, যথা—১। শ্রীকাশী বিশ্বনাথ ২। শ্রীরামচন্দ্র

৩। বদরীনারায়ণ ৪। শ্রীরাধাকৃষ্ণ ৫। বটকৃষ্ণ ৬। মঙ্গলাদেবী ৭। মার্কণ্ডেয়েশ্বর ৮। বটেশ্বরলিঙ্গ ৯। ইন্দ্রাণী ১০। সূর্য্যমূর্ত্তি ১১। ক্ষেত্রপাল তৎপশ্চাতে রাজা প্রতাপরুদ্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মুক্তিমণ্ডপ। এখানে ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ হয়। ১২। নরসিংহমূর্ত্তি ১৩। গণেশ ১৪। রোহিণীকুণ্ড ও ভূষণ্ডীকাকের মূর্ত্তি ১৫। বিমলাদেবী মূর্ত্তি ইঁহাই মহাপীঠ ১৬। ভাণ্ডগণেশ ১৭। গোপীনাথমূর্ত্তি ১৮। মাখনচোরার মূর্ত্তি ১৯। সরস্বতীদেবী মূর্ত্তি ২০। নীলমাধব বিগ্রহমূর্ত্তি ২১। লক্ষ্মীর মন্দির ২২। সর্ব্বমঙ্গলা কালীমূর্ত্তি ২৩। রাধামন্দির ২৪। সূর্য্যনারায়ণ ২৫। কৃষ্ণমূর্ত্তি ২৬। রাধাশ্যাম ২৭। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মূর্ত্তি; এই সমস্ত মন্দির মধ্যে বিমলাদেবীর মন্দির অতি প্রাচীন। ইনিই আদ্যাশক্তি বিরজাক্ষেত্রের মুখ্য অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আশ্বিনমাসের মহাষ্টমী নিশীথে জগন্নাথ দেবের শয়নের পর ছাগবলি দ্বারায় ইঁহার পূজা হইয়া থাকে। এতৎ ভিন্ন বিরজাক্ষেত্রে কোথাও জীবহিংসা হইতে পারে না। বলরামদেবের ভোগই এখানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তদ্দ্বারায় বিমলাদেবীর ভোগ প্রদত্ত হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের ভোগের অন্ত নাই, বালভোগ, খিচরান্ন, পিষ্টক ভোগ, অন্নব্যঞ্জন ভোগ, জিলাপী ভোগ, মিষ্টান্ন ভোগ, গোপালবল্লভ ভোগ, ইত্যাদি অনেকবার নানাবিধ উপচারে ভোগ দেওয়া হয়। ভোগ শেষ হইলে প্রসাদ বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। চারি পয়সা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত একজনের আহার্য্য পরিমাণ ভোগ প্রসাদের মূল্য হয়।

উপরোক্ত দেবতা ভিন্ন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিগ্রহাদি নানা স্থানে স্থাপিত আছে, তাহাদের প্রত্যেকের বিবরণ লিখিত হইলে এক বৃহৎ গ্রন্থ হয়। পাঠকগণের অবগতির জন্য প্রধান প্রধান আরো কয়েকটী দেবালয় ও তীর্থস্থানের নামোল্লেখ করা হইল। নরেন্দ্র সরোবর, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, গুণ্ডিচাবাড়ী, মার্কণ্ডেয় সরোবর, শ্বেতগঙ্গা, অলাবুকেশ্বর, যমেশ্বর, কপালমোচন, চক্রতীর্থ, স্বর্ণদ্বার, সিদ্ধবকুল, নিমাই

চৈতন্যমঠ, বিদুরাশ্রম, মুলুকদাস বাবাজীর মঠ, কাণপাতা হনুমান, সুদামাপুরী, নানকপন্থীমঠ, কবীরপন্থীমঠ, শঙ্করাচার্য্যমঠ, লোকনাথ, আঠারনালা প্রভৃতি বহুতর তীর্থ, দেবমূর্ত্তি, মহাত্মাগণের আশ্রম, সরোবর, কুণ্ড ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান আছে এবং প্রত্যেকের সহিত পৌরাণিক এক একটী ইতিহাস সংযোজিত রহিয়াছে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রম ও সমাধিমন্দির দেখিলাম। গুণ্ডিচাবাড়ী এক প্রকাণ্ড বাজবাড়ীর ন্যায়, ইহার আকার ও নির্ম্মাণকৌশল শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের অনুরূপ। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার পাটরাণীর নাম ছিল গুণ্ডিচা। রাজার এক কন্যার শ্রীজগন্নাথ দেবের সহিত বিবাহ দেওয়া হয় সুতরাং রাজা শ্বশুর হইয়াছিলেন। রাণী জগন্নাথ দেবের নিমিত্ত এই বাড়ী প্রস্তুত করেন। রথের সময় পনর দিন জগন্নাথ দেব এখানে আসিয়া বাস করেন। শ্রীজগন্নাথ দেবের কতকগুলি যাত্রা উৎসব আছে, তন্মধ্যে রথযাত্রাই প্রধান। তৎকালে লক্ষলোকের সমাগম হয়। মহামন্দির হইতে গুণ্ডিচাবাড়ীতে রথারূঢ় জগন্নাথ দেবের যাত্রা হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রতিমাসে যাত্রা বা উৎসব হইয়া থাকে; প্রধান প্রধান কয়েকটী উল্লেখ করা গেল। ১। বৈশাখমাসে অক্ষয় তৃতীয়া হইতে ২২ দিন পর্য্যন্ত চন্দনযাত্রা। ২। জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্ল একাদশীতে রুক্মিণীহরণ ও পূর্ণিমা তিথিতে স্নানযাত্রা। ৩। আষাঢ়ের শুক্ল দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা। ৪। শ্রাবণ মাসে একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ঝুলনযাত্রা। ৫। ভাদ্র মাসে অষ্টমী যাত্রা, কালীয়দমন ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন। ৬। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় সুদর্শন উৎসব। ৭। কার্ত্তিক মাসে পূর্ণিমাতে রাস যাত্রা, এই সময় অতি সমারোহ হইয়া থাকে। ৮। অগ্রহায়ণ মাসে প্রাবরোৎসব বা শীতবস্ত্র দান। ৯। পৌষ মাসে অভিষেক উৎসব ও মকরোৎসব। ১০। মাঘ মাসে গুণ্ডিচা উৎসব ও সমুদ্রস্নানযাত্রা। ১১। ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা। ১২। চৈত্র মাসে রামলীলা ও জগন্নাথবল্লভ নামক বাগানে

মদন উৎসব ও পূজা হইয়া থাকে। এতৎ ভিন্ন নবকলেবরধারণ নামক একটী মহা উৎসব বহুবৎসর অন্তে হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে বৎসর আষাঢ় মাস মলমাস হয় এবং সেই মলমাসে দুইটী পূর্ণিমা তিথি থাকে তখন নবকলেবরধারণ করিয়া থাকেন। নিমকাষ্ঠের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। শ্রীজগন্নাথদেবের দৈনিক পূজাদিও উৎসবময়। এখানে সর্ব্বদাই আনন্দ বিরাজমান।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ পুরাণে বহু বিস্তৃত আখ্যান দৃষ্ট হয়, আমরা অতি সংক্ষেপে তাহার সার বিবরণ কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিয়া এই আখ্যায়িকা সমাপন করিব। উৎকল প্রদেশে মহানদীর দক্ষিণ নীলাচল মধ্যে পুরুষোত্তম নামক এক মহাতীর্থ অতি প্রাচীন কাল হইতে সংস্থিত ছিল। ঐ তীর্থের অশেষগুণ শ্রবণ করিয়া অবন্তীনগরের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তদ্দর্শন-লালসায় এখানে আসিয়া জানিতে পারিলেন, সমুদ্রের প্রলয় ঝড় ও বন্যায় বালিরাশি দ্বারায় নীলাচল পুরুষোত্তম তীর্থ লোপ পাইয়াছে, তাহার কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিষ্ণুভক্ত মহারাজ বহু কষ্টে এখানে আসিয়া প্রভু দর্শন করিতে না পারিয়া একেবারে ম্রিয়মাণ হইলেন। দিবারাত্রি আহার নিদ্রা পরিত্যাগে কেবল ভগবানের ধ্যান করিতে থাকিলে, স্বপ্নে ভগবান্ বিষ্ণু রাজাকে দর্শন দিয়া এই আদেশ করিলেন যে, সমুদ্রতীরবর্ত্তী জলস্থলে যে বৃহৎ বৃক্ষ দেখিতে পাইবে তদ্দ্বারা প্রতিমা নির্ম্মাণ করতঃ নীলাচলে স্থাপন করিলেই তোমার মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হইবে। দ্বাপরযুগের শেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জড়াব্যাধের শরাঘাতে দেহ পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার দেহাস্থি কোন মহাপুরুষ সংগ্রহ করিয়া রাখেন, সৌভাগ্যক্রমে তাহাই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার হস্তগত হইয়াছিল। তিনি সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটী বৃক্ষ স্বয়ং ছেদন করিয়া সূত্রধররূপী বিশ্বকর্ম্মা দ্বারায় দারুব্রহ্ম জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করেন। তাহার সহিত এরূপ চুক্তি ছিল যে, একুশ দিনের মধ্যে

মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে, ঐ কাল মধ্যে মন্দিরের দ্বার কেহ খুলিতে পারিবে না, যদি দ্বার খোলে তবে কার্য্য সমাপন হইবে না। তদনুসারে কয়েকদিন সূত্রধর কার্য্য করিলে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাণীর একান্ত আগ্রহে মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে দেখিলেন, দারুব্রহ্ম জগন্নাথ ও বলরাম এবং সুভদ্রা মূর্ত্তির কতক খোদা হইয়াছে মাত্র, হস্ত ও অঙ্গুলী ইত্যাদি কিছুই হয় নাই। সূত্রধরকেও দেখিতে পাইলেন না। রাজা মর্ম্মাহত হইয়া কুশশয্যায় শয়ন করিয়া হত্যা দিলেন, রজনীতে স্বপ্নাবেশে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার চিরারাধ্য সাধনার ধন শ্রীভগবান বিষ্ণু জগন্নাথরূপে আসিয়া বলিতেছেন, বৎস! তোমার দুঃখের কারণ নাই। আমি কলিযুগে হস্তপদ-বিহীন রূপেই দর্শন দিয়া জীব উদ্ধার করিব, তুমি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর। ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির মধ্যে রত্নবেদী নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ভগবানের শেষাস্থি স্থাপন করিয়া তদুপরি দারুব্রহ্ম ও জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি স্থাপন করেন। এখানে সতীদেবীরও অস্থি পতিত হইয়াছিল, বেদীমধ্যে সেই মহামূল্য ধন নিহিত আছে বলিয়াই নবকলেবর-সময় বিগ্রহমূর্ত্তি স্থানান্তরিত হইলেও রত্নবেদীরই অর্চ্চনা ও ভোগ ইত্যাদি হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহাস্থি বৃক্ষের মধ্যে কুলুপ করিয়া রাখা এবং এই সিদ্ধ বৃক্ষ দ্বারকানগরী হইতে জগন্নাথক্ষেত্রে সমুদ্র পথে আগমন করা ইত্যাদি বিবরণ পাঠকগণ প্রণিধান করিয়া দেখিবেন। পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাকে বুদ্ধাস্থি কিম্বা বুদ্ধের দন্ত বলিয়া যে ব্যাখ্যা করেন, তাহাও সঙ্গত হয় না; কেন না, বুদ্ধের দেহাস্থি যে যে স্থানে রক্ষা করা হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে। এস্থলে আর একটী ঐতিহাসিক বিবরণ পাঠকগণের অবগতির জন্য উল্লেখ করিলাম। কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক যে মন্দির ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে দ্বাদশ শতাব্দিতে উড়িষ্যার মহারাজা অনঙ্গভীমদেব চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাই বর্ত্তমান মন্দির। ইন্দ্রদ্যুম্ন

কর্ত্তৃক ভগবানের যে মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা পরম সুন্দর হস্তপদবিশিষ্ট মূর্ত্তিই ছিল। মহারাজ মুকুন্দদেবের রাজত্ব সময় মোসলমান সেনাপতি কালাপাহাড় বহু সৈন্য সহ জাজ্‌পুর আক্রমণ করিলে মহারাজ চিল্‌কা হ্রদ মধ্যে শ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহ লুকাইয়া রাখেন। কালাপাহাড় যুদ্ধ জয় করিয়া সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলেন এবং জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া চর দ্বারায় অনুসন্ধান পূর্ব্বক চিল্‌কা হ্রদ হইতে আনাইয়া সমুদ্রতীরে অগ্নিদ্বারায় দাহ করিয়া সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কোন মহাপুরুষ তাহা দেখিতে পাইয়া অতি সংগোপনে দগ্ধমূর্ত্তি উৎকলের কুজঙ্গদুর্গাধিপতি খণ্ডাইত গৃহে রাখিয়াছিলেন। রামচন্দ্রদেব রাজা হইয়া সেই দগ্ধমূর্ত্তি আনিয়াছিলেন। আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে রাজা রামচন্দ্র সেই মূর্ত্তিই শাস্ত্রমতে নিম্বকাষ্ঠ দ্বারায় নবকলেবর করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহারাজ মানসিংহও পুরুষোত্তমে সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। রামচন্দ্রদেব যখন নবকলেবর করেন তখন দগ্ধমূর্ত্তির হস্ত, অঙ্গুলী ইত্যাদি না থাকায় তিনি সন্দিহান্ হইয়া দগ্ধমূর্ত্তির অনুরূপই নবকলেবর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন গ্রন্থ কপিল-সংহিতায় শ্রীজগন্নাথদেবের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মূর্ত্তির বিষয় উল্লেখ আছে; সুতরাং আধুনিক কালের গ্রন্থাদির লিখিত বিবরণের সত্যতা পাঠকগণই নির্দ্ধারণ করিবেন।

কিরীটে কিরীটেশ্বরী

ও

মুর্শিদাবাদ।

"ভুবনেশী সিদ্ধরূপা কিরীটস্থা কিরীটতঃ।
দেবতা বিমলা নাম্নী সম্বর্ত্তো ভৈরবস্তথা॥"

মুর্শিদাবাদ সহরের তিন ক্রোশ উত্তরে ভাগীরথীর অপর পারে কিরীট-কণা নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ভগবতী সতী দেবীর শিরোভূষণ কিরীট পতিত হইয়াছিল, তদনুসারে গ্রামের নাম কিরীটকণা হইয়াছে। দেবীর নাম বিমলা, সম্বর্ত্ত নামে ভৈরব শিবলিঙ্গ। মন্দির মধ্যে একটী রৌপ্যময় কিরীট যন্ত্রের সহিত রক্ষিত আছে। মন্দির মধ্যে দেবীর কোন মূর্ত্তি নাই, কেবল কিরীটধারিণী দেবীর মুখের অংশ একটী উচ্চ বেদীতে সংস্থিত আছে। মন্দিরটী আধুনিক বলিয়া বোধ হইল, মন্দিরের চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত বারান্দা, ইহাই যাত্রীগণের বসিবার স্থান। মধ্যে একটী প্রাঙ্গণ, প্রবেশদ্বারের পার্শ্বেই ভৈরব সম্বর্ত্ত দেবের মন্দির। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পুরাতন সমৃদ্ধির বিষয় স্মৃতিপথে আনয়ন করে। পশ্চিম দিকে নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক খনিত এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা নানাবিধ বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। জানা যায় অষ্টা-দশ শতাব্দিতে মহারাজা রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কালী বাড়ীর মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল, মহারাজ সময়ে সময়ে এই স্থানে আগমন করিতেন। কিরীট-কণা গ্রামটী জঙ্গলাবৃত, কয়েক ঘর পূজারী ব্রাহ্মণ পাণ্ডার বাস, নিকটে কোন লোকালয় নাই; কালীবাড়ীতেও কোন লোকজন বাস করে না। দ্বিপ্রহরে পূজার কালে পূজারী পাণ্ডাগণ আসিয়া থাকেন। পাণ্ডার বিশেষ প্রাদুর্ভাব। কথিত আছে, মোগল রাজত্ব সময়ে ডাহাপাড়া নিবাসী কাননগুই হরি নারায়ণ কর্ত্তৃক আদিমূর্ত্তি স্থাপিত ও সেবার জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

অৰ্দ্ধোদয় যোগে মুর্শিদাবাদ।

"অমার্কপাত শ্রবণৈর্যুক্তা চেৎ পৌষমাঘয়োঃ।
অর্দ্ধোদয় সবিজ্ঞেয়ঃ কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমঃ॥"

সন ১৩১৪ মাঘ মাসে অর্দ্ধোদয় যোগে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য আমরা কুমিল্লা হইতে ৪।৶০ আনা ভাড়ায় ষ্টিমার ও রেলযোগে মুর্শিদাবাদ গিয়াছিলাম। প্রায় ৭।৮ মাইল দীর্ঘ স্থান ব্যাপিয়া পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ সহর ছিল। ইহা বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার শেষ রাজধানী। যে স্থানে এক দিন বঙ্গবাসীর ভাগ্যলিপি অঙ্কিত হইত, যে মানব-বিধাতার মুখের একটী মাত্র কথায় কত রাজা মহারাজা মুহূর্ত্ত মধ্যে ধন, প্রাণ, সম্মান হইতে চ্যুত হইতেন এবং যাহার অনুগ্রহে সামান্য দরিদ্রতনয়ও রাতারাতি জমিদার ও মহা সম্ভ্রান্তরূপে পরিগণিত হইতেন, দুই শত বৎসর গত হইতে না হইতেই সেই নগরীর অধিকাংশ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে! হায়! কালের কি দুর্নিবার গতি! নগরাধিষ্ঠাত্রী দেবী যেন মনোদুঃখে চিরকালের জন্য ভাগীরথীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছেন এবং তৎশোকে নির্ম্মলসলিলা পুণ্যতোয়া ভাগীরথা দেবী দিন দিন ক্ষীণ-কলেবরা হইয়া অন্তর্ধান হইবার জন্য বালি রাশির সুবিশাল চর বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। বহু লোকের সমাগমেও এরূপ সুবিস্তীর্ণ চরভূমে গঙ্গাস্নানে লোকের ভিড় হইবে না মনে করিয়া কতিপয় যাত্রীসহ আমরা এখানে আসিয়াছিলাম। কিন্তু কপালে দুঃখ থাকিলে খণ্ডন হয় না। রেল কোম্পানীর বণিকবৃত্তিতে গোয়ালন্দ হইতে রাণাঘাট পর্য্যন্ত আমাদিগকে মাল গাড়ীতে বোঝাই হইয়া আসিতে হইয়াছিল। আমরা সাহানগর নামক স্থানে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিয়াছিলাম। মুর্শিদাবাদ অতিশয় ম্যালেরিয়া পূর্ণ স্থান, জিলা বহরমপুরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা সবডিভিসন মাত্র। নবাব বাড়ী থাকায় ইহা

সহরের ন্যায়ই জাঁকাল বটে, খাদ্য দ্রব্যাদি অতি সুলভ। ছানা, সন্দেশ, ঘৃত এরূপ সুলভ মূল্যে কুত্রাপি পাওয়া যায় না। এখানে আম্রের চাষ বিস্তর।

আমরা সুবিধামতে যোগের স্নান করিয়া কয়েক দিন বাস করিয়াছিলাম। এখানে দর্শনীয় মধ্যে নবাবের ইমাম বাড়ী, হাজারদ্বারী কুঠী, চক্‌বাজার ও সমাধি মন্দির সকল। রেশমের জন্য এই স্থান অতি বিখ্যাত, বালুচরে ইহার সমধিক কারবার। খাগড়া নামক স্থান কাঁস পিত্তলের জিনিসের জন্য বঙ্গে প্রসিদ্ধ। পাঠকগণের অবগতির জন্য বঙ্গের শেষ রাজধানী ও রাজ বংশের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিলাম।

মোগল রাজত্ব সময়ে যখন বাঙ্গালার পূর্ব্বরাজধানী জাহাঙ্গীরনগরে আজীম ওসমান সাহ সিংহাসনারূঢ় ছিলেন, তখন জনৈক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী সামান্য ব্রাহ্মণ দিল্লীর বাদসাহকে কোন কার্য্যে সন্তুষ্ট করিয়া অতীব প্রিয়পাত্র হন এবং মোসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মুর্শিদকুলী খাঁ নাম গ্রহণে বাঙ্গালার রাজস্ববিভাগের দেওয়ানী পদ প্রাপ্তে ঢাকাতে আগমন করেন। কিন্তু নবাবের সহিত ঐক্য না হওয়ায় দেওয়ানী সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্য ও কর্ম্মচারীসহ মুর্শিদাবাদ আসিয়া জঙ্গল কাটিয়া নগর নির্ম্মাণ করেন। ইহার পূর্ব্ব নাম মুমুক্ষবাদ ছিল ; তিনি তৎপরিবর্ত্তনে আপন নামানুসারে মুর্শিদাবাদ নামানুকরণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার রাজধানী করিবার অভিলাষে, দুর্গ, দরবারগৃহ, সুরম্য উদ্যান, বৃহৎ মসজিদ্, সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম, হাট, বাজার, চত্বর ইত্যাদিতে নব নগরকে সুশোভিত করেন এবং অসামান্য বুদ্ধিবলে রাজস্বের উন্নতি করিয়া সম্রাট হইতে নবাব নাজীমের পদ প্রাপ্ত হন। কাট্‌রাতে তাঁহার নির্ম্মিত মক্কার অনুকরণে যে বৃহৎ ভগ্ন মসজিদ্ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহার সিঁড়ির নিম্নেই নবাবের কবর ভক্তির সহিত পুষ্পাদি দ্বারা পূজিত হইয়া থাকে। মসজিদের সন্নিকট উত্তুঙ্গ দুইটী মিনার অতীতের গৌরব গাইতেছে। মুর্শিদ

কুলী খাঁ ২১ বৎসর রাজত্ব করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলে ক্রমে সুজাউদ্দীন ও সরফরাজখাঁ নবাব হইয়াছিলেন। তৎপর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নবাব আলিবর্দ্দীখাঁ রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র জন্মে নাই কিন্তু রাজত্বের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভাগীরথীর পরপারে খোসবাগ নামক উদ্যান বাটিকায় তাঁহার সমাধি মন্দির যেন নীরবে অতীত কাহিনীর সাক্ষ্য দিতেছে। আলিবর্দ্দীখাঁর মৃত্যুর পর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা মাতামহের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই অপরিণামদর্শী উদ্ধত যুবক এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া কুচক্রী বিশ্বাসঘাতকদিগের মন্ত্রণায় ভারতসাম্রাজ্যের বিশাল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া, মিরমদনের আদেশে, আহাম্মদীবেগের তরবারী ঘাতে নৃসংশরূপে আহত ও খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া মাতামহের পার্শ্বেই সমাহিত হইয়াছেন। খোসবাগ ও জাফরাগঞ্জে বহুতর সমাধি মন্দির বিদ্যমান আছে। সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর পর সেনাপতি মিরজাফর নবাব হইয়াছিলেন, মিরজাফরের অধস্তন বংশধরগণই বর্ত্তমান নবাববংশও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী। জানা যায় পূর্ব্ব নবাবদিগের বাসভবনের কোন চিহ্নই নাই। বর্ত্তমান নবাববাড়ী মিরজাফর বংশীয় নবাবদিগের নির্ম্মিত। ইহা ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে প্রায় এক মাইল দীর্ঘ সুন্দর দৃশ্য বটে। নবাবের মিউজিয়মে পুরাতন নানাবিধ দ্রব্য সজ্জিত আছে, হাজারদ্বারী কুঠী ও ইমামবাড়ীর দৃশ্য বড়ই চমৎকার। ইমামবাড়ীর সম্মুখে জনার্দ্দন কর্ম্মকারের নির্ম্মিত দশ হাত লম্বা একটী কামান দেখিতে পাইলাম। ইহা হিন্দু শিল্পীর গৌরবপ্রকাশক। বর্ত্তমান নবাব বাহাদুর শিক্ষিত এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে নানাবিধ উপাধিভূষিত।

মুর্শিদাবাদের যে অংশ মহিমাপুর নামে খ্যাত, তাহাই এক সময় বঙ্গের ধনকুবের জগৎ শেঠদিগের আবাসভূমি ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইঁহাদের ধন গৌরব লুপ্ত হইয়াছে। নবাববাড়ী হইতে উত্তরে এক ক্রোশের ঊর্দ্ধে ভাগীরথী তীরে নসিপুরের রাজবাটী, অতি সুদৃশ্য বিলাতি

ফেসনের নানাবিধ হর্ম্ম্যরাজীতে পরিশোভিত। বর্ত্তমান মহারাজা অনারেবল শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর নানাবিধ বিদ্যায় শিক্ষিত ও বহু সদ্‌গুণে ভূষিত। মহারাজা বাহাদুর ইণ্ডিয়া কাউনসিলের একজন সুযোগ্য মেম্বর। মাহারাজা বাহাদুর ধর্ম্ম কর্ম্ম ও দানাদির জন্য বিখ্যাত বটেন। মহারাজের রাজধানীস্থ সুরম্য উদ্যানবাটিকা ও দেবালয় দৃষ্টে আমরা অতীব প্রীতি লাভ করিয়াছি।

এই জিলায় রেশমের বিস্তৃত কারবার আছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক প্রকার গুটী পোকা আছে, ভেরণ ও তুত গাছের পাতা খাইয়া ইহারা জীবন ধারণ করে। গুটী হইতেই রেশম প্রস্তুত হয়, গুটী মধ্যে পোকার ডিম্ব থাকে তাহা ফুটিয়া পোকা বাহির হইবার পূর্ব্বে গরম জলে সিদ্ধ করিয়া গুটী হইতে রেশম সূত্র বাহির করিতে হয়। এই রেশম দেশ বিদেশে রপ্তানি হয় এবং তদ্দ্বারায় নানাবিধ মূল্যবান শাড়ী ও চাদর ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

করতোয়াতটে অপর্ণা।

"করতোয়াতটে তল্পং বামে বামনো ভৈরবঃ।
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা॥"

করতোয়া নদীতটে দেবীর বাম তল্প, মতান্তরে সতী দেবীর বসন পতিত হইয়াছিল। ইহা ৫১ পীঠের অন্তর্গত মহাপীঠ। দেবীর নাম অপর্ণা, ভৈরবের নাম বামন। করতোয়া রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত। কলিকাতা হইতে দামুকদিয়া ঘাট রেল ভাড়া ১৷৵০ আনা এবং তথা হইতে সুলতানপুর নামক ষ্টেশনের ভাড়া ৸৵০ মোট ২।৵০ আনা রেল ভাড়া; সুলতানপুর হইতে বগুড়া সেরপুর এবং সেরপুর হইতে হাঁটিয়া যাইতে হয়, অর্থব্যয় করিলে পাল্কী ইত্যাদি যানও পাওয়া যায়। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম ভবানীপুর। নাটোর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ সাধকপ্রবর মহারাজা রামকৃষ্ণ এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যার পঞ্চমুণ্ডী আসন, যজ্ঞকুণ্ড অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বৈশাখ মাসের প্রতি শনি মঙ্গল বার, দীপান্বিতা ও রামনবমীর সময় মেলা হয়, দেবীর বাটীর মন্দিরাদি মহারাজ রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। করতোয়া নাম্নী নদী অতি পবিত্র। হরপার্ব্বতীর পরিণয়কালে দেবাদিদেব হরকরচ্যুত জল হইতে ইহার উৎপত্তি এমত পুরাণাদিতে উল্লেখ আছে। "করাভ্যাম্ চ্যুতম্ = হরকরাভ্যাং ক্ষরিতং তোয়ং জলং বিদ্যতে যত্র সা করতোয়া"। বর্ষা সমাগমে সকল নদীর জলই অপবিত্র হয় কিন্তু করতোয়া নদীর জল অশুচি হয় না। এই নদী তীর্থস্থলীর মধ্যে গণনীয়। এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া ত্রিরাত্রি উপবাস করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয়, এমত মহাভারত ও তন্ত্রাদিতে উক্ত আছে।

পূর্ব্বকালে এই নদী বঙ্গ ও কামরূপের সীমা নির্দ্দেশ করিত এবং রংপুর সহরের পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ছিল, কালের কঠোরাঘাতে নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জলপাইগুড়ী জেলার উত্তর পশ্চিমস্থ বৈকুণ্ঠপুর হইয়া বরাবর রঙ্গপুর ও বগুড়ার দক্ষিণে অন্য নদীতে মিলিত হইয়াছে। বর্ত্তমান করতোয়ার আকার নিতান্ত ক্ষুদ্র বটে কিন্তু এক সময়ে আসাম প্রদেশের ও বঙ্গের বহু গ্রাম, জনপদ ও বিস্তীর্ণ ভূভাগ এই নদীগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। পুরাকালে বঙ্গ উপসাগরের সীমা করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় নির্দ্দেশ হইত। করতোয়াতটে বহু বৎসর পর একটী যোগ মেলা হয় তাহাকে নারায়ণী যোগ কহে। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"চাপার্কমূলাসংযুক্তা সোমবারে যদি কুহু।
নারায়ণীতি বক্ষামি ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ॥"

ত্রিস্রোতা বা তিস্তা।

"ত্রিস্রোতায়াং বামপাদো ভ্রামরী ভৈরবেশ্বরঃ।"

জলপাইগুড়ী জিলার মধ্যে তিস্তা নামক নদী বর্ত্তমান আছে। সতী দেবীর বাম পদ এই নদীগর্ভে পতিত হইয়াছিল বলিয়া এই তিস্তা নদীর জল পবিত্র হইয়াছে। এই নদীতে স্নানোপলক্ষে মেলা হইয়া থাকে, তখন উত্তর বঙ্গের বহুলোকের সমাগম হয়। এই নদীতটে জলপাইগুড়ী জিলার বোদা এলাকায় শালবাড়ী গ্রামে পীঠস্থান। দেবীর নাম ভ্রামরী এবং ভৈরবের নাম ঈশ্বর। কলিকাতা হইতে দামুকদিয়া ঘাট রেল ভাড়া ১৷৴০ আনা এবং তথা হইতে জলপাইগুড়ী পর্য্যন্ত নর্দ্দার্ন বেঙ্গল রেলের ভাড়া ২৷৵৬ আনা, মোট ৩৸৶৬ আনা ভাড়া।

বৈদ্যনাথ ধাম।

"হৃদ্পীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ দেবতা জয়দুর্গাখ্যা।"

শারদীয় পূজার বন্ধে তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে আমরা নারায়ণগঞ্জ হইতে ৪৫৫ মাইল দূরবর্ত্তী বৈদ্যনাথ ধামের টিকেট ৫।৹ টাকা মূল্যে খরিদ করিয়া দ্বিপ্রহর দুই ঘটিকার সময় মেইল ষ্টিমারে উঠিয়া, রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় গোয়ালন্দ ই, বি, এস্ রেলে আরোহণ করতঃ পর দিন অতি প্রত্যূষে নৈহাটী নামক ষ্টেশনে অবতরণ করি। নৈহাটী ইষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট রেলের গঙ্গার পরবর্ত্তী একটী জংসন ষ্টেশন। অপর পারে হুগলী জিলা। এখানে ই, আই, রেল সঙ্গে উভয় লাইনের যোগ হইয়া একটী লাইট রেল যাত্রী লইয়া বেণ্ডল নামক ষ্টেশনে গমনাগমন করিয়া থাকে; ইহাতে পশ্চিম গমনকারী যাত্রীগণের বিশেষ সুবিধা ও ব্যয় সংক্ষেপ হইয়াছে, তাহাদিগকে কলিকাতা কিম্বা হাবড়া ষ্টেশনে যাইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না। কলিকাতা হইতে বৈদ্যনাথ জংসন ২০১ মাইল, ভাড়া ২।৴৯; তথা হইতে দেওঘর ৵০ আনা, মোট ভাড়া ২।৶৯।

নৈহাটী গঙ্গার তীরবর্ত্তী বিধায় পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের বহুতর লোক এখানে আসিয়া গঙ্গা স্নান ও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া থাকেন। তদুদ্দেশ্যে পুরোহিতগণের (পাণ্ডার) বাসস্থান আছে। যাত্রীরা তাহাদের বাসায় থাকিয়া দেশাপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন। এথাকার পুরোহিতগণের অনেকেই পূর্ব্ববঙ্গবাসী; যাহারা স্বল্প ব্যয়ে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিতে ইচ্ছুক তাহাদের পক্ষে এই স্থান বিশেষ সুবিধা-জনক। এখানে একটী বাজার আছে, সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলিকাতা হইতে ২৪ মাইল মাত্র ব্যবধান। স্থানীয় ও

পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের শিক্ষিত লোকেরা রেল যোগে বাটী হইতেই কলিকাতায় কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায়ই রেলের গমনাগমন হইয়া থাকে।

আমরা নৈহাটীতে গঙ্গাস্নান ও তীর্থপ্রাপ্তি মাত্র পার্ব্বণ শ্রাদ্ধাদি করিয়া আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় রেলে গঙ্গার লৌহ-সেতু পার হইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে বেণ্ডল নামক ষ্টেশনে নামিয়া ই, আই রেলের অপেক্ষা করিতেছি, ইত্যবসরে সুগভীর গর্জ্জনে চরাচর কম্পিত করিয়া বাষ্পীয় শকট সদর্পে নক্ষত্রবেগে আসিতে লাগিল। এখানে ৫ মিনিট মাত্র অপেক্ষা করে। গাড়ী প্লেটফরমে উপস্থিত হইবা মাত্র যাত্রিগণ হুড়া হুড়ি ডাকা ডাকি করিয়া যে গাড়ী সম্মুখে পাইল তাহার লোক সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি না করিয়াই চড়িয়া বসিল। আমিও সঙ্গীয় লোকসহ একটী কামরাতে কষ্টে স্যৃষ্টে উঠিয়া দেখিলাম, কয়েকটী কলিকাতার বাবু জাঁক জমক করিয়া দ্বিগুণ ত্রিগুণ স্থান লইয়া তাস খেলা জুড়িয়াছে। আমরা যাত্রী, বহু অনুনয় বিনয়েও তাহাদের দয়ার উদ্রেক করিতে না পারিয়া বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াই রহিলাম। তথায় কতক লোক নামিয়া পড়ায় সঙ্গীসহ একখানা বেঞ্চে বসিয়া হাঁপ ছাড়িলাম।

গাড়ী বর্দ্ধমান ছাড়িয়া আসেনসোল অভিমুখে যাত্রা করিল, এদিকে রজনী দেবী গাঢ় নীল বসন পরিধান করিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারাবৃত করিল। আমিও সারাদিনের পরিশ্রমে অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। গাড়ী মধুপুর, রাণীগঞ্জ ইত্যাদি ষ্টেশন হইয়া বৈদ্যনাথ ষ্টেশনে আমাদিগকে নামাইয়া দিল। তখনও অধিক রাত্রি রহিয়াছে, নিকট-বর্ত্তী ধর্ম্মশালায় অপেক্ষা করিবার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু বৈদ্যনাথ ধামের গাড়ী প্রস্তুত, যাত্রিগণ ত্বরায় আইস ইত্যাদি বচনচাতুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বৈদ্যনাথ-ধামের লাইট রেলে উঠিয়া লক্ষ আলোকে বৈদ্যনাথের শোভা যতদূর দেখিতে পাইলাম, তাহাতে বড়ই মনোরম বোধ হইল। চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র পাহাড়, মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত উপত্যকাভূমি, ঘনছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষাবলীতে সমাচ্ছন্ন, দুই একটী শ্বেত সৌধরাজি বিরাজিত, প্রাকারবেষ্টিত উপবন গৃহ ইত্যাদি এক অভিনব দৃশ্য নয়নপথে প্রতিফলিত হইল। যখন আমরা বৈদ্যনাথধাম ষ্টেশনে পহুঁছিলাম তখনও রাত্রি শেষ হয় নাই। রাত্রিতে ষ্টেশনের শোভা অতি মনোহর অতি গভীর ভাবব্যঞ্জক। ষ্টেশনটী পর্ব্বতমূলে স্থাপিত, সম্মুখে বিস্তীর্ণ ময়দান, এবং বহুতর অট্টালিকা শোভিত পৃথক পৃথক বাটীতে পরিপূর্ণ। গাড়ী হইতে নামিয়া আমরা পাণ্ডার বাটীতে আশ্রয় লইলাম।

বৈদ্যনাথে পাণ্ডার উপদ্রব সমধিক, ইঁহারা খাতার বোঝা লইয়া সকলেই প্রত্যেক যাত্রীকে বারম্বার টানাটানি করিয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত কোন পাণ্ডার খাতায় যাত্রীর কিম্বা তৎপূর্ব্বপুরুষের নাম ধামাদি বিশুদ্ধরূপে দর্শাইতে না পারেন ততক্ষণ কেহই যাত্রীকে ছাড়িতে চাহে না। আমরা রাত্রি ৪টা হইতে পরদিন ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত শতাধিক পাণ্ডার শ্রুতিমধুর বচনপরম্পরা শ্রবণে ও নানাপ্রকার প্রশ্নাদিতে কখন হৃষ্ট কখন বিরক্ত হইয়াছিলাম। কোন পাণ্ডার নাম নির্দ্দেশ করিলেও সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। আমার পাণ্ডা পূর্ব্বের ঠিক ছিল, তথাপি অনেকের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা করিতে হইয়াছিল ; কিন্তু একজন সহযাত্রীকে খাতাতে তাহার পূর্ব্বপুরুষের নাম দেখাইয়া অন্য পাণ্ডা লইয়া গেল। আমরা সকলেই একত্রে রহিলাম, ক্রিয়াদি পৃথকভাবে হইয়াছিল।

বৈদ্যনাথ দুমকা জিলার অন্তর্গত সাঁওতাল পরগণা মধ্যে, দেওঘর সবডিভিসনের অধীন। সবডিভিসন ও ধাম পরস্পর সংলগ্ন। বৈদ্যনাথ অতি সুদৃশ্য ও স্বাস্থ্যকর স্থান, ইহা পর্ব্বতময় প্রদেশ। ভারতের মেরুদণ্ডসম সুবিস্তীর্ণ বিন্ধ্যাচলের অংশ বিশেষ। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বৃক্ষসমন্বিত উন্নত ও অবনত পর্ব্বত শৃঙ্গ, কোথায়ও অটবীশূন্য প্রস্তরময় পর্ব্বতমালা উচ্চ গগনে প্রকৃতির সুষমা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

ভারতের দ্বাদশ শিবলিঙ্গ মধ্যে বৈদ্যনাথের শিবলিঙ্গই প্রধান মহালিঙ্গ। রাত্রিকালে দেবের আরতি ও পূজাদি দর্শনে ভক্তির সঞ্চার হয়। ইহা ৫১ পীঠের অন্যতর পীঠস্থান। তন্ত্রে লিখিত আছে—"হৃদ্যপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ দেবতা জয় দুর্গাখ্যা"। দেবীর নাম জয়দুর্গা ভৈরব বৈদ্যনাথ। মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তরদিকে শিবগঙ্গা নামক এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা পদ্মাদি নানাবিধ জলজ পুষ্প ও হংস করণ্ডক প্রভৃতি পক্ষীদ্বারা পরিশোভিত, চতুর্দ্দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানাবলি। পূজার পূর্ব্বে ইহাতে স্নান ও সংকল্পাদি করিতে হয়। ইহাঁকে কীর্ত্তিনাশা রাবণের প্রস্রাবও বলিয়া থাকে। ইহার জলদ্বারা দেবের পূজাদি কার্য্য হয় না। আঙ্গিনার মধ্যে একটী ভাল কূপ আছে, তাহার জলই পূজাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। একটী পয়সা দিয়া জল লইতে হয়। পূজার দ্রব্যাদি আতপ তণ্ডুল, বিল্বপত্র, দুগ্ধ, কলা, মিষ্টদ্রব্য, ধুস্তরফুল, গঙ্গাজল ইত্যাদি আঙ্গিনাতেই খরিদ করিতে পাওয়া যায়, এখানে পঞ্চ গঙ্গার জল বলিয়া পাণ্ডারা কিছু দক্ষিণা আদায় করেন। শিবগঙ্গায় স্নান তর্পণের পর আঙ্গিনাতে যাইয়া দেব দর্শন করিতে হয়। এখানে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধাদি করাইয়া থাকে, তদনন্তর কেহ পঞ্চ উপচারে, কেহ ষোড়শোপচারে যাঁহার যেরূপ সাধ্য তদনুসারে মহাদেবের পূজা করিতে হয় এবং লিঙ্গোপরি গঙ্গাজল, পুষ্প, বিল্বপত্র, দুগ্ধ, ঘৃতাদি প্রদান করিয়া মণ্ডপ প্রদক্ষিণানন্তর দান দক্ষিণা করিতে হয়।

শিবগঙ্গা নামক দীর্ঘিকার এক পুরাতন ইতিহাস আছে। পাঠকের অবগতির জন্য এখানে উল্লেখ করা গেল। কিম্বদন্তী, রাজা দশানন ব্রহ্মার বলে বলীয়ান হইয়া সমুদয় পৃথিবী জয় করত কৈলাস পর্ব্বতে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং সহস্র বিল্বপত্র প্রদানে আশুতোষকে পরিতোষ করিয়া নিজ পুরী রক্ষার্থ লঙ্কাদ্বীপে নিজ স্কন্ধোপরি বহন করিয়া নিবার বর প্রার্থনা করিলে মহাদেব তুষ্ট হইয়া

এই বর দিয়া বলিলেন, স্কন্ধ হইতে নামাইলে পদমাত্রও অগ্রসর হইবেন না। রাবণ মহানন্দে মহাদেবকে স্কন্ধোপরি লইয়া চলিলে দেবগণ চিন্তিত হইয়া বরুণদেবের শরণাপন্ন হইলে তৎপ্রভাবে দশাননের অসহ্য প্রস্রাবের পীড়া হইল এবং দেবমায়ায় তথায় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইয়া তাহার স্কন্ধে মহাদেবকে রাখিয়া প্রস্রাব করার প্রার্থনা জানাইয়া সময়নিরূপণ করিয়া প্রস্রাব করিতে বসিলেন। এদিকে দেবচক্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, প্রস্রাবের নদী জন্মিল তবু প্রস্রাবের বিরাম নাই; বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বারম্বার রাবণকে সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার বিষয় অবগত করাইলেও রাবণ দেবমায়ায় মোহিত হইয়া কোন উত্তর না দেওয়ায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মহাদেবকে ভূমিতে রাখিয়া প্রস্থান করিলে পূর্ব্ব অঙ্গীকার মতে মহাদেব তথায়ই রহিয়া গেলেন। রাবণ শত সহস্র কাতরোক্তি অনুনয় স্তুতিবাদে মহাদেবকে প্রসন্ন করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে লিঙ্গোপরি মুষ্ঠাঘাত করিয়াছিলেন, পাণ্ডারা লিঙ্গোপরি একটী চিহ্ন দেখাইয়া উক্ত ইতিহাস বলিয়া থাকেন। এই শিবগঙ্গাকেই রাবণের প্রস্রাব বলিয়া থাকে। রাবণের নামানুসারে লিঙ্গের নাম রাবণেশ্বর মহাদেব হইয়াছে।

দেবাদিদেব শিবলিঙ্গ বহু শত বৎসর পর্য্যন্ত লুক্কায়িতভাবে ছিলেন। বৈদ্য গোয়ালা নামক এক নিরক্ষর সত্যবাদী পশুপালক জঙ্গলে পশু চরাইত। তাহার একটী দুগ্ধবতী গাভী প্রত্যহ একখণ্ড শিলার উপরে দুগ্ধ ক্ষরণ করিত। দুগ্ধের পরিমাণ হ্রাস হওয়াতে বৈদ্য গোয়ালা অনুসন্ধানে দেখিতে পায়, গাভী জঙ্গলে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রবেশ করে এবং দুগ্ধশূন্য অবস্থায় ফিরিয়া আইসে। একদিন সে গাভীর পশ্চাতে গমন করিয়া দেখিতে পায়, একখণ্ড শিলোপরি গাভী দুগ্ধধারা ঢালিয়া দিতেছে। তদ্দৃষ্টে সে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বাটী প্রত্যাগত হইলে, রজনীতে ভগবান প্রসন্ন হইয়া তাহাকে স্বপ্নে নিজ আগমন বার্ত্তা জানাইলে তদবধি মাহাত্ম্য প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং উক্ত সাধুর নামানুসারে বৈদ্যনাথ নামানুকরণ হয়।

বৈদ্যনাথে পাণ্ডার সংখ্যা বহুতর, অতি ঘন বসতি, পাণ্ডাদের বাটীতে যাত্রিগণ থাকিতে পায়, বাটীগুলি বড়ই অপরিষ্কার ও অপ্রশস্ত, বায়ু সঞ্চালন প্রায়ই ঘটে না।

বৈদ্যনাথের শিবমন্দির শিল্পনৈপুণ্যে অতি চমৎকার প্রস্তর বিনির্ম্মিত, অতি সুদৃশ্য নানাবিধ কারুকার্য্য সমন্বিত। একটী প্রশস্ত আঙ্গিনার চতুর্দ্দিকে নানাবিধ দেবদেবীর ছোট বড় ২২টী মন্দিরের একত্র সমাবেশ, তাহাদের শিল্প চাতুর্য্য দেখিবার বিষয়। অতি প্রাচীন কালে ভারতে স্থপতি কার্য্যের যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, এ সমস্ত তাহারই প্রমাণ। প্রাঙ্গণ মধ্যস্থ অশেষ কারুকার্য্যখচিত সর্ব্বোচ্চ, আয়তনে বিস্তৃত শিবমন্দির। চতুর্দ্দিকে খোলা বারান্দা, অপ্রশস্ত দুইটী ক্ষুদ্র ঘর মধ্যে অন্ধকার, দিবারাত্র প্রদীপের সাহায্যে আলো বিতরিত হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত গভীর লিঙ্গবাপীতে রাবণেশ্বর বৈদ্যনাথ জিউ বিরাজিত। প্রাতঃকাল হইতে দিবা দুইটা পর্য্যন্ত শত শত লোক সমবেত হইয়া পূজা অর্চ্চনা করিতেছে। সন্ধ্যার সময় মন্দির পরিষ্কার পূর্ব্বক সুন্দররূপে মহা আরতি হয়, তৎকালে দৃশ্য অতি মনোহর। শিবচতুর্দ্দশীর সময় এখানে বহু সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে, তৎকালে দর্শন পূজা অতি দুরূহ ব্যাপার। সুদূরবর্ত্তী মহারাষ্ট্রাদি দাক্ষিণাত্যের ও ভারতের প্রত্যেক জনপদেরই লোকসমাগম হইয়া থাকে। শিব মন্দিরের বারান্দায় রোগী, তাপী, শোকপ্রাপ্ত বহুতর ব্যক্তি নানাবিধ কামনায় বিহ্বল হইয়া অহরহ হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে। কেহ কেহ প্রত্যাদেশে রোগমুক্ত হইতেছে। শিবচতুর্দ্দশীর সময় এখানে প্রকাণ্ড মেলা হয়, সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়া থাকে, তৎকালে শিব দর্শন ও পূজন দুরূহ ব্যাপার। দূরবর্ত্তী দাক্ষিণাত্যাদি, ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ হইতে তৎকালে যাত্রীসমাগম হয়।

মহাপীঠ, উপপীঠ ও তীর্থাদিতে দেব দর্শনে দুই চারিটী স্থল ভিন্ন

কোথাও বান্ধা ট্যাক্স নাই। যাহা কিছু দিতে হয় তাহা পাণ্ডারই পূজা অর্থাৎ পাণ্ডার কথিত ক্রিয়া কলাপ, দান দক্ষিণা সমস্তই পাণ্ডার পারিতোষার্থে, এবং সফল নামক পাণ্ডা-বিদায়েই অধিক ব্যয় হয়; ফলত দেব দর্শন ও পূজনে যাত্রিগণ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক যাহা দান করেন, তাহাতেই অধিকারিগণ সন্তুষ্ট থাকেন। সুতরাং তীর্থের দান দক্ষিণা সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখা প্রয়োজন মনে করিলাম না। তীর্থ প্রাপ্ত মাত্র যাহারা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা তৎকার্য্য সমাধান্তে অবস্থা বিবেচনায় দানাদি, ব্রাহ্মণ ভোজন, অনাথ কাঙ্গালীকে পরিতোষ করিতে পারেন।

গীতায় স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যোমে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ॥"

৯ অধ্যায় ২৬ শ্লোক।

অর্থ—যিনি আমাকে ভক্তি সহকারে পত্র (তুলসী বিল্বপত্রাদি), পুষ্প, বৃক্ষাদির ফল এবং জল প্রদান করেন, আমি সেই ভক্তের প্রদত্ত পত্র পুষ্পাদি গ্রহণ করিয়া থাকি।

সুতরাং দেবপূজার জন্য ভক্তিপূর্ব্বক পত্র পুষ্পাদির দরকার। এখানে পুষ্প বিল্বপত্র যেমন মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়, তদ্রূপ একটী পয়সা দিয়া আঙ্গিনাস্থিত কূপ জল ক্রয় করিতে হয়। পঞ্চ গঙ্গার জল অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া মহাদেবের স্নানার্থ প্রদানের বিধান আছে, তজ্জন্য অন্যূন পক্ষে ॥৵০ আনা, মধ্যম ১।০ ও সর্ব্বোপরি ২॥০ টাকা পর্য্যন্ত পাণ্ডাগণ লইয়া থাকেন। যাঁহারা ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন তাঁহাদের ইহার একান্ত দরকার। মহাদেব পূজা করিয়া লিঙ্গোপরি কয়েকটী পয়সা দিতে হয়।

আমরা একদিন মাত্র পাণ্ডার বাটীতে থাকিয়া দশ টাকা ভাড়ায় একতালা ছোট বাড়ীতে কয়েকদিন ছিলাম। আমার পেটের অসুখ ছিল, কয়েকদিন ছড়ার জল সেবনে সারিয়া গেল। দরুয়া জোর নামক ছড়ার জল সর্ব্বোৎকৃষ্ট, বালি খুঁড়িয়া অন্তঃপ্রবাহিত জল আনিতে হয়, সকল সময় ছড়াতে জল থাকে না, তাই ফল্গু নদীর ন্যায় বালি খুঁড়িয়া জল বাহির করিতে হয়। দুই তিন সপ্তাহ এখানে বাস করিয়া কেবল ছড়ার জল পানে কঠিন আমাশয় দূর হয়। এতদ্‌ভিন্ন সরযু জোর নামক আর একটী ছড়া আছে, তাহার জল গুণে পূর্ব্ব ছড়া হইতে হীন।

পূর্ব্বে কেবল তীর্থ বলিয়া বৈদ্যনাথে লোকসমাগম হইত। ইং ১৮৭৯ সন হইতে যখন মৃত মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু জীবনের শেষ ভাগ কর্ত্তনের জন্য এখানে বাস করিয়াছিলেন, তখন হইতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বৈদ্যনাথে সাধারণের মন আকৃষ্ট হয়। তৎপর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর আশ্রম প্রস্তুত করা হইতেই এ স্থান বঙ্গদেশের প্রধানতম স্বাস্থ্য কেন্দ্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এখানে সেপ্টেম্বর মাস হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য অতি উৎকৃষ্ট। যদিচ মধুপুর, গিরিডি, শিমূলতলা, সীতারাম-পুর, হাজারিবাগ প্রভৃতি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ইহার তুল্য স্থানীয় কিন্তু নানা কারণে ও রাজা, মহারাজাদিগের আবাস বাটী নির্ম্মিত হওয়াতে ঘন বসতি হইয়া বৈদ্যনাথ বড়ই জাঁকাল হইয়াছে। কেষ্টর টাউন, উইলিয়ম্ টাউন, বেল বাগান, প্রভৃতি স্থানে এখন আর নূতন বাড়ীর স্থান নাই; উত্তরদিকে পর্ব্বতশৃঙ্গে কয়েকটী বড় লোকের বাটী প্রস্তুত হইতেছে, তথায় এখনও স্থান পাওয়া যায়। এখানে সময়ে সময়ে এক প্রকার স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তক সুনির্ম্মল বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, অধিবাসিগণ স্বচ্ছন্দে খালি গায়ে ঐ বায়ু সেবন করিয়া থাকেন। বহুতর চিকিৎসকগণের মতে, প্লীহা ও লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বর, ফুস্‌ফুসের পীড়া, শ্বাস কাশি, শীত কালের বহুমূত্র, শোথ, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, উদরাময় ইত্যাদি রোগ কয়েক মাস

এখানে বাস করিলেই আরোগ্য হয়। আমার একজন পরিচিত উকিল বাতের পীড়ায় বাক্ শক্তি রহিত হইয়াছিলেন। তিনি দুই মাস এখানে বাস করিয়া এতদূর সারিয়াছিলেন যে, আমার সহিত এক ঘণ্টা কাল বাক্যালাপ করিয়াছিলেন। জংসন হইতে প্রায় ৪ মাইল পর্য্যন্ত যে ছোট একটী রেল বৈদ্যনাথ ধাম পর্য্যন্ত আসিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে সমুন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গে ও সমতল ভূমিতে বঙ্গীয় জমিদার ও ধনীবর্গের সুন্দর সুন্দর ছোট বড় নানাবিধ সৌধরাজি ও বাগান বাটীগুলি ক্লান্ত পথিক-দিগের মনে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত করে। এখানে বহু ভাড়াটীয়া বাড়ী আছে, পূর্ব্বের ভাড়ার তুলনায় গরীব লোকের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। নানাস্থান হইতে পীড়িত ব্যক্তিগণ স্বাস্থ্য লাভের জন্য এখানে আসিয়া থাকেন। পূজার ছুটিতে কলিকাতা অঞ্চলের বহু হাকিম, উকিল, আমলা, ও ধনীগণের সমাগমে সহরের জাঁকজমকতার সঙ্গে বাটী ভাড়া ত্রিগুণ, চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এস্থানের লোক সংখ্যা পূর্ব্ব সেনসাসে নয় সহস্র ছিল, এখন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমুদ্র হইতে ৮৭৪ ফিট উচ্চ। সন্তোষের পুণ্যবতী দয়াময়ী রাণী দীনমণি চৌধুরাণী মহাশয়ার যত্নে ও আনুকূল্যে এখানে একটী কুষ্ঠাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। অনেক রোগী আশ্রয় পাইয়া চিকিৎসিত হইতেছে, আমরা একদিন কুষ্ঠাশ্রম দেখিতে গিয়াছিলাম ; ইহার নিয়ম ও সুশৃঙ্খলাদি দৃষ্টে সন্তোষ লাভ করিয়াছি।

সোন নদে।

"সোনাখ্যে ভদ্রসেনস্তু নর্ম্মদাখ্যা নিতম্বকে।"

হাজারীবাগ ও ছোট নাগপুর প্রদেশস্থ পর্ব্বত ভূমি হইতে সুপ্রশস্ত সোন নদ দানাপুর নিকটে গঙ্গাতে পতিত হইয়াছে। এই সুপ্রশস্ত নদের উপর দিয়াই ই, আই রেল পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে। এই নদের জল সর্ব্বদা সকল স্থানে সমভাবে থাকে না, বালির চর পড়িয়াছে, এই নদের পোল অতি বিস্তৃত। এরূপ দীর্ঘ পোল আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই নদে সতী দেবীর নিতম্ব দেশ পতিত হইয়াছিল। দেবীর নাম নর্ম্মদা এবং ভদ্রসেন নামক ভৈরব। ইহা ৫১ পীঠের অন্তর্গত। সতী দেবীর অঙ্গ পতিত হওয়ায় এই নদের জলের পবিত্রতা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে।

মিথিলা বা জনকপুরী।

"মিথিলায়াং মহাদেবী বামস্কন্ধে মহোদরঃ।"

বেহার নর্থ ওয়েষ্টারন্ রেলে মিথিলা পৌছিতে হয়, মিথিলা বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গ জিলার অন্তর্গত। জনকপুর রোড ষ্টেশনের সন্নিকট। কলিকাতা হইতে জনকপুররোড ষ্টেশনের ভাড়া ৪৲ টাকা। মিথিলাতে ত্রেতা যুগে রাজর্ষি জনকের রাজধানী ছিল। শ্রীবিষ্ণু অবতার শ্রীরামচন্দ্র এখানে হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। হর-ধনুর অর্দ্ধাংশ জনকপুরে ও অপরার্দ্ধ সীতামারি ষ্টেশনের ৬ মাইল ব্যবধানে আছে। মিথিলায় সতীদেবীর বাম স্কন্ধ পতিত হইয়াছিল। দেবীর নাম মহাদেবী এবং ভৈরবের নাম মহোদর। ইহা ৫১ পীঠের অন্যতর মহাপীঠ। এখানে দেবী শিলারূপী। পর্ব্বাদি উপলক্ষে এখানে বহু লোকসমাগম হয়। ইহার নিকটেই গৌতমাশ্রম। ন্যায় দর্শন প্রণেতা, এই গৌতম ঋষি রাজর্ষি জনকের পুরোহিত ছিলেন; তাঁহার তপস্যার স্থানকেই গৌতমাশ্রম কহে, ইহা ভরোবা পরগণার অন্তর্গত ব্রহ্মপুর গ্রামে অবস্থিত। গৌতমমুনি ও অহল্যা দেবীর প্রসঙ্গ সকলেই অবগত আছেন। দেবী অহল্যা পতিশাপে যোগনিদ্রায় বহুকাল মৃতপ্রায় ছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনে শাপমুক্তা হন। সেই স্থান অদ্যাপি অহল্যা পাষাণী নামে কথিত। উহা বক্সার জিলার আড়াই ক্রোশ পূর্ব্বে গঙ্গার তীরে, ডুমরাও হইতে ৯ মাইল উত্তরে। অহল্যা দেবীর ও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পাষাণময় মূর্ত্তি আছে। মিথিলা সংস্কৃতালোচনার জন্য বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত মণ্ডণ মিশ্রের বাটী মিথিলায় ছিল। মিথিলা একদিন

ন্যায় শাস্ত্রের আলোচনার জন্য ভারতবিখ্যাত ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য এখানে ছাত্রসমাগম হইত। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলা হইতে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বঙ্গদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

উপগীত
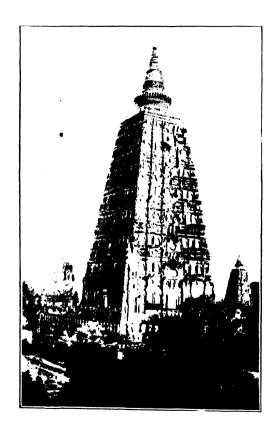
বুদ্ধগয়া

গয়াতীর্থ।

"গয়ায়াং নহি তৎস্থানং যত্র তীর্থো ন বিদ্যতে
সান্নিধ্যং সর্ব্বতীর্থাণাং গয়াতীর্থং ততোবরম্।
ব্রহ্মজ্ঞানেন কিং সাধ্যং গোগ্রহে মরণেন কিম্
বাসেন কিং কুরুক্ষেত্রে যদি পুত্রো গয়াং ব্রজেৎ॥"

গয়া হিন্দুদিগের মুক্তিধাম। ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থান হইতেই হিন্দুগণ পিতৃলোকের মুক্তিকামনায় গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড দিবার জন্য পবিত্র গয়াধামে আসিয়া থাকেন। গয়াতে যাইবার জন্য চতুর্দ্দিকেই রেলপথ বিদ্যমান আছে। কলিকাতা হইতে তিনটী পথ আছে। লুপ লাইন, কর্ড লাইন ও গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইন। লুপ লাইন ই, আই, আর প্রথম প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে অত্যন্ত ঘুরিয়া যাইতে হইত বলিয়া কর্ড লাইন হইয়াছিল; তৎপর সময়ের ও ব্যয়ের লাঘব জন্য গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইন হইয়াছে। যাঁহারা বৈদ্যনাথ দর্শন করিয়া গয়াধামে যাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের কিউল ষ্টেশনে গাড়ী বদলাইয়া যাইতে হয়। আর যাহারা কলিকাতা হইতে হাবড়া ষ্টেশন কিম্বা নৈহাটী হইতে বেণ্ডল ষ্টেশন হইয়া যায়, তাহাদিগকে কোথাও গাড়ী বদল করিতে হয় না; গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনে ৮ ঘণ্টা মধ্যে গয়ার পার্শ্ববর্ত্তী সাহেবগঞ্জ নামক ষ্টেশনে নামিতে হয়।

গয়া বেহার প্রদেশের একটী জিলা; ফল্গুনদীতটে অবস্থিত, অর্দ্ধেকাংশ হিন্দুর বসতি স্থান পাণ্ডাদিগের বাটী ও বাসাবাটী ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। সাহেবগঞ্জ, রেল ষ্টেশন, গবর্ণমেন্টের সমস্ত আফিসাদি, অফিসারদিগের ও মুসলমান প্রভৃতির বসতি। ইহা হাবড়া হইতে

গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইনে ২৯২ মাইল ব্যবধান, তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৩া৯ পাই। বৈদ্যনাথ হইতে যাহারা গয়া যায় তাহাদিগকে ৬৩/০ আনা ভাড়া দিতে হয়। সাহেবগঞ্জ ষ্টেশনের পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা আছে, তাহা অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন; যাত্রিগণ বিনা ভাড়ায় তিন দিন তথায় থাকিতে পারে, যাহারা পাক করিতে অনিচ্ছুক তাহাদের জন্য নিকটেই হোটেল আছে, তথায় আহারাদি সমাপনে ধর্ম্মশালায় থাকিতে পারে। সাহেবগঞ্জ হইতে তীর্থস্থান প্রায় তিন মাইল, ঘোড়ার গাড়ী কিম্বা একাগাড়ী সর্ব্বদাই পাওয়া যায়, ছয় আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত ভাড়া লাগে। গয়া পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশ। অন্তঃসলিলা ফল্গু নদী পূর্ব্বদিকে প্রবাহিতা; পশ্চিমে প্রেতশিলা, উত্তরে রামশিলা, দক্ষিণে পাহাড়। পর্ব্বত বেষ্টিত গয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনোহর, লোক সংখ্যা এক লক্ষ।

গয়াতে যাত্রীদিগের অবস্থান জন্য পাণ্ডাদিগের বহুতর বাসা বাড়ী আছে এবং আপন আপন বাড়ীতেও পৃথক ঘর আছে। যাহারা ফল্গু নদীর তটবর্ত্তী পাণ্ডার বাস বাটীতে থাকিতে পারে, তাহাদের দেব দর্শন, স্নান, পূজা, হাট বাজার ইত্যাদি সকল বিষয়েই সুবিধা হইয়া থাকে। গয়াধামের সন্নিকটও যাত্রীদিগের থাকার সুবিধার জন্য ধনকুবের পুণ্যবান মাড়োয়ারীর একটী অত্যুৎকৃষ্ট বৃহৎ ধর্ম্মশালা আছে। যাত্রিগণ আপন আপন সুবিধামতে যেখানে ইচ্ছা থাকিতে পারে। শাস্ত্রানুসারে গয়াতীর্থে উপস্থিত হইয়া আপন পিতৃ-পিতামহের নির্দ্দিষ্ট পাণ্ডা পূজা করিয়া, ফল্গুনদীতে স্নান, সংকল্প ও তর্পণাদি করতঃ পুণ্যবতী মহারাণী অহল্যাবাই কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত প্রস্তর বাঁধান ঘাটে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিতে হয়, তৎপর গদাধরের পাদপদ্মে দ্বাদশ পুরুষের পিণ্ড দিতে হয়। এই সময় গদাধরের মন্দিরে প্রবেশ জন্য কয়েকটী পয়সা ও পাদপদ্মে যদৃচ্ছা দক্ষিণা দিবার নিয়ম আছে। পিণ্ড ও পূজাদি দেওয়ার উপকরণাদি পাণ্ডাই দিয়া থাকেন, তজ্জন্য মুদীর ও মিশ্রির (পুরোহিতের) স্বতন্ত্র দক্ষিণা দিতে হয়।

গদাধরের শ্রীমন্দির কৃষ্ণপ্রস্তরবিনির্ম্মিত উচ্চ মঠাকার, সম্মুখে নানা কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভোপরি নাটমন্দির। ইহা ছোট হইলেও নানাবিধ কারুকার্য্যসমন্বিত প্রাচীন হিন্দু শিল্পকলার অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন। ইহার প্রতি প্রস্তরখণ্ড এতাধিক কারুকার্য্য ও শিল্পচাতুর্য্যবিশিষ্ট যে অভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। মন্দির মধ্যে গদাধরের পাদপদ্মের চতুর্দ্দিকে রৌপ্যনির্ম্মিত একটি বেড় অর্থাৎ দেওয়াল আছে; মধ্যে গদাধরের পাদপদ্মের চিহ্ন। বাহিরে বসিয়া মৃত ব্যক্তির নাম গোত্র উল্লেখে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পিণ্ড পাদপদ্মে প্রদান করিতে হয়। সর্ব্বদা এত জনতা হয় যে, ভালরূপে বসিবার স্থানও পাওয়া যায় না। যাহারা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে পারে, তাহারা কপাটি করিয়া সুবিধা-মতে একাকী পিণ্ড দিতে পারে। পিণ্ডদানকার্য্য শেষ হইলে সাধ্যানু-সারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। ভোজ্য সামগ্রী বাজারেই প্রস্তুত থাকে; তথাকার প্রস্তুতি পুরী, তরকারী ইত্যাদি ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণেই আহার করিয়া থাকে। পিণ্ড দিবার তিন প্রকার বিধান আছে। একোদ্দিষ্ট, দর্শনী ও থাপর। যাহারা একদিন মাত্র পিণ্ড দেয় তাহাকে একোদ্দিষ্ট, তিন দিন পিণ্ড দিলে দর্শনী এবং সাত দিন পর্য্যন্ত গদাধরের পাদপদ্ম ও অন্যান্য তীর্থস্থান যথা রামশিলা, প্রেতশিলা, সূর্য্যকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, ইত্যাদি অনেক স্থানে পিণ্ড প্রদান করিয়া অক্ষয় বটবৃক্ষের নিম্নে পাণ্ডার পদে যথারীতি দক্ষিণা দিয়া সফল লওয়ার নাম থাপর। পূর্ব্বে দক্ষিণার বড়ই আধিক্য ছিল, এখন যাত্রিগণ অবস্থা ও ক্রিয়ার তারতম্য অনুসারে যে দক্ষিণা দেন তাহাতেই অনেক গয়ালি পাণ্ডা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

গয়ার পুরোহিতকে (পাণ্ডাকে) গয়ালি বলে। তাঁহারা ব্রহ্মার যজ্ঞার্থে সৃষ্ট হইয়াছিলেন এমত বলেন। অর্থলোভে অভিশাপগ্রস্ত হইয়া তাঁহারা অন্যান্য ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক হইয়াছেন। সমস্ত ভারতের হিন্দুগণ এখানে পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। তাহাদের প্রদত্ত অর্থে গয়ালিরা অত্যন্ত

ধনবান হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইঁহারা উৎপীড়ন করিয়া যাত্রীর নিকট যদৃচ্ছা অর্থ গ্রহণ করিতেন, এখন তদ্রূপ নহে। বিষ্ণুপাদপদ্মে অঙ্কিত স্থানে পিণ্ড প্রদত্ত হয়। চৈত্র মাসে মধুগয়া, ভাদ্রমাসে সিংহ গয়া, কার্ত্তিক ও পৌষ মাস মহা পুণ্য বলিয়া তদুপলক্ষে বহুতর যাত্রীর সমাগম হয়; তৎকালে জনতার প্রাচুর্য্যে পিণ্ড প্রদান দুরূহ ব্যাপার। দিবা ভাগে গদাধরের পাদ-পদ্মের চিহ্ন ভালরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না, পিণ্ডাদি দ্বারা প্রায়ই আবৃত থাকে। রাত্রিতে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া যখন শৃঙ্গার বেশে আরতি হয়, সেই সময় চন্দনলিপ্ত পাদপদ্মের বড়ই অপূর্ব্ব শোভা হয়, সেই সময় সকলের তাহা দর্শন করা উচিত। কথিত আছে, পুরাকালের শঙ্করাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্য একদা গয়াক্ষেত্রে গমন করিয়া পিণ্ড প্রদানে ইচ্ছুক হইলে, অর্থাভাববশতঃ কোন গয়ালিই তাঁহার কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন নাই, তখন সেই দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত শাস্ত্রালাপ দ্বারা প্রমাণ করিলেন, পঞ্চক্রোশী গয়ার যে কোন স্থানে পিণ্ড দেওয়া হইবে, তাহাতেই পিতৃলোক উদ্ধার পাইবেন; সুতরাং গদাধরের অঙ্কিত পাদপদ্ম স্থান ভিন্ন অন্য স্থানেই তিনি পিণ্ড দিবেন। ইহাতে পাণ্ডাদিগের অর্থাগমের পথ খর্ব্ব হইবে এবং শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব জানিতে পারিয়া বিনা অর্থেই তাঁহার পিতৃ-লোকের পিণ্ড গদাধরের পাদপদ্মে প্রদান করাইয়া পাদপদ্মে পিণ্ডদান ক্রিয়ার স্বত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন।

তীর্থাদির উৎপত্তি এবং মহাপুরুষগণের জন্ম বৃত্তান্ত উপলক্ষে নানাবিধ অলৌকিক বিবরণ পুরাণাদি ও জনশ্রুতিতে বর্ণিত আছে। গয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে গয়ামাহাত্ম্য ইত্যাদি গ্রন্থে ও পাণ্ডাদিগের নিকট যাহা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে তাহা পাঠকদিগের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করা গেল। পুরাণে বর্ণিত আছে, দুর্দ্দান্ত পরাক্রমশালী ত্রিপুরাসুরের উৎপীড়নে ত্রিভুবন উৎ-পীড়িত হইলে দেবগণ অন্যায়রূপে ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরের মহাবিক্রমশালী পরম বৈষ্ণব গয়াসুর নামে এক পুত্র ছিল। বিষ্ণুর

জগন্নাথদেবের মন্দির
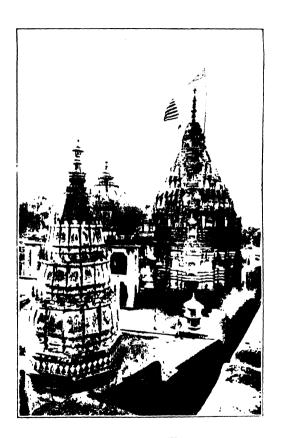
আরাধনা করিয়া গয়াসুর অমিতবলশালী ও মহাপরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। দেবগণ ছলনা দ্বারা ত্রিপুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, এই সংবাদ অবগত হইয়া পিতৃ-শত্রু দমন করিবার জন্য, গয়াসুর দেবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া বারম্বার দেবতাদিগকে পরাজিত ও নানা প্রকারে লাঞ্ছিত করিলে, দেবগণ পদ্মযোনি ভগবান ব্রহ্মাকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ বিপদহারী বৈকুণ্ঠপতির শরণ লইয়া গয়াসুরকৃত অত্যাচারকাহিনী বিবৃত করিলেন। বিপদভঞ্জন মধুসূদন দেবগণের ক্লেশে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মাকে একটী যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে এবং সেই যজ্ঞের জন্য ইঙ্গিতে গয়াসুরের পবিত্র শরীর নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ গয়াসুরের নিকট আসিয়া আতিথ্য স্বীকার করিলেন। পরম বৈষ্ণব গয়াসুর ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণের অতিথি সৎকারে বদ্ধপরিকর হইয়া নিবেদন করিলেন, প্রভু, কিরূপে আমি অতিথির প্রিয় সম্পাদন করিব। ভগবান পদ্মযোনি গয়াসুরকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া যজ্ঞ করিবার জন্য তাহার পবিত্র দেহ যাচ্ঞা করিলেন। পরম বৈষ্ণব গয়াসুর ব্রহ্মার বাক্যে সম্মত হইয়া আপন দেহ অর্পণ করতঃ কোলাহল নামক পর্ব্বতের নৈর্ঋত দিকে আপনার মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার নাভি জগন্নাথক্ষেত্রে জাজপুর ও পদদ্বয় চন্দ্রশেখর পর্ব্বত স্পর্শ করিল। ব্রহ্মা যজ্ঞকার্য্যার্থে পৃথক ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়া দেবগণ সহ গয়াসুরের পঞ্চক্রোশব্যাপী মস্তকে যজ্ঞ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ব্রহ্মযজ্ঞ শেষ হইলে গয়াসুর উত্থিত হইবার জন্য মস্তক সঞ্চালন করিলেন, তদ্দৃষ্টে দেবগণ বৃহৎ বৃহৎ শিলা তদুপরি স্থাপন করিলেন; গয়াসুর অতি ভার শিলা সহ উঠিবার চেষ্টা করিলে ব্রহ্মা দেবগণকে স্ব স্ব বাহন সহ শিলা উপরি অবস্থান করিতে বলিলেন। দেবগণ স্বকীয় বাহন সহ অচলভাবে শিলার উপরি অবস্থান করিয়াও গয়াসুরকে নিশ্চল করিতে পারিলেন না; তখন নিরুপায় হইয়া বিধাতা সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান নারায়ণকে গয়াসুরের নির্য্যাতন কামনায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ভূভারহারক পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীহরি ব্রহ্মার কাতরে বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করতঃ ঐ শিলোপরি এক পদ স্থাপন করিলেন। অমনি ভগবানের শ্রীপাদস্পর্শে গয়াসুরের দিব্য জ্ঞান জন্মিয়া বিশ্বম্ভর মূর্ত্তির স্তুতি করিতে লাগিলেন। শ্রীহরি গয়াসুরের স্তবে তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। গয়াসুর ক্ষণভঙ্গুর শরীরের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া মানবের হিতকামনায় অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন জন্য এই বর প্রার্থনা করিলেন—"হে প্রভো! যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে এই বর দেন যেন এই স্থান আমার নামানুসারে গয়াক্ষেত্র নামে আখ্যাত হইয়া চন্দ্র সূর্য্য ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত, পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ হয়; যে সকল দেবগণ আমার নির্য্যাতনমানসে এখানে আসিয়াছেন, তাঁহারা তিলার্দ্ধের জন্যও এই স্থান পরিত্যাগ না করেন; এখানে সমস্ত তীর্থাদির ফল প্রাপ্ত হউক; এবং আমার মস্তকোপরি শিলাতে যে মানব পিতৃ উদ্দেশ্যে পিণ্ড প্রদান করিবে সে স্বয়ং এবং ঊর্দ্ধতন সহস্র পুরুষ সহ সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরব্রহ্মে লীন হইবে; এই ক্ষেত্রে আসিয়া যে কেহ ত্রিরাত্র বাস করিবে তাহার ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক সমস্ত বিনষ্ট হইবে। কিন্তু যে সকল দেবগণ এ স্থানে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের কেহ যদি এই স্থান পরিত্যাগ করেন, কিম্বা একদিন আমার শিরোপরি পিণ্ড প্রদত্ত না হয়, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া উত্থিত হইব।" ভগবান যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি "তথাস্তু" (তাহাই হউক) বলিয়া বর প্রদান করিলেন। তদবধি ইহা পিতৃ-তীর্থ নামে আখ্যাত হইয়াছে। গয়া অতি প্রাচীন তীর্থ, রামায়ণ মহা-ভারতাদিতেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

গয়ার প্রেতশিলা বড়ই উচ্চ, বহু সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে হয়। তথায় দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিলে মনে হয় যেন, সমতল-ভূমে নিবিড় বৃক্ষাবলী সমাচ্ছন্ন, প্রকৃতির একটী ছোট খাট উদ্যান মৃত্তিকাসংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে; নিকটস্থ ছোট ছোট গণ্ড শৈলগুলি বৃক্ষরাজি ও লতা

গুল্মাদি পরিবেষ্টিত হইয়া নিস্তব্ধভাবে যেন প্রকৃতির সুষমা বিস্তার করিতেছে। উপরে একটী দেবমন্দির আছে, তথায় প্রেত পিণ্ড দিতে হয়। সানুদেশে একটী প্রস্তরবাঁধা কুণ্ড আছে, তাহাতে স্নান করিয়া উপরে উঠিতে হয়। রামশিলা অপেক্ষাকৃত নিম্ন বটে, তাহার উপরে উঠিবার জন্যও প্রশস্ত সিঁড়ি আছে। এ সব স্থানে পিণ্ড দেওয়ার সময় পাণ্ডাদিগের মুখোচ্চারিত মাতৃ ষোড়শী, পিতৃ ষোড়শী প্রভৃতি শ্রাদ্ধের মন্ত্রগুলি বড়ই শ্রুতিমধুর ও হৃদয়াকর্ষক; তৎশ্রবণে হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়।

গয়াতে ভাল জলের অভাব। কূপের জলই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক, স্বাস্থ্য ভাল নহে, নানা দেশীয় বহুতর লোক সমাগমে সংক্রামক রোগ বড় দূর হয় না; সপ্তাহ বাস করিলেই শরীরের কৃশতা ইত্যাদি বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। গয়ালিদিগের প্রদত্ত বাসাবাড়ীগুলি বড়ই অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর। এস্থানের ফলের মধ্যে সিঙ্গুর (পানিফল) উৎকৃষ্ট ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, ইহার আটা উপাদেয় খাদ্য। কৃষ্ণ পাথরের থালা বাটি ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

বুদ্ধগয়া বা বোধিগয়া।

ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥

শ্রীভাগবতে ১স্কন্দে

বুদ্ধগয়া গয়া জিলার অন্তর্গত বৌদ্ধধর্ম্মের অতি প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ জগদ্ব্যাপী তীর্থ স্থান। ইহাকে বুদ্ধগয়া বা বোধি গয়া বলিয়া থাকে। গয়া ধাম হইতে প্রায় সাত মাইল ব্যবধান। ফল্গু নদী পার হইয়া পদব্রজে কিম্বা গো শকটে যাওয়া যায়। এথানে পুরাণ বর্ণিত নবম অবতার ভগবান বৌদ্ধদেব সিদ্ধ হইয়াছিলেন। পৃথিবীতে যুগে যুগে যে সকল মহাপুরুষ বা অবতার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বসুন্ধরাকে পবিত্র করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধদেবের ন্যায় কেহই সার্ব্বভৌম প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। হিন্দুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, খৃষ্টানের ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র মহাত্মা যীশুখৃষ্ট; ইসলাম ধর্ম্মের প্রেরিত পুরুষ মহম্মদ, শিখদিগের গুরু নানক প্রভৃতি অবতার ও মহাপুরুষগণ প্রাণশূন্য হইয়া অনলে কিম্বা ভূগর্ভে মিশিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের চিতাভস্ম, অস্থি, দন্ত বা কেশগুচ্ছ লইয়া কোন উপাসকমণ্ডলীই চিত্তহর গগনভেদী বিচিত্র স্তম্ভাদি নির্ম্মিত করিয়া উপাস্যদেবের চিরস্মরণীয় অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান নাই। ভগবান বুদ্ধদেবের নশ্বর শরীর কুশীনগরে যে মুহূর্ত্তে চিতানলে ভস্মীভূত হইল, অমনি মহাকশ্যপপ্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষু সেই পবিত্র ভস্মরাশি, অস্থি, দন্ত ও কেশ ইত্যাদি স্বর্ণ পাত্রে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে তাহাই রাজগৃহ, বৈশালী, শ্রাবস্তি, কপিলবস্তু, অলকাপুর, রামগ্রাম ও কুশীনগর প্রভৃতি নানা স্থানে মহাসমারোহে প্রোথিত করিয়া তদুপরি

MAHABODHI
PRINCE SAKYA SINHA
BUDDHA
SIR ASHLEY EDEN
ANNO DOMINI

বুদ্ধদেব

অভ্রভেদী মন্দির স্তম্ভ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। অল্প দিন হইল তাঁহার একটী দন্ত লইয়া বৌদ্ধজগতে যে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল তাহা সমস্ত পাঠকই অবগত আছেন। অদ্ভুত কারুকার্য্যে খচিত, শিল্পনৈপুণ্যবিশিষ্ট কীর্ত্তিস্তম্ভভূষিত ঐ সকল স্থান অদ্যাপি পৃথিবী মধ্যে প্রসিদ্ধ তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। বুদ্ধগয়া তাহাদের মধ্যে মহাতীর্থ। পৃথিবীতে বুদ্ধের ন্যায় মহাপুরুষ এ পর্য্যন্ত জন্মপরিগ্রহ করেন নাই। মোঙ্গলিয়া হইতে লাপলাণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশে, জাপান, চীন, শ্যাম, ব্রহ্ম দেশ, যবদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি যাবতীয় দেশ মহাদেশ দ্বীপ ও বুদ্ধদেবের লীলা নিকেতন ভারতবর্ষ—সর্ব্বত্রই বুদ্ধদেবের পুণ্য চরণচিহ্ন দেদীপ্যমান। পণ্ডিতগণের গভীর গবেষণায় নানা স্থানে বৌদ্ধ বিহারের স্মৃতিস্তম্ভ সকল আবিষ্কৃত হইতেছে এবং অদ্যাপি জগতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকের উপাস্য দেবের যে সিদ্ধ পীঠ দর্শন করিবার জন্য নানা দিগ্‌দেশ হইতে অন্যান্য যাত্রিগণ আসিয়া থাকেন—যে বুদ্ধদেবের অতীত মহিমার অনুধ্যানে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার প্রাচ্যতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী সর্ব্বদা নিবিষ্ট থাকিয়া বৌদ্ধ ভাবানুস্যূত শিল্পসাহিত্যসংক্রান্ত পুস্তকাদি প্রচার ও বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনা করিতেছেন—সেই ভগবান বুদ্ধদেবের জন্ম ও লীলা ইত্যাদি পাঠকগণের অপ্রীতিকর হইবে না বিবেচনা করিয়া কথঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করা গেল।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ অবসানে ভারতবর্ষ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। মহাযুদ্ধের সহিত যে আর্য্য সমাজের গৌরবের রবি চিরকালের জন্য অস্তাচল গমনোন্মুখ হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর মতদ্বৈধ নাই। উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে কুমারীকা পর্য্যন্ত মহাবিক্রমশালী ক্ষত্রিয় বীরগণ ঐ মহাসমরে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলে তাহাদের বংশধরগণের জ্যানির্ঘোষ, জয়ধ্বনি ও অসি ঝন্ ঝনা বীরদর্প আর শ্রুতিগোচর হয় নাই। সেই একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তে নির্ব্বাণোন্মুখ চিতানলের ন্যায় আর্য্যাবর্ত্তে এখানে

সেখানে যে দুই একটী ক্ষুদ্র রাজ্য গঠিত হইতেছিল তাহাও সামান্য মাত্র আলোক বিকীর্ণ করিয়া অচিরে চির অন্ধকারে লুক্কায়িত হইয়াছিল। অত্যধিক পরিশ্রমের পর যেমন প্রাণী মাত্রই কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া থাকে, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের মহাপরিশ্রমের পর আর্য্যসমাজও সেইরূপ ক্রমশঃ নিশ্চেষ্ট ও অতি দুর্ব্বল অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল। তৎকালে রাজাশূন্য রাজ্যে দস্যু তস্করাদির অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সর্ব্বত্র অরাজকতা ও অশান্তি বিরাজমান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশধ্বংসের পর তিরোধান হইবা মাত্রই পঞ্চনদ প্রদেশে দস্যুগণ যে যাদবরমণীগণসহ ধনরত্নাদি অপহরণ করিয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ মহাভারতের মুষল পর্ব্বে পাঠকগণ পাঠ করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে দস্যু তস্করের অত্যাচার, দাম্ভিক পণ্ডিতদিগের ধর্ম্মবিদ্বেষ, সাধারণ লোকের আত্মকলহ, পরপীড়া, মিথ্যাভাষণ, পরদ্রব্যহরণ, জীবহিংসা ইত্যাদি অধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পাইয়া কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে এক ভয়ঙ্কর আকার হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণ সাধু ব্যক্তিগণের অসহ্য হৃদয়-বিদারক ভীষণ মনস্তাপে ভগবানের সিংহাসন কম্পিত করিল। জীবের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার দৃষ্টে করুণাময় ভগবানের হৃদয় সিক্ত হইল। তিনি আর বৈকুণ্ঠধামে স্থির থাকিতে পারিলেন না, অমনি জীবে দয়া বিতরণ জন্য অবতীর্ণ হইলেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়াচ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।"

অধর্ম্মের বিনাশ ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সংস্থাপন করিবার জন্য সকল দেশে সকল সময়েই পূর্ণব্রহ্ম ভগবান অবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে দেখা যায়, অবতাররূপে দুষ্ট দমনার্থে নানাবিধ অলৌকিক ও লোক বিস্ময়কর কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধ

অবতারে তদ্বিপরীতে পৃথিবীর পাপভার হ্রাস করিবার জন্য, অজ্ঞান মানবদিগের তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিবার নিমিত্ত সর্ব্বজীবে দয়া প্রদর্শনে এক সার্ব্বজনিক অচিন্তনীয় উদারভাব প্রদর্শন করিয়াছেন।

অতি প্রাচীনকালে সূর্য্যবংশীয় রাজা ইক্ষ্বাকুর পুত্রগণ কর্ত্তৃক হিমালয়ের উৎসঙ্গ প্রদেশে কপিলবস্তু নামে এক নগরী নির্ম্মিত হইয়াছিল, উহার অপর নাম কোহানা। ইহা নেপাল রাজ্যান্তর্ব্বর্ত্তী একটী নগর। এই বংশে কাল-ক্রমে শুদ্ধোদন নামে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত এক নরপতি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কোলির বংশীয় সুভূতি শাক্যের পরমরূপ-লাবণ্যবতী মায়াদেবী ও মহাপ্রজাবতী নাম্নী দুইটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পুত্র মুখ দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে ভগবানের কৃপায় প্রধান মহিষী মায়াদেবীর গর্ভ সঞ্চার হইল। অবতার ও মহাপুরুষগণের জন্মগ্রহণপ্রণালী সাধারণ মানবগণের জন্মগ্রহণের নিয়ম হইতে বিভিন্ন প্রকার বলিয়া সকল সম্প্রদায়েই বর্ণিত আছে। বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণ সম্বন্ধেও নানাবিধ অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। দশমাস অতীতে বৈশাখের পূর্ণিমা তিথিতে কপিলবস্তু নগরের সান্নিধ্যে লুম্বিনী নামক পরম রমণীয় উদ্যান মধ্যে মায়াদেবী সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত একটী পুত্র প্রসব করেন। পুত্র জাত হইবামাত্রই মহারাজ শুদ্ধোদনের সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া পুত্রের নাম তিনি সর্ব্বার্থসিদ্ধ বা সিদ্ধার্থ রাখেন। সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণের সাতদিন পরে সূতিকাগারেই মায়াদেবী পরলোক গমন করি-লেন। সিদ্ধার্থকে কপিলবস্তু রাজধানীতে আনয়ন করিয়া প্রতিপালনের ভার মাতৃস্বসা বিমাতা মহাপ্রজাবতীর হস্তে অর্পণ করিলেন। রাজমহিষী অতিশয় যত্নের সহিত কুমারের লালন পালন করিয়াছিলেন। অসতি নামক এক মহর্ষি সিদ্ধার্থের দ্বাদশ প্রকার মহাপুরুষলক্ষণদৃষ্টে রাজাকে বলিয়াছিলেন, কুমার সংসারাশ্রমে অবস্থান করিলে রাজচক্রবর্ত্তী হইবে আর গৃহত্যাগী হইলে সম্যক সম্বোধি লাভ করিবে।

• যথাসময়ে সিদ্ধার্থ বিদ্যাভ্যাস জন্য বিশ্বামিত্র নামক একজন উপাধ্যায়ের নিকট প্রেরিত হইলেন এবং নিজ অলৌকিক বুদ্ধিবলে অল্পকাল মধ্যেই নানাবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। বাল্যকালেই সিদ্ধার্থের সংসার বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। বিদ্যাশিক্ষাকালেই বর্ণমালার আদ্যাক্ষর অ বর্ণ উচ্চারিত হইবামাত্র "অনিত্য সংসার" এই বাক্য কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল এবং গ্রামে একটী বট বৃক্ষ দেখিয়া তাহার নিম্নে বসিয়া ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ জন্মপত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, জরা, আতুর, মৃত ও ভিক্ষু দর্শন করিলেই সিদ্ধার্থ পরিব্রাজকতা গ্রহণ করিবেন। মহারাজ পুত্রের বৈরাগ্যভাব দর্শনে বিশেষ চিন্তিত হইয়া বিবাহের চেষ্টা করিলেন। সিদ্ধার্থ প্রথম অস্বীকার করেন, পরে চিন্তাযোগে দেখিলেন, "অরণ্যবাসী হইয়া ধর্ম্ম পালন করা যেমন সহজ, সংসারাশ্রমে থাকিয়া শত সহস্র প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করা তত সহজ নহে" সুতরাং আত্মপরীক্ষা জন্য গৃহী হইয়া কঠিনভাবে ধর্ম্মপালন করিতে হইবে; অতএব বিবাহ করা প্রয়োজন মনে করিয়া পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থে দণ্ডাণি শাক্যের পরম রূপলাবণ্যবতী কন্যা গোপাদেবীকে স্বয়ং নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করেন। মহারাজ পুত্রের মনোভাব পরিবর্ত্তন মানসে সিদ্ধার্থকে গোপাদেবীসহ নানাবিধ আমোদ প্রমোদে রত থাকার জন্য সর্ব্বদাই প্রমোদ কাননে বাস করিতে দিয়াছিলেন। নগরের বাহিরে যাইতে দিতেন না।

একদিন ঘটনাচক্রে কুমার রথারোহণে উদ্যানভূমি দর্শনমানসে উত্তর দ্বার পথে যেমন বাহির হইতেছিলেন, পথিমধ্যে এক জন গলিতদেহ, বিগলিতকেশদন্ত কুব্জকে দণ্ড হস্তে অতি কষ্টে গমন করিতে দেখিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কোন্ জীব যাইতেছে?" সারথি বিনীতভাবে বলিল, এই ব্যক্তি মনুষ্য, বৃদ্ধাবস্থায় সকলকেই এই দশা প্রাপ্ত হইতে হয়। কুমার অমনি রথ ফিরাইয়া অন্য দ্বারে যাইতে বলিলেন।

সারথি দক্ষিণ দ্বারে গমন করিলে কুমার দেখিলেন, এক ব্যক্তি পথ পার্শ্বে নিজ মল মূত্র মধ্যে অবস্থান করিয়া ভীষণ যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছে; সারথিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, বলিল, এই ব্যক্তি দারুণ ব্যাধি-পীড়ায় অসহ্য ক্লেশ পাইতেছে। সংসারে সকলেই জরা ব্যাধির অধীন, কেহই ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। তখন কুমার বলিলেন, আরোগ্য স্বপ্ন বিকারের ন্যায় অলীক, ব্যাধিসমূহ অতি ভয়ঙ্কর। কোন্ বিজ্ঞ পুরুষ ইহা দেখিয়া আমোদে লিপ্ত থাকিতে পারেন, অতএব রথ ফিরাও। সারথি পশ্চিম দ্বার দিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিবার সময় কুমার দেখিতে পাইলেন, কয়েকজন লোক বস্ত্রাবৃত করিয়া একটী দেহকে বহন করিয়া নিতেছে; তাহার পশ্চাৎ হাহাকার ধ্বনিতে বিলাপ করিয়া কেহ কেহ যাইতেছে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সারথি ছন্দক বলিল, প্রভু! এই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, তাহার আত্মীয় স্বজন আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না বলিয়াই আর্ত্তনাদ করিতেছে। সিদ্ধার্থ কহিলেন, "যৌবনে ধিক্ কারণ জরা ইহার পশ্চাতে ধাবমান; আরোগ্যে ধিক্ যেহেতু ব্যাধি অবশ্যম্ভাবী; জীবনে ধিক্ কেন না প্রাণীসকল চিরজীবী নহে; পুরুষকে ধিক্ যেহেতু তিনি অলীক আমোদ প্রমোদে মত্ত। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর নিত্যসহচর হইয়া আমাদের যে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? অতএব রথ ফিরাও, আমি আর ভ্রমণে যাইব না, গৃহে গমন করিয়া জীবদুঃখমোচনের উপায় চিন্তা করিব।" তদবধি তাঁহার বৈরাগ্যভাব সমধিক বৃদ্ধি পাইল। দৈবাৎ একদিবস বিভূতিভূষিত কলেবর, মস্তকে জটাকলাপশোভী শান্তশীল, প্রসন্নচিত্ত সৌম্যমূর্ত্তি একজন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহার প্রব্রজ্যার প্রতি বাসনা একান্ত বলবতী হইল। মহারাজা পুত্রের ঈদৃশ বৈরাগ্যভাব উপস্থিত দেখিয়া নানাবিধ উপায়ে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারিলেন না। এ দিকে সিদ্ধার্থ,গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া পিতা ও স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে

গৃহ ত্যাগ করিলে তাহাদের প্রাণে বজ্রাঘাত হইবে মনে করিয়া, আপনার এই কঠোর অভিসন্ধি পিতা ও সহধর্ম্মিণীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। পুত্র-বৎসল মহারাজা শুদ্ধোদন পুত্রের এবম্বিধ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ মাত্র আকুল হইয়া বহুপ্রকার কাতরবাণী, প্রবোধ বাক্য ও প্রলোভন দ্বারা পুত্রের মন কিছুতেই পরিবর্ত্তন করিতে না পারিয়া শোকবিদগ্ধহৃদয়ে সাশ্রুনয়নে পুত্রকে অতিকষ্টে প্রব্রজ্যাগমনের অনুমতি দেন। পতিগতপ্রাণা স্বাধ্বী গোপাদেবী প্রেমপূর্ণ বচনে কত বুঝাইয়াছিলেন, অশ্রুধারায় বসনসিক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু সিদ্ধার্থ কোন প্রকারেই বিমুগ্ধ হন নাই। ইহার কয়েকদিন পূর্ব্বে গোপাদেবীর গর্ভে রাহুল নামক একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার রূপ মোহে আকৃষ্ট হইয়া সংকল্পচ্যুত হইবার ভয়ে সিদ্ধার্থ একদিন গভীর রজনীতে শয্যা পরিত্যাগে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পত্নীর প্রকোষ্ঠে যাইয়া দেখেন, গোপাদেবী দুগ্ধফেননিভ শয্যাতে শায়িত। পার্শ্বে নবকুমার রাহুল মাতৃক্রোড়ে নিদ্রিত। সিদ্ধার্থ ক্ষণিকমাত্র দৃষ্টি করিয়া সকলের অজ্ঞাতে পুরী হইতে অশ্বারোহণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি সেই রাত্রিতে কতিপয় জনপদ অতিক্রম করিয়া প্রভাতে শরীর হইতে সমস্ত অলঙ্কারাদি উন্মোচন করিয়া আপন বিশ্বস্ত ভৃত্য ছন্দকের হস্তে দিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন। সেই স্থানে একটী চৈত্য নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। অদ্যাপি তাহা ছন্দক নিবর্ত্তক নামে প্রসিদ্ধ।

ছন্দককে বিদায় দিয়া তিনি মস্তকের কেশরাশি ছিন্ন করতঃ একজন ব্যাধের জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র সহ আপন রাজবেশ পরিবর্ত্তন করতঃ, রাজগৃহে রুদ্রক নামক ঋষির শিষ্য হইয়া কিছুকাল ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া, গয়া প্রদেশে উরবিল্ব গ্রামে আসিয়া, স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া, নৈরঞ্জন নদীর তটে তপস্যার স্থান নির্ব্বাচন করিয়া, ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তিনি কখন ফল, কখন তিল, কখন একটী মাত্র তণ্ডুল এবং

বাতাহারী হইয়া, সুদীর্ঘ ছয় বৎসরকাল চিত্ত ও দেহকে সংযত করিয়া, শ্বাস প্রশ্বাস নিরোধক্রমে যোগাসনে আসীন ছিলেন। এখন তাঁহার লাবণ্যময় দেহ কঙ্কালে পরিণত হইল, সঙ্গে যে পঞ্চ শিষ্য ছিল তাহারাও চলিয়া গিয়াছে, এরূপভাবে অনাহারে দেহপাত করিলে অভিষ্টসিদ্ধ হইবে না বিবেচনায় কিছু আহারে প্রবৃত্ত হন। উরবিল্ব গ্রামের সেনাপতি নন্দিকের কন্যা সুজাতা আশ্রমে আসিয়া পায়সাদি দ্বারা তাঁহাকে তৃপ্ত করিতেন। এখন পান ভোজন দ্বারা বল সঞ্চার হইবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া একটী বট বৃক্ষের নিম্নে আসন রচনা করিয়া পুনরায় ধ্যানে নিমগ্ন হন। অচিরে তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত হইয়া জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রতিভাত হইল; তাঁহার সুখ, দুঃখ ও ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত নির্ব্বাণ হইল। তিনি যে মুহূর্ত্তে জগতের সুখ দুঃখ উৎপত্তির ও নিরোধের কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তিনি বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধদেব নাম ধারণ করিলেন। শাক্যবংশমধ্যে এইরূপ অনন্যসাধারণ জ্ঞান ও সিদ্ধি কেহই লাভ করেন নাই বলিয়া তাঁহায় অন্য নাম শাক্যসিংহ হইল। যে বটবৃক্ষমূলে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহা বোধিদ্রুম নামে জগতে বিখ্যাত। ইহার বিশাল শাখা প্রশাখাদি বহুবিস্তৃত হইয়া স্থানটীকে বড়ই মনোরম ও শান্তিপ্রদ করিয়াছে। ইহার উত্তরে হরিহরপুর, পশ্চিমে মাতৃপুর, দক্ষিণে রামপুর, পূর্ব্বদিকে নিরঞ্জন নদী দক্ষিণবাহিনী হইয়া মোড়া পাহাড়ের নিকট নদী মোহনায় মিলিত হইয়া ফল্গু নামে প্রবাহিত হইয়াছে। সম্মুখে একদিকে প্রশস্ত প্রান্তর; অপরদিকে তুঙ্গ প্রস্তরময় নীল পর্ব্বতরাজি যেন আকাশপটে চিত্রিত রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে নিবিড় বিশুদ্ধতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। সেই বটবৃক্ষ নরজগতে অমরত্ব শিক্ষা দিবার জন্য পঁচিশ শত বৎসর যাবৎ জীবিত রহিয়াছে। সম্রাট অশোকের পুত্র ও কন্যা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সময় এই বৃক্ষের একটী শাখা কর্ত্তন করিয়া পুতিয়াছিলেন। অনিরুদ্রপুরে অদ্যাপি সেই রোপিত বৃক্ষ বর্ত্তমান

আছে। সিংহলবাসিগণ অতি পবিত্র মনে করিয়া ঐ বৃক্ষ পূজা করিয়া থাকে। বোধিদ্রুমের চতুর্দ্দিকে প্রায় ১৬ হাত উচ্চ একটী প্রাচীর আছে। জানা যায়, রাজা পূর্ণব্রহ্ম সপ্তম শতাব্দিতে বোধিদ্রুম নষ্ট না হইবার জন্য এই প্রাচীর প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধদেব "অহিংসা পরম ধর্ম্ম, জীবে দয়া" এই মহাসত্য প্রচারের জন্য তাঁহার পূর্ব্ব পঞ্চ শিষ্যকে কাশীর উত্তরে মৃগদার সারনাথ নামক স্থানে নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। অচিরে বহুতর লোক শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। ধর্ম্মপ্রচারকালে "আত্মোৎকর্ষ সাধনই পরম উদ্দেশ্য, সৎসঙ্কল্প, সদ্‌বাক্য ব্যবহার, সদ্‌উপায়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ, জীবে দয়া, হিংসা দ্বেষ পরিহারপূর্ব্বক জাতি নির্ব্বিশেষে সকলকেই এক হইতে হইবে," এই সব সত্য প্রচার করিতে লাগিলেন। অল্প সময় মধ্যেই নূতন ধর্ম্ম কাশী হইতে মগধ, বিম্বিসার, কোশলরাজ্য, রাজগৃহ, পাটলীপুত্র, বৈশালিনগর প্রভৃতি দেশব্যাপী হইয়া পড়িল। মহারাজ শুদ্ধোদন, পুত্র বুদ্ধ হইয়াছেন শ্রবণে তাঁহাকে আনিবার জন্য কয়েকজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহারা বুদ্ধদেবের অমিত জ্ঞানোপদেশে মোহিত হইয়া নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। বুদ্ধদেব কপিলবস্তুতে পিতৃ দর্শনে যাইয়া রাজবাটীতে আর বাস করিলেন না, একটি পৃথক মঠ করিয়া তথায় কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন এবং বহু লোককে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এইরূপে ভারতে যে অধর্ম্মের স্রোত বহমান হইয়াছিল তাহা অচিরেই প্রশমিত হইয়া চতুর্দ্দিকে শান্তির আলোক দেখা দিল। রাজগৃহ, বৈশালি, কপিলবস্তু, অলকাপুর, রামগ্রাম, উল্বদ্বীপ, পারা ও কুশীনগরে স্থাপন করিয়া তদুপরি চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া দেন। একটি দন্ত সিংহলের কাণ্ডি নগরে আছে, তদুপরি মেঘবাহন রাজা কর্ত্তৃক ১২৬৮ খৃষ্টাব্দে যে অত্যাশ্চর্য্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। খ্রীষ্টের জন্মের ৫৩৪ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধদেব দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন।

বুদ্ধগয়ার পূর্ব্বাংশে বহুতর বুদ্ধস্তূপ আছে। সর্ব্বপ্রধান স্তূপটি প্রায় ১৫০০ বর্গফিট স্থান ব্যাপৃত। এখানে ভারতের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ মহাবোধি মন্দির অবস্থিত। এই স্তূপটী সমতল ভূমি হইতে প্রায় দশহাত উচ্চ। ইহাকে রাজস্থান কহে। চতুষ্পার্শে পরিখা ও প্রাচীর বেষ্টিত একটি দুর্গাকার। মহাবোধি মন্দির ব্যতীত নিরঞ্জন নদীর তটে আর একটি মঠ আছে। তাহাও চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত এবং চারিতল বিশিষ্ট। ইহার দক্ষিণে বারদুয়ারি নামক অট্টালিকা। উত্তর দিকে কতকগুলি গৃহ। পশ্চিমদিকস্থ স্তূপের চারিটি মন্দির সংযুক্ত প্রস্তর গ্রথিত একটি অট্টালিকা। একটি মন্দিরে জগন্নাথ মূর্ত্তি, দ্বিতীয়টিতে শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি, অপরটিতে শিব মূর্ত্তি। দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সাধুদিগের সমাধি স্থান। প্রত্যেক সমাধির উপরে স্তূপ বা লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত। মোহন্তের সমাধির উপরে সুন্দর সুদৃশ্য মন্দির। প্রধান মোহন্ত একজন মহা ঐশ্বর্য্যশালী, তাঁহার ভূসম্পত্তির আয় লক্ষ টাকা হইবে; অতিথিশালা আছে, সন্ন্যাসী ভোজন হইয়া থাকে। মোহন্ত চিরকৌমার্য্য ব্রতাবলম্বী। শিষ্যগণের মধ্য হইতে উপযুক্ত বিবেচনায় পরবর্ত্তী মোহন্ত নির্ব্বাচিত হয়। মালপোয়া, মোহনভোগ, ভাঙ্গ ইহাদের প্রধান খাদ্য। দর্শক ও যাত্রিগণ খুব সমাদর পাইয়া থাকে।

সম্রাট্ অশোকের রাজত্বসময়ে মহাবোধি মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল, ঐ মন্দির ভগ্ন হইয়া গেলে, ঐ পুরাতন মন্দির সংলগ্ন বর্ত্তমান মন্দির খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে অমর সিংহ নামক একজন শিষ্যের অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দির নবমতালা, উচ্চে ৬০ ফিট। ইহার নিম্ন ভাগ অবলং আকার উপরে চতুষ্কোণ। ইহার গাত্রে নানাবিধ প্রাচীন জীব জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। দেয়াল ১৪ ফিট পুরু। এই মন্দিরই ভারতের সর্ব্ব প্রধান প্রাচীন মন্দির। প্রাচীর বেষ্টিত মন্দির মধ্যে বুদ্ধ পুরোহিতগণ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন। তাহাদের পবিত্র

বেশ ভূষা দর্শনে ও উপদেশ ইত্যাদি শ্রবণে মনে ভক্তির উদয় হয়। কথিত আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের এখানে আসিয়াই ঈশ্বর ভাবের স্ফুরণ হইয়াছিল। বুদ্ধগয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিভূষিত, ইহার মনোমুগ্ধকর ভাব স্থির চিত্তে আলোচনা করিলে সংসার ভুলিয়া সেই সর্ব্বশক্তিমানের মহৎ নাম স্মরণে মনে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হয়। তপস্যার জন্য ইহা শ্রেষ্ঠাশ্রম।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য সময়ে ইহা জগতের প্রধান তীর্থ ছিল। নবম শতাব্দীতে হিন্দু প্রাধান্য স্থাপিত হইলে বৌদ্ধ মন্দির হইতে গয়াক্ষেত্রের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য হিন্দুগণ এই স্থানকে বোধিগয়া নাম করেন। তৎকালে সমস্ত প্রদেশ মগধরাজের অধীন ছিল। গয়ালিগণ গয়াধামের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গয়ার কীর্ত্তি সংরক্ষণে যত্নবান হইলেন। হিন্দুগণের প্রতিহিংসায় উরবিলা গ্রামের অশোক কীর্ত্তিগুলি কালগর্ভে বিলীন হইয়া অরণ্যানীতে পরিণত হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুকম্পায় ব্রহ্ম রাজের অর্থে যদি মন্দিরগুলি পুনঃ পুনঃ সংস্কার না হইত তাহা হইলে, এই সুমহান কীর্ত্তির কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না।

বুদ্ধদেব সিদ্ধিবাসনায় রাজবাটী পরিত্যাগের পর হইতে সাধ্বী সতী গোপাদেবী ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে পতিপদধ্যানেই দিন কাটাইতেন। স্বামী দেশে আসিয়াছেন শুনিয়া পরিচারিকা সহ মঠে স্বামী সন্দর্শনে গমন করেন। গোপাদেবী স্বামীর মুণ্ডিত মস্তক ও গৈরিক বসন দৃষ্টে শোকাকুল হইয়া স্বয়ং কিছুই বলিতে পারিলেন না। সহচরী প্রমুখাৎ বুদ্ধদেব পত্নীর দুঃখ-কাহিনী শ্রবণে ধর্ম্মের অমৃতময় বচন পরম্পরায় গোপাদেবীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি প্রদান করেন। গোপাদেবী পুত্র রাহুলকে সহ বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষিত হন। রাজ্ঞী মহাপ্রজাবতী অন্তঃপুরে অনেক রমণী সহ নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ভগবান বুদ্ধদেব স্ত্রীলোকদিগকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ভিক্ষুণী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেন এবং বৎসরের মধ্যে আট মাস দেশে দেশে

পর্য্যটন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, বর্ষার কয়েকমাস মঠে থাকিয়া শিষ্যদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিতেন। অল্পকাল মধ্যে নবধর্ম্ম দিগ্ দিগন্তে ব্যাপিয়া পড়িল। তিনি ৮৫ বৎসর বয়সে কুশীনগরে পরিনির্ব্বাণ অর্থাৎ দেহত্যাগ করেন। কুশী নগরের মল্লগণ ও তাঁহার শিষ্যগণ সেই বিশাল দেহ অগ্নি সংযোগে দাহ করিয়া চিতাভস্ম দন্ত অস্থি সমূহ অষ্টভাগে বিভক্ত করিয়া সুবর্ণ পাত্রে রক্ষা করিয়াছিলেন।

তারকেশ্বর।

মহাদেব মহাত্মানং মহাযোগিনমীশ্বরম্।
মহাপাপহরং দেবং মকারায় নমোনমঃ॥

বঙ্গদেশে তারকেশ্বর মহাদেব প্রসিদ্ধ। হাবড়া হইতে ৩৬ মাইল ব্যবধান, ভাড়া ॥৬ আনা মাত্র। ইহা উপপীঠ, এখানে অনাদি শিবলিঙ্গ, ইহার অপর নাম আশুতোষ। মন্দির মধ্যে একটী গহ্বরে লিঙ্গমূর্ত্তি তারকেশ্বর সংস্থিত। লিঙ্গের উপরে রূপার একটী আচ্ছাদন আছে, পূজারি ব্রাহ্মণকে কিছু অতিরিক্ত দক্ষিণা দিলে, আবরণ উন্মোচন করিয়া দেব দর্শন ও স্পর্শ করা যায়। পূজার কোন বান্ধা নিয়ম নাই, যাত্রিগণ ইচ্ছামতে পত্র, পুষ্প, ফল, দুগ্ধাদি দিয়া পূজা করিতে পারেন, যাহার ইচ্ছা হয় তিনি ষোড়শোপচারেও পূজা করিতে পারেন। রোগ শান্তি কামনায় এখানে 'সমধিক যাত্রী হয়, যাঁহারা মানস চুল আদায় করেন তাঁহাদিগকে রীতিমতে ফিস দিতে হয়। মন্দির সম্মুখে নাটমন্দির, বারান্দায় নানাবিধ রোগক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মহাদেবের নামে ধন্না দিয়া থাকেন। রবি ও সোমবারে অধিক ভিড় হয়; চৈত্রমাসে ও শিবরাত্রির সময়ে মেলা হয়।

পুরাকালে এই স্থানকে সিংহল দ্বীপ বলিত। মহাদেব জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। মুকুন্দ ঘোষের একটী গাভী প্রতিদিন শিলারূপী মহাদেবের উপর ক্ষীরধারা বর্ষণ করিত, গাভীর দুগ্ধ হ্রাস হওয়ায় ঘোষজা অনুসন্ধানে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। সেই দিনই স্বপ্নে মহাদেব মুকুন্দকে দর্শন দিয়া, সন্ন্যাসী হইয়া পূজা করিবার আদেশ করিলে, মুকুন্দ পূজা আরম্ভ করেন এবং বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজের আনুকূল্যে মন্দিরাদি প্রস্তত

হয়। মুকুন্দের সমাধি মন্দির পার্শ্বেই অবস্থিত। বর্ত্তমান সময়ে তারকেশ্বরের অতুল সম্পত্তির অধিকারী মোহন্ত মহারাজ। ইনি গবর্ণমেণ্টের উচ্চ উপাধি ভূষিত। শিবগঙ্গার পাড়ে মহারাজের রাজ ভবন অবস্থিত। প্রাঙ্গণে মহারাজ মোহন্তের বসিবার গদীসংযুক্ত এক ঘর আছে।

ভুবনেশ্বর বা একাম্রকানন।

"সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্
লিঙ্গকোটীসমাযুক্তং বারাণসী সমপ্রভম্।
একাম্রকেতি বিখ্যাতং তীর্থাষ্টকসমন্বিতম্॥"

পুরীর উত্তর পশ্চিমে ৩৮ মাইল ব্যবধানে ভুবনেশ্বর তীর্থ। ইহা পুরী জিলাস্থ একটি শ্রেষ্ঠ শৈব ক্ষেত্র। শাস্ত্রে যে একাম্রবনের অশেষ গুণ বিবৃত আছে, যেখানে ভগবান শঙ্কর সর্ব্বদা দেবীসহ বিরাজমান, ইহাই সেই একাম্রকানন। বেঙ্গল নাগপুর রেলে ভুবনেশ্বর নামক ষ্টেসন হইতে দুই মাইল ব্যবধান। পদব্রজে কিম্বা অসক্তগণ গোযানে যাইতে পারেন। পুরী হইতে দুই স্থানের ভাড়া ॥০ আনা মাত্র। কলিকাতা হইতে ৩।/৬ আনা ভাড়া। ভুবনেশ্বর প্রকৃতই ভুবনমধ্যে একটি দেখিবার স্থান। এখানে অসংখ্য শিবমন্দির, পুরাতন হিন্দু শিল্পীর অপূর্ব্ব রচনা কৌশল, নয়নতৃপ্তিকর মনোমুগ্ধকর স্থপতি চাতুর্য্য যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। অতি প্রাচীন নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত একটি পুরী। অষ্টম শতাব্দীতে উৎকলরাজ কমল কেশরীর রাজত্ব সময়ে এই অপূর্ব্ব শিল্প নৈপুণ্য ভাস্কর কার্য্য সমন্বিত মন্দিরটী লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল; কেশরী বংশের অনঙ্গ ভীমদেবকে মন্দির নির্ম্মাতা বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন। এই মন্দিরের জন্যই ভুবনেশ্বর, কেবল ভারতবর্ষে নহে, সমস্ত পৃথিবীতে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদ্গণ কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রতি প্রস্তরখণ্ড ও প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত নানাবিধ মূর্ত্তি এতাধিক কারুকার্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্য বিশিষ্ট

যে, তদ্দর্শনাভিলাষী সুদূরবর্ত্তী দেশসকল হইতে সমাগত পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ শতমুখে ইহার শিল্প নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রসংশা করিয়াছেন। এইজন্যই আজ ভুবনেশ্বর জগৎ বিখ্যাত।

ভুবনেশ্বরে প্রথম তীর্থ বিন্দু সরোবর। ইহা একটি প্রকাণ্ড সরোবর, চতুর্দ্দিকে প্রস্তরবাঁধা ঘাট, মধ্যে একটি কৃত্রিম দ্বীপ আছে, তদুপরি মন্দির। স্নানযাত্রার সময় এখানে বিষ্ণু মূর্ত্তির অধিষ্ঠান হয়, মন্দির পার্শ্বস্থিত ফোয়ারা পথে জল উঠিয়া বিগ্রহের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই সরোবরে স্নান তর্পণ করিতে হয়। ইহার জল অপরিষ্কার। ব্রহ্ম পুরাণে উল্লেখ আছে, বিন্দুসাগর সকল তীর্থের জলবিন্দু দ্বারায় পূর্ণ হইয়াছিল, স্নানে সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল হয়। পুষ্করের ন্যায় এই সরোবরেও কুম্ভীর আছে কিন্তু ইহারা নরখাদক নহে। বিন্দুসাগরের দক্ষিণেই লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরের প্রকাণ্ড বাড়ী। ইহার আকার চতুষ্কোণ, চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর, পূর্ব্বদিকে প্রশস্ত সিংহদ্বার, উপরে নহবতখানা। শত্রু হইতে পুরী রক্ষা করিবার জন্যই যেন এরূপ দুর্ভেদ্য আকারে প্রস্তর দ্বারায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। সিংহদ্বার পার হইলেই ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ, চারিদিকে ঘর মধ্যে মহামন্দির। ইহা আকারে ছোট হইলেও জগন্নাথদেবের মন্দিরের ন্যায় গঠন। প্রথম ভোগের মন্দির, তৎপর নাটমন্দির ও মোহনমন্দির, শেষ প্রধান মন্দির। নাট মন্দির নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত চিত্রসমন্বিত স্তম্ভোপরি স্থাপিত, দেওয়াল, স্তম্ভ ও অশেষ শিল্প চাতুর্য্যসম্পন্ন সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি, প্রাচীন স্থপতি কার্য্যের উৎকর্ষতা সপ্রমাণ করিতেছে। ইহার সংলগ্নই লিঙ্গরাজের মন্দির, প্রাচীন আকারে গঠিত, নাটমন্দির হইতে ২।৩ ফুট নিম্ন, একটি মাত্র দ্বার, চির অন্ধকারে আবৃত, প্রদীপের সাহায্য ভিন্ন ভিতরে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। মন্দির মধ্যে একটি বিস্তৃত গোলাকার বেদীর ন্যায় লিঙ্গরাজ মহাদেব বিরাজমান; হরি হর একত্রে অবস্থিত। বেদীর উপরেই আমরা অর্চ্চনা করিয়া লিঙ্গ

প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বাহিরে আসিলাম। এখানে চারিবার ভোগ হয়, আমরা মধ্যাহ্ন ভোগের প্রসাদ পাইলাম, প্রসাদ বিক্রী হইয়া থাকে, কোন স্পর্শ দোষ নাই। পূজা কি দান দক্ষিণার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, যাত্রিগণ ইচ্ছানুসারে যাহা দেয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট; অন্যান্য বিগ্রহদেবের প্রত্যেক মন্দিরেই একটি পয়সা দিতে হয়। পাণ্ডা বিদায় এক টাকা। প্রধান মন্দিরের চূড়ায় যে সকল মূর্ত্তি প্রস্তর কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাতে প্রাচীন ভারতের নানাবিধ সামাজিক রীতি নীতি ও শৌর্য্যবীর্য্যের প্রাচীন কাহিনীর নিদর্শন আছে। মন্দিরের চূড়া প্রায় শত হস্ত উচ্চ, এবং ভুবনেশ্বরের বাড়ী দৈর্ঘ্যে তিন শত হস্ত হইবে। ভুবনেশ্বরের অপর নাম ত্রিভুবনেশ্বর বা কৃত্তিবাস।

বিন্দুসাগরের দক্ষিণেই অনন্ত বাসুদেবের মন্দির। মন্দির মধ্যস্থিত বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিই, অনন্ত ও বাসুদেব নামে আখ্যাত। পাণ্ডারা ইহাকে আদি-মূর্ত্তি বলিয়া থাকেন। মহা মন্দিরের পূর্ব্বদিকে সহস্র লিঙ্গ সর নামে চারি পার বাঁধা একটী পুষ্করিণী আছে, তাহার তীরে ছোট ছোট বহু মন্দির আছে, পূর্ব্বে মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল। ভুবনেশ্বরে বহু শিবমন্দির ছিল, পুরাণে লক্ষ মন্দিরের উল্লেখ আছে; হাণ্টার সাহেব সাত হাজার পর্য্যন্ত গণনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে তীর্থেশ্বর, কোটি-তীর্থেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, মুক্তেশ্বর, কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, মেঘেশ্বর, অলাবুকেশ্বর, উত্তরেশ্বর, সোমেশ্বর, কপিলেশ্বর, প্রভৃতি প্রধান। এই সমস্তই অপূর্ব্ব ভাস্করকার্য্যখচিত পুরাকালের নানা প্রকার চিত্রাদি সমন্বিত প্রস্তর নির্ম্মিত। রাজারাণী দেউল ও সারি দেউল নামে যে দুইটী মন্দির আছে, তাহার প্রাচীর গাত্রে ক্ষোদিত নরনারীমূর্ত্তির শিল্পনৈপুণ্য দৃষ্টে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ভুবনেশ্বর এখন অরণ্যানি পরিপূর্ণ। বন মধ্যে সুমিষ্ট পানীয় জলের এক কুণ্ড আছে, পাণ্ডারা ইহাকে অমৃত কুণ্ড বলেন, আর একটী কুণ্ডের জল দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র বর্ণ বিশিষ্ট। ভুবনেশ্বর যে এক দিন

ভারত মধ্যে প্রধান দর্শনীয় স্থান ছিল তাহার আর সংশয় নাই। প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্ পণ্ডিতগণ মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বৌদ্ধ রাজন্যবৃন্দের সময় এই সকল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে মন্দিরে হিন্দুদেব দেবী স্থাপিত হইলে জগন্নাথ ও ভুবনেশ্বরে পূর্ব্বের ন্যায় জাতিনির্ব্বিশেষে প্রসাদ ভক্ষণের নিয়ম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কেহ বলেন শিবভক্তকলিঙ্গ রাজের রাজধানী এখানে ছিল। মহাভারতে ও পুরাণাদিতে একাম্রবনের বিশেষ উল্লেখ আছে।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি

ভুবনেশ্বর হইতে উত্তর পশ্চিম দিকে ৪।৫ মাইল ব্যবধানে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামক দুইটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। উভয় পর্ব্বতের মধ্য দিয়া একটি অল্প পরিসর পথ আছে; গোযানে কিম্বা পদব্রজে যাওয়া যায়। এই পর্ব্বত শিখরে বৌদ্ধযুগের অনেক কীর্ত্তি কলাপ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণের জন্য সোপানাবলী রহিয়াছে, কিন্তু অনেক স্থানেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। খণ্ডগিরির উপরে চারিটি গুম্ফা আছে, একটি ভগ্নাবস্থা, অপর তিনটিতে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান। দশভুজা ও সর্ব্বমঙ্গলা মূর্ত্তিদ্বয়ই শ্রেষ্ঠ দেখা যায়, এতদ্‌ভিন্ন বৌদ্ধ দেবের মূর্ত্তিও আছে। গুম্ফাগুলি বৌদ্ধযুগে বহু অর্থব্যয় ও বুদ্ধিসংযোগে পাহাড় কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে সময় সমস্ত ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের একাধিপত্য হইয়াছিল সেই সময়, বৌদ্ধ সম্রাটগণ কর্ত্তৃক এস্থানে ও অন্যান্য পর্ব্বতে অসংখ্য গুম্ফা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও যতিগণ প্রব্রজ্যাগ্রহণান্তর এ সমস্ত গুম্‌ফাতে বাস করিয়া নীরবে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। ইহা হিন্দুর তীর্থ নহে কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অন্তর্ধানে হিন্দু এসমস্ত অধিকার করিয়া হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন এমত অনেকেই অনুমান করেন। গুম্‌ফাগুলি দ্বিতল, ত্রিতল, প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ, বারান্দা, নানাবিধ কারুকার্য্যসমন্বিত স্তম্ভ বিশিষ্ট; কত নর নারী, জীব জন্তু, সীতাহরণ, রণদৃশ্য, শিকারদৃশ্য প্রভৃতি নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত। ইহাদের শিল্প চাতুর্য্য দৃষ্টে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। উদয়গিরিতে গুম্‌ফার সংখ্যা অধিক, তন্মধ্যে রাণী গুম্‌ফা, হস্তিগুম্‌ফা, ব্যাঘ্রগুম্‌ফা, সর্পগুম্‌ফা, জয়াবিজয়াগুম্‌ফা, বৈকুণ্ঠপুরী

গুম্ফা প্রভৃতি প্রধান। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের এরূপ অদ্ভুত কীর্ত্তি-সকল দৃষ্টি করিবার জন্য সুদূরবর্ত্তী দেশ হইতে লোকসকল আসিয়া থাকে। একদিন যাহা বৌদ্ধযতিগণের লীলাক্ষেত্র ছিল, এখন তাহাই ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল হইয়াছে।

বৈতরণী তীর্থ

বেঙ্গল নাগপুর রেলে পুরীর পথে বৈতরণী রোড নামক এক ষ্টেসন আছে; তথা হইতে পদব্রজে কিম্বা গোশকটে বৈতরণী যাইতে হয়। ইহা শাস্ত্রমতে যমদ্বারের তপ্তনদী, বৈতরণীতে গো দান করিলে মরণান্তে স্বর্গে গমন পথ সহজ হয়, এই জন্যই বোধ করি শ্রাদ্ধের দিন তিল বৈতরণী দানের বিধান আছে। এই নদীতটে জাজপুর নামক প্রসিদ্ধ নগর। এখানে বেদ উদ্ধারের জন্য বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি হইয়াছিলেন এরূপ প্রবাদ; বরাহদেবের মূর্ত্তি ও কুণ্ড আছে। ব্রহ্মা এই স্থানে অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন বিধায় ইহা অতি পবিত্র। গয়াসুরের নাভি এই জাজপুরে পড়িয়াছিল। গয়াসুরের উপাখ্যানের রূপক অংশ পরিত্যাগ করিলে বোধ হয় তাহার মস্তক গয়াতে, নাভী জাজপুরে ও পদ চন্দ্রনাথে পতিত হইয়াছিল, কেননা দেবচক্রান্তে গয়াসুর বধ হইয়াছিল। এখানে পাণ্ডার অত্যাচার অধিক। ইহারা নানা ছলে যাত্রী হইতে অন্যূন সাত টাকা আদায় করে। এখানে গোদান ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি করিতে হয়।

সাক্ষীগোপাল।

খুরদা জংসন হইতে পুরীর পথে সাক্ষীগোপাল তীর্থ। পুরী দর্শন করিয়া তাহার সত্যতার সাক্ষী করিবার জন্যই, পুরীর প্রত্যাগত যাত্রী এখানে আসে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিলে মুক্তি নিশ্চয়, যম পুরীতে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারসময়ে ইনি সাক্ষী দিবেন এই বিশ্বাসে যাত্রীসকল আগমন করে। গুপ্ত বৃন্দাবন নামক সুরম্য উদ্যান মধ্যে সাক্ষীগোপালের মন্দির। দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের বালমূর্ত্তি। পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি বৃন্দাবনে ছিল। এক যুবকের নিকট বৃদ্ধ এক ব্রাহ্মণ মৃত্যুর পূর্ব্বে অশেষ যত্ন পাইয়া কৃতজ্ঞতার পুরস্কার স্বরূপ সাক্ষীগোপালকে সাক্ষী করিয়া আপন কন্যা দানের প্রতিজ্ঞা করেন; বৃদ্ধের আত্মীয়বর্গ উহা বিশ্বাস না করায় স্বয়ং সাক্ষীগোপাল বৃন্দাবন হইতে আসিয়া সাক্ষী দিয়া বিবাহ সংঘটন করেন এবং এখানে থাকিয়া যান। উৎকলরাজ কর্ত্তৃক মন্দিরাদি নির্ম্মিত হয়। এখানে পক্কান্ন ভোগ হয় না। লাজচূর্ণের পিষ্টক ও ফল ভোগ হইয়া থাকে।

ভাগীরথী ও গঙ্গাসাগর।

কৃতে তু পুষ্করং তীর্থং ত্রেতায়াং নৈমিষং তথা।
দ্বাপরেতু কুরুক্ষেত্রং কলৌ গঙ্গাং সমাশ্রয়েৎ॥

পুরাণে বর্ণিত আছে, দেবর্ষি নারদের সঙ্গীতে রাগরাগিণীগণ বিকলাঙ্গ হইলে, মহাদেব নারদের স্তবে তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু সন্নিধানে যখন সঙ্গীত করিয়াছিলেন, বিকৃতাঙ্গ রাগরাগিণীসকলের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন তাল, মান, লয়সংযুক্ত সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে ভাবে দ্রবীভূত হইয়া গেলেন; ব্রহ্মা সেই দ্রবীভূত বিষ্ণুকে কমণ্ডলুতে ধারণ করিলেন। বিষ্ণুর এই বিভূতিই গঙ্গা নামে বিখ্যাত। সগর রাজার ষষ্টিসহস্র পুত্র কপিল মুনির শাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, মহারাজ ভগীরথ গঙ্গা আনিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য গোকর্ণ তীর্থে বহু বৎসর ব্রহ্মার তপস্যা করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মার প্রীতি সম্পাদনে গঙ্গাদেবীকে ভূতলে আনয়ন করেন। ব্রহ্মকমণ্ডলুহইতে পতন কালে গঙ্গাদেবীকে মহাদেব মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, তৎপর ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া বিন্দু সরোবরে রাখিয়া দেন। বিন্দু সরোবর হইতে গঙ্গা সপ্ত ধারায় পতিত হন; যে ধারা মহারাজ ভগীরথের রথচক্রখাতপ্রবাহিনী হইয়াছিল, তাহাকেই ভাগীরথী কহে। হিমালয়ের গোমুখী নামক স্থান হইয়া গঙ্গা হরিদ্বারেই ভারতে প্রবেশ করেন। গঙ্গার স্রোতবেগ জহ্নু মুনির যজ্ঞস্থলের কুশাদি যজ্ঞীয় উপকরণ ভাসাইয়া নিলে, মুনিবর ক্রোধবশে যোগবলে সমস্ত গঙ্গাজল পান করিয়া ফেলেন; এবং ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া উরু ভেদ করিয়া গঙ্গাকে নির্গত করিয়া দেন। গঙ্গা তদবধি জহ্নু মুনির কন্যা জাহ্নবী নামে খ্যাত। হরিদ্বারে কুশাবর্ত্ত ঘাট সম্বন্ধে এই প্রবাদ শুনা যায়। হরিদ্বারে

ফল্গু নদী

গঙ্গা শ্বেতরূপী। হরিদ্বার হইতে ক্রমে দক্ষিণপূর্ব্ববাহিনী হইয়া প্রয়াগে মানব শরীরস্থ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষম্না নাড়ীর ন্যায় যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গে একত্র সম্মলিতি হইয়াছেন, ইহাকেই ত্রিবেণী কহে। তৎপর আর্য্যাবর্ত্তকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া নানা নদনদীসহ সমতট প্রদেশে বর্ত্তমান সুন্দরবনে শতমুখী হইয়া সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন।

যে স্থানে গঙ্গা দেবী সাগর সঙ্গে যুক্ত হইয়াছেন, তাহাকেই গঙ্গাসাগর কহে। পুরাকালে এখানে মুনিবর কপিলের আশ্রম ছিল; ভাগীরথীর সংস্পর্শে মুনিশাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত সগর বংশ মুক্তিলাভ করিলেন, তদবধি ইহা পুণ্যক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে এখানে তিন দিন স্থায়ী বৃহৎ মেলা হয়, সহস্র সহস্র লোক আগমন করিয়া থাকে, যে বৎসর শুদ্ধ কাল ও শুভযোগ থাকে সেইবার লক্ষ লোক পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। কলিকাতা আরমানী ঘাট হইতে খালের পথে ষ্টিমারে বার ঘণ্টায় ও সমুদ্রগামী জাহাজে ছয় ঘণ্টায় যাওয়া যায়, ভাড়া যাতায়াতে তৃতীয় শ্রেণী তিন টাকা ও দ্বিতীয় শ্রেণী পাঁচ টাকা, প্রথম শ্রেণীর স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। চব্বিশ পরগণা জিলার সদরের অন্তর্গত ইহা একটী অরণ্যভূমি। মেলার পূর্ব্বে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয় বটে কিন্তু চতুর্দ্দিকে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ভয়। এখানে কপিল মুনির মূর্ত্তি আছে, মেলার দিন গঙ্গাসাগরে স্নান, তর্পণ, পার্ব্বণ ও দানাদি ক্রিয়া যাত্রিগণ ইচ্ছামতে করিয়া থাকেন। চরে চালা প্রস্তুত হয়, কলিকাতা হইতে সমস্ত দ্রব্য সরবরাহ হইয়া থাকে। হরিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগরে স্নান অতি দুর্লভ ও মহাপুণ্য কার্য্য।

আর্য্যশাস্ত্রসকল সমস্বরে বলিয়াছেন, যিনি ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গা দর্শন ও স্নান করিবেন কিম্বা দূরবর্ত্তী দেশে থাকিয়াও গঙ্গার নামোচ্চারণ করিবেন তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। ইহা ধ্রুব সত্য! পাপসকল ত্রিবিধ। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক। ইহা আবার দশভাগে কর্ম্মে বিভক্ত হইয়াছে; যথা—পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্যহরণ, পরপীড়ন এই তিনটী কায়িক

পাপ; পরদ্রব্যহরণেচ্ছা, পরপীড়ন কিম্বা পরহিংসা করণেচ্ছা এবং পরস্ত্রী-গমনেচ্ছা এই তিনটী মানসিক পাপ; মিথ্যা কথন, কটুবাক্য প্রয়োগ, পর-নিন্দা ও অসম্বন্ধ প্রলাপবাক্য কথন এই চারিটী বাচনিক পাপ। এই ত্রিবিধ পাপ হইতে দূরে থাকিতে পারিলেই মানব পাপমুক্ত হয়। এই সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবার প্রধান উপায়ই সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা ও পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত থাকা। জগদীশ্বরের কোন রূপ নাই; তিনি চর্ম্মচক্ষের গোচরীভূত কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কোন সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ নহেন। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগৎ সমস্তই সেই সত্য স্বরূপের বিভূতি মাত্র। সেই অব্যয় পরম ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সত্যস্বরূপে বিরাজমান; এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সেই সৎ ভিন্ন আর কিছুই নাই ও ছিল না। জ্ঞানী ও যোগিগণ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহারই সত্তা দেখিতে পান। যে মহাত্মা সেই পরমাত্মার সত্তা এক বার উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিই ধন্য। তিনি জীবন্মুক্ত! তাঁহার মানব জন্মই সার্থক হইয়াছে! পরমাত্মার সত্তা একবার উপলব্ধি করিতে পারিলে, অগ্নিসংযুক্ততূলারাশির ন্যায় সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে ইহা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণমুখনিঃসৃত ভগবদ্‌বাক্য। গঙ্গা জগদীশ্বরের বিভূতি, তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছেন, তাই শাস্ত্রকারগণ বিষ্ণুপাদসম্ভূতা বলিয়াছেন। তীর্থই বল, দেববিগ্রহই বল, সমস্তেরই নিবর্ত্তন পরিবর্ত্তন হইতেছে; কিন্তু এই নির্ম্মলসলিলা পুণ্যতোয়া অনাদি কাল হইতে একীভাবে বহ-মান। নিবিষ্টমনে ইঁহার বিষয় চিন্তা করিলে সেই বিশ্বকর্ম্মা জগৎ নির্ম্মাতার কথাই স্মরণ হয়, কায়মনোবাক্যে গঙ্গারূপী নারায়ণের নাম করিলে, ভগবানকেই স্মরণ করা হয়। একাগ্রমনে ভগবানের নাম করিলে সমস্ত পাপই বিদূরিত হইবে ইহা ঋষিবাক্য। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, "মানব এত পাপ করিতে পারে না, যাহা একবার মাত্র রাম নাম করিলে দূর না হয়"। সুতরাং একান্ত ভক্তি ও বিশ্বাসে "গঙ্গা গঙ্গেতি" বচন দ্বারা সর্ব্ব পাপক্ষয়ের আর সংশয় থাকিতে পারে না। গঙ্গার ন্যায় এরূপ নির্ম্মল

জল পৃথিবীর কুত্রাপি নাই। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন গঙ্গাজলে ও বালিতে এরূপ পদার্থ নিহিত আছে, যদ্দ্বারা নানাবিধ রোগ নিরাকৃত হয়। গঙ্গাজলপানে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়, স্নানে শরীরে কান্তি হয়, বালি দ্বারা শরীর মর্দ্দন করিলে খোস্ পাঁচড়াদি চর্ম্মরোগ দূর হয়।

লৌহিত্য সাগর

"পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাদয়ঃ।
সর্ব্বে লৌহিত্যমাযান্তি চৈত্রে মাসি সীতাষ্টমীম্॥"

লৌহিত্য সাগরের অপর নাম ব্রহ্মপুত্র নদ। পুরাকালে ইহার মোহনাই বঙ্গ উপসাগর সহিত যুক্ত ছিল, সেইজন্য ইহাকে সাগর বলিত। মহাভারতের মহাপ্রস্থান পর্ব্বে পাণ্ডববীর অর্জ্জুন লৌহিত্য সাগরে আপন অস্ত্রাদি বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন এরূপ লিখিত আছে। পুরাণে বর্ণিত আছে, পরশুরাম ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া মাতৃহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, পরশু আঘাতে হিমালয়শৃঙ্গ ভেদ করিয়া ব্রহ্মকুণ্ড হইতে লৌহিত্যকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহা তীর্থরাজ নামে খ্যাত। ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয়পর্ব্বতমধ্যস্থ ব্রহ্মকুণ্ড হইতে নির্গত হইয়া, মানস সরোবর উদ্ভূত সেংপু নদীর সহিত মিলিত হইয়া আসাম প্রদেশ অতিক্রম করিয়া রংপুরের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ময়মনসিংহ জিলায় প্রবেশ করিয়া দক্ষিণাভিমুখ টোকের পার্শ্ব দিয়া আড়ালিয়া খাতে লাঙ্গলবন্ধের নিকট ধলেশ্বরী নদী সহ মিলিত হইয়াছে। টোকচাঁদপুরের নিকট ইহার এক প্রবল স্রোত বহির্গত হইয়া লক্ষ্যা নামে ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হওয়ায় পূর্ব্ব স্রোত মঠখলার নিকট বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তন্ত্রাদিতে কামরূপ দেশের যে সীমানার উল্লেখ আছে তাহাতে ব্রহ্মপুত্রের পরিসর শত যোজন বলিয়া কথিত। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জিলার অধিকাংশ স্থান ব্রহ্মপুত্র কিম্বা বঙ্গ উপসাগরের কুক্ষিগত ছিল। এক সময়ে রংপুরের দক্ষিণেই বঙ্গোপসাগরের মোহনা ছিল; মহাভারতে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণে পাণ্ডবগণের মণিপুর,

ত্রিপুরা, হেরম্ব প্রভৃতি রাজ্যে আগমনের কথা উল্লেখ আছে এবং তাঁহারা যে পর্ব্বতসঙ্কুল উচ্চভূমিপথে গমনাগমন করিতেন তাহারও আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে যে, মহাভারতীয় যুগে পূর্ব্বোক্ত স্থানগুলি বঙ্গোপসাগরের জলে নিমজ্জিত ছিল। ব্রহ্মপুত্রের প্রবল স্রোতরাশি পর্ব্বত হইতে অবিরত বালিকণা বহিয়া আপন দেহ শীর্ণ করতঃ কত শত গ্রাম, পরগণা ও নগরের সৃষ্টি করিয়াছে।

হিন্দুরাজত্বের শেষ সময়ে সোনারগাঁও বা সুবর্ণগ্রাম অতি সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ হইতে আসিয়া সুবর্ণগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্ত্তীকালে সেনবংশীয় রাজগণ রামপালে রাজধানী করিয়াছিলেন। তদানীন্তন ঐতিহাসিক মিন-হাজউদ্দীন লিখিয়াছেন ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও ব্রহ্মপুত্র গঙ্গার ত্রিগুণ পরিসর ছিল। আইন-ই-আকরবীতে প্রকাশ সেরপুরের নিকট ঐ নদ দশ মাইল পরিসর ছিল, নদী পার করিতে পাটনী মজুরীস্বরূপ দশ কাহন কার্যাপণ গ্রহণ করিত বলিয়া 'দশকাহনীয়া সেরপুর' অদ্যাপি কথিত হইয়া থাকে, ময়মনসিংহ সহর হইতে রোকাইনগর পর্য্যন্ত দ্বাদশ মাইল পরিসর ছিল, সহর নির্ম্মাণ সময় ব্রহ্মপুত্র শম্ভুগঞ্জ পর্য্যন্ত চারি মাইল প্রশস্ত ছিল। কালের কি বিচিত্র গতি! সেই শত যোজন বিস্তৃত নদ এখন মঠখলাতে একেবারে বন্ধ।

চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র স্নানের মেলা স্থানে স্থানে হইয়া থাকে; তন্মধ্যে ময়মনসিংহ জিলার দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর, বেগুণবাড়ী, নসিরাবাদ, লাটীয়ামারী, হুসেনপুর ও মঠখলা প্রধান। ঢাকা জিলার লাঙ্গল বন্ধ নামক স্থানে যেরূপ বৃহৎ মেলা হয় সেরূপ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। পুরাকালে লাঙ্গল দ্বারা ভূমি চাষ করিয়া এখানে যজ্ঞ হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে লাঙ্গলবন্ধ কহে। ইহা বৈদ্যের বাজার নামক জাহাজ ষ্টেসনের ৪।৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, এখানে একমাস কাল স্থায়ী মেলা হয়।

সুদূরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে ব্রহ্মপুত্র বাস ও স্নানকারিগণ পূর্ব্ব হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। সহস্র সহস্র লোক সমবেত হয়; বুধাষ্টমী হইলে লক্ষ লোকের সমাগম হয়। স্নানের দিনের সে দৃশ্য চমৎকার। অশোকাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র স্নানে সকল তীর্থ স্নানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এমত শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

আদিনাথ

"বারাণসী চ মৈনাক একাম্রবন এব চ।
কৈলাসো রজতাদ্রিচ স্বর্ণাদ্রিশৃঙ্গপঞ্চক।
এতেষু শঙ্করো নিত্যং বসেদ্দেবীসমন্বিতঃ॥"

আদিনাথ একটী উপপীঠ, ইহা মৈনাক নামক গিরিশৃঙ্গোপরি সংস্থিত। মৈনাক অতি প্রাচীন নাম, মহাভারতেও ইহার উল্লেখ আছে। চট্টগ্রাম সহরের দক্ষিণ পশ্চিমে সমুদ্রগর্ভে মহেশখালী নদীর মোহনায় যে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তন্মধ্যে মৈনাক পর্ব্বত অবস্থিত। আদিনাথ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ না হইলেও সর্ব্বশুভলক্ষণাক্রান্ত বাণলিঙ্গ; সন্ন্যাসীমহলে ইঁহার বড়ই প্রশংসা। এখানে সাধারণ যাত্রীর সংখ্যা কম কিন্তু সাধু, সন্ন্যাসী, অবধূত প্রভৃতির সংখ্যাই সমধিক। ইহা চন্দ্রনাথ তীর্থের মোহন্তের কর্ত্তৃত্বাধীন। আদিনাথ দর্শনাভিলাষিগণ চাঁদপুর ষ্টেসন হইতে চট্টগ্রাম গমন করিবেন। কলিকাতা হইতে চট্টগ্রাম ৩৪২ মাইল ব্যবধান, ভাড়া ৪৸৴৩ আনা; চট্টগ্রাম হইতে ষ্টিমার ভাড়া এক টাকা। কুতুবদিয়া নামক প্রসিদ্ধ লাইট্ হাউসের নিকট দিয়াই যাইতে হয়, গভীর অন্ধকার রজনীতে দূর হইতে বাতিটী উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

আদিনাথ প্রকৃতির লীলা নিকেতন। চতুর্দ্দিকে অনন্ত নীলবারিধি আকাশের সঙ্গে মিলিয়া যেন এক হইয়া রহিয়াছে; বঙ্গ উপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালাসকল অবিরত মৈনাকশৈলে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ফাটিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে; সমুদ্রের সুগভীর গর্জ্জন শব্দ; গিরিশৃঙ্গবর্ত্তী অসংখ্য পাদপসমারূঢ় নানাবিধ বিহঙ্গমগণের সুমধুর কাকলীধ্বনি; উদীয়মান ও অস্তগামী সূর্য্যের সেই অব্যক্ত সুমহান অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য ইত্যাদিতে

মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়। এই জন্যই চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত লিখক আদিনাথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ভারতের প্রান্তে যে একটী গোলাকৃতি বিন্দুবৎ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহারই নাম মহেশখালী দ্বীপ; এই মহেশখালী বঙ্গ উপসাগরের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। মহেশখালী পৃষ্ঠে গিরিরাজ মৈনাক। তদুপরি আদিনাথ। বিজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ—যেন করি-পৃষ্ঠে সিংহ। প্রকৃতির এহেন জগদ্ধাত্রী রূপ ভক্তি উদ্দীপনের প্রস্রবণ—চির সৌন্দর্য্যময় গরিমা।"

কথিত আছে, লঙ্কেশ রাবণ তপস্যাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া আদিনাথ শিব লিঙ্গকে নিজ স্কন্ধোপরি লইয়া মৈনাক পর্ব্বতে স্থাপন করিয়াছিলেন। আদিনাথ লিঙ্গ বহু শত বৎসর পর্য্যন্ত লুক্কায়িতভাবে ছিলেন। একজন কাঠুরিয়া কাষ্ঠ আহরণার্থে প্রকাণ্ড শুষ্ক বিল্ব বৃক্ষের শাখা ছেদন করিবা মাত্র, এক জ্যোতির্ম্ময় প্রস্তর খণ্ড বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হয়, কাঠুরিয়া ইহাকে সামান্য প্রস্তর মনে করিয়া কুঠার শান দিবার জন্য বাটিতে আনিয়া রাখে। কাঠুরিয়া স্বপ্নে নানাবিধ বিভীষিকা দর্শনে ভীত হইয়া দ্বীপাধিপতির নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলে, তিনি কাঠুরিয়ার বাটী হইতে সেই জ্যোতির্ম্ময় সুলক্ষণাক্রান্ত বাণলিঙ্গ আদিনাথ দেবকে মৈনাক পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া মন্দির প্রস্তুত ও সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তদবধি ইঁহার মাহাত্ম্য চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়াছে।
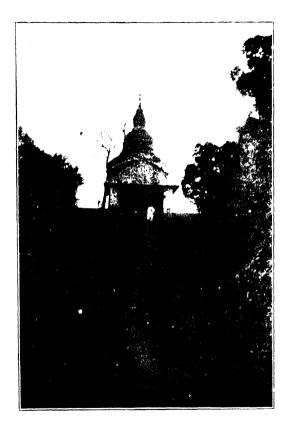
কসবা কালীবাড়ী

কস্‌বা কালীবাড়ী

আসাম বেঙ্গল রেলের কমলাসাগর নামক ষ্টেসন পার্শ্বে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যে একটী সমতল পর্ব্বতশৃঙ্গে কস্‌বা কালীবাড়ী সংস্থিত। একটী প্রাচীন মন্দিরমধ্যে প্রোথিত শিলা গাত্রে মায়ের মূর্ত্তি ক্ষোদিত; মন্দির সম্মুখে নাট মন্দির। স্বাধীন ত্রিপুরেশ কর্ত্তৃক পুরাকালে এই মন্দির ও কালী স্থাপিত হইয়াছিল, পূজার জন্য মহারাজার বৃত্তি আছে। শনি মঙ্গলবারে যাত্রীর সংখ্যা অধিক হয়, বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথিতে বৃহৎ মেলা হয়। কালীবাড়ীর নিকটে পর্ব্বতের সানুদেশে কমলাসাগর নামে স্বচ্ছসলিলা এক বৃহৎ দীঘিকা আছে, এরূপ নির্ম্মল জল আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ইহা ফিল্‌টার করা জল হইতেও উৎকৃষ্ট, ইহার জল পানে পেটের পীড়া ইত্যাদি রোগ দূর হয়। স্থানটী অতি নির্জ্জন ও শান্তিপ্রদ; চাঁদপুর হইতে কমলাসাগর ৬৬ মাইল, ভাড়া ১০৬ আনা।

রাজমালা পাঠে জানা যায়, মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের রাজত্ব সময় এখানে প্রকাণ্ড দুর্গ ও দশ সহস্র সৈন্যাবাস ছিল। কল্যাণগড় নামক ভগ্ন দুর্গের চিহ্ন আছে। মোসলমান রাজত্বে জাহাঙ্গীর নগর বাঙ্গালার রাজধানী থাকার সময় নবাব সা সুজার সঙ্গে ত্রিপুরেশ কল্যাণ মাণিক্যের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে নবাব সৈন্য পরাভূত হইলে, বিজয়চিহ্নস্বরূপ মহারাজ এক বৃহৎ দীঘি খনিত করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি কমলাসাগর নামে আখ্যাত। ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম সীমানায় বুড়ীমা নদীর তটে নবাব সৈন্যেরও এক দুর্গ ছিল, ভোলাচঙ্গ গ্রামের চতুর্দ্দিকে ইহার পরিচিহ্ন দৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকে ইহাকে গড় কহে।

জল্পীশ দেব

"দেবীং সংপূজয়েন্নিত্যং সম্পূর্ণফলদায়িনী।
ততশ্চতুর্গুণা প্রোক্তা জল্পীশেশ্বরসন্নিধৌ ॥"

জলপাইগুড়ি সহরের ৮ মাইল পূর্ব্বে জল্পীশ নামে একটী গ্রাম আছে। জল্পীশ শিব হইতেই গ্রামের নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কালিকাপুরাণে জল্পীশ শিবের উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, কামরূপের বায়ু কোণে দেবাদিদেব মহেশ্বর জল্পীশ নামক আপন লিঙ্গমূর্ত্তির অতুল ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন, ভক্তশ্রেষ্ঠ নন্দী জগৎপতির পূজা করিয়া সশরীরে গাণপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তথায় নন্দীকুণ্ড নামে একটী কুণ্ড আছে, ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া নক্তব্রত অবলম্বনে পরদিন জল্পীশ দেবের মন্দিরে লিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিতে হয়; তৎপর হবিষ্যাশী হইয়া সিদ্ধেশ্বরী দেবী মন্দিরে চতুর্ভুজা কালী মূর্ত্তির পূজা করিলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। প্রেতের উপর উপবিষ্টা ভয়ঙ্কর কালী মূর্ত্তি। পুরাকালে ভগবান পরশুরামের ভয়ে যে সকল ক্ষত্রিয়গণ ভীত হইয়া জল্পীশ দেবের শরণাগত হইয়াছিল, তাহারা আর্য্যভাষা পরিত্যাগে ম্লেচ্ছ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয় এবং জল্পীশ দেবের গণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে উঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ সেবাইত সূত্রে দেব মন্দিরের অধিকারী। ইহাদিগকে প্রথমে কিছু দক্ষিণা না দিলে দেব দর্শন করা যায় না। জল্পীশ দেব কুন্দতুল্য শ্বেতবর্ণ। ইহা উপপীঠ। প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হইলে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই মন্দিরটী দুই শত বৎসরের ঊর্দ্ধকালের এমত জানা যায়। শিবরাত্রের সময় এখানে দশদিনস্থায়ী এক বৃহৎ মেলা হয়। জলপাইগুড়ির রেল ভাড়া কলিকাতা হইতে ৩৸৶৬ আনা মাত্র।

সিদ্ধপীঠ
ও
সাধুজীবনী

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী

মেহার কালী বাড়ী

ও

সিদ্ধ সর্ব্বানন্দ।

"ত্বং সর্ব্বশক্তি র্জগতাং ত্রিহিত্রী।
ত্বং সর্ব্বমাতা সকলস্য ধাত্রী॥
ত্বং বেদরূপাখিলবেদবাচ্যা।
ত্বং সর্ব্ব গোপ্যা সকলপ্রকাশ্যা॥"

আসাম বেঙ্গল রেলের ভিঙ্গ্‌রা নামক ষ্টেসনের সন্নিকট মেহার কালী বাড়ী, বঙ্গদেশের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ স্থান। মহাত্মা সর্ব্বানন্দ এখানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং সে সময় হইতে ইহা সিদ্ধ পীঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কলিকাতা হইতে ভিঙ্গ্‌রা ষ্টেসনের ভাড়া ৩৷৹ আনা। আমরা ১৩১৫ সালে সিদ্ধ পীঠ দর্শনার্থে কুমিল্লা হইতে ।৶৬ আনা ভাড়া দিয়া, মেহার গ্রামে যাইয়া ৺ সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের অধস্তন বংশধর পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত জগবন্ধু তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করি, এবং তাঁহার ব্যবহারে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। গভীর অরণ্যমধ্যে যে জীন বৃক্ষমূলে সর্ব্বানন্দ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ বটবৃক্ষসহ সেই প্রাচীন বৃক্ষটী অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। বৃক্ষমূলেই পূজা, বলি, হোম ইত্যাদি হইয়া থাকে। বৃক্ষোপরি কাক, শকুনী, গৃধিনী প্রভৃতি অসংখ্য পক্ষী বসিয়া থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা মল মূত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া পূজার দ্রব্যাদি কিম্বা ঐ স্থান অপবিত্র করে না। এখানে কোন দেব দেবীর মূর্ত্তি নাই; কিন্তু প্রতিনিয়ত যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে। যাত্রীদিগের

সাময়িক অবস্থানের জন্য কয়েকটী চালা ঘর আছে এবং কালীর সেবাইত ভট্টাচার্য্যগণের বাটীতেও যাত্রিগণের থাকিবার জন্য বহু ঘর আছে। পূর্ব্বদিকে একটী বাজার, তাহাতে পূজার সমস্ত দ্রব্য ও ছাগাদি পশু ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। সিদ্ধ পীঠের উত্তরদিকে একটী পুষ্করিণী আছে, তাহার জল ময়লা, এবং সংস্কার অভাবে ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাট ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। উহার দক্ষিণে কুমিল্লার রায় পরিবারের প্রধান ভূম্যধিকারী বাবু গোপাল চন্দ্র রায় মহাশয়ের কাছারি বাড়ী, সেখানে ভদ্র বিশিষ্ট যাত্রিগণ থাকিতে পারেন। কাছারির পুষ্করিণীর জল পরিষ্কার। পূজান্তে পাণ্ডাবিদায় বলিয়া পৃথক কিছু দক্ষিণা দিতে হয় এবং সে দক্ষিণা পূজারী ও আশ্রয়দাতার প্রাপ্য।

পৌষ মাসে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন মহাত্মা সর্ব্বানন্দ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে প্রতিবৎসর সেখানে মেলা হয়। সহস্র সহস্র লোকের সমাগমে সুবিস্তীর্ণ স্থান লোকারণ্য জন্য চলা যায় না। সেই দিন জীন বৃক্ষের চতুর্দ্দিকেই ছাগাদি পশুর বলি হইয়া থাকে; এবং বধ্য পশুর ছিন্ন মস্তকের স্তূপ দর্শনে মনে বিভীষিকা উৎপাদন করে। পাঠকগণের অবগতির জন্য সিদ্ধ সর্ব্বানন্দের জীবন চরিত এই আখ্যায়িকায় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। এরূপ প্রবাদ সর্ব্বানন্দের সিদ্ধিস্থানই পুরাকালে মহাতপা মাতঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল।

৺ সর্ব্বানন্দ ভট্টাচার্য্যের পুত্র শিব নাথ ভট্টাচার্য্য বিরচিত সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণী নামক পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়, প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে, সর্ব্বানন্দ দেবের পূর্ব্বপুরুষ বাসুদেব শর্ম্মা বর্দ্ধমান জিলার পূর্ব্বস্থলী নামক গ্রামে বাস করিতেন। তিনি অতি সাধু ও শুদ্ধচেতা ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুদীর্ঘকাল গঙ্গাতটে তপস্যা করিয়াও সিদ্ধি লাভ করিতে না পারায় দৈববাণী হয় "মাতঙ্গমুনির আশ্রমে তোমার পৌত্র সিদ্ধি লাভ করিবে"। বাসুদেব দৈববাণীশ্রবণে কায়মনে প্রার্থনা

করিয়াছিলেন, 'আমিই যেন আমার পৌত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করি।' "তাহাই হইবে" এইরূপ প্রত্যাদেশ পাইয়া, বাসুদেব শর্ম্মা সপরিবারে ভৃত্য পূর্ণানন্দ সহ, মাতঙ্গ মুনির আশ্রম অনুসন্ধান করিয়া কুমিল্লা জিলায় মেহারে আসিয়া বাস করেন; এবং স্বীয় প্রতিভা বলে স্থানীয় দাসরাজের গুরুপদ লাভ করিয়াছিলেন। বাসুদেব স্বীয় ভৃত্য পূর্ণানন্দকে সমস্ত বিষয় অবগত করাইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। অচিরকাল মধ্যে তদীয় পুত্র শম্ভুনাথের এক পুত্র সন্তান জন্ম পরিগ্রহ করিল। সেই পুত্রের নামই সর্ব্বানন্দ। সর্ব্বানন্দ কোন মতেই বিদ্যাভ্যাস করিতে না পারিয়া মূর্খ হইলেন। সর্ব্বানন্দের শিবনাথ নামে পুত্র জন্মিয়াছিল, তিনি পণ্ডিত ছিলেন। শম্ভুনাথের মৃত্যুর পর সর্ব্বানন্দ রাজগুরুপদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু মূর্খতা নিবন্ধন বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিতে না পারিয়া রাজসভায় অপদস্থ ও হাস্যাস্পদ হইতে থাকেন। পিতার অবমাননা দৃষ্টে শিবনাথ দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে রাজসভায় যাইতে নিষেধ করিলে, সর্ব্বানন্দ বিদ্যাশিক্ষার মানসে দৃঢ়চিত্ত হইয়া বনে গমন করেন।

একদা লিখিবার উপকরণ তালপত্র সংগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বানন্দ যখন বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক বৃন্ত ছেদন করিতেছিলেন, সেই সময় এক ভীষণ সর্প নির্গত হইয়া তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইলে তিনি অকুতোভয়ে অতি তৎপরতার সহিত সবলে সর্পকে ধৃত করিয়া, তাল বৃন্তের ধারাল শাখাতে ঘর্ষণ করত উহার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক পৃথিবীতলে নিক্ষেপ করেন। দৈব চক্রে সেই সময় সন্ন্যাসীবেশধারী জনৈক মহাপুরুষ সর্ব্বানন্দের এরূপ সাহস দৃষ্টে তাঁহাকে তৎসমীপে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। সর্ব্বানন্দ সন্ন্যাসীর জটামণ্ডিত মস্তক, ভস্মাচ্ছাদিত গাত্র, শান্ত ও হাস্যমুখ দৃষ্টে, তাঁহার নিকট আগমন করতঃ সভয়ে প্রণাম করিয়া আপন অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। সন্ন্যাসী সস্নেহে

তাঁহাকে বলিলেন, বৎস! তোমার বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যক নাই। আমি তোমাকে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র প্রদান করিতেছি, এই মন্ত্র তুমি উত্তরায়ণ সংক্রান্তিদিবস নিশীথ সময়ে মাতঙ্গমুনির আশ্রমে জীনবৃক্ষমূলে শবাসনে বসিয়া, এক মনে জপ করিলে জগন্মাতা সুপ্রসন্না হইয়া তোমার প্রত্যক্ষীভূতা হইবেন। এই বলিয়া সর্ব্বানন্দের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিয়া বক্ষোপরি তাহার ক্রম লিখিয়া দিলেন।

সর্ব্বানন্দ পূর্ব্ব হইতেই ভৃত্য পূর্ণানন্দকে বড় ভাল বাসিতেন, 'পূর্ণাদাদা' বলিয়া ডাকিতেন। বাটী আসিয়া এসমস্ত বিবরণ পূর্ণাদাদাকে জানাইলে, তিনি ঐ মন্ত্র অভ্যাস করিতে বলিলেন। একদা পৌষ সংক্রান্তির নিশীথ সময়ে পূর্ণানন্দ প্রভুপুত্র সর্ব্বানন্দকে লইয়া মাতঙ্গ মুনির আশ্রমে জীনবৃক্ষের নিম্নে আসিয়া, সর্ব্বানন্দকে সাহস প্রদান করিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি কিছু মাত্র ভয় করিও না, আমি এখানে শুইয়া থাকি, তুমি আমার পৃষ্ঠদেশে আসীন হইয়া, একাগ্রচিত্তে সেই মন্ত্র জপ করিতে থাক। দেবীর সাক্ষাৎ লাভ হইলে, যখন তিনি বর দিতে উদ্যত হইবেন, সেই সময় তুমি বলিও হে মাতঃ! কি বর গ্রহণ করিব আমি তাহা অবগত নহি, কেননা আমি ভৃত্যের আজ্ঞানুবর্ত্তী। এই কথা বলিয়াই ভৃত্যশ্রেষ্ঠ পূর্ণানন্দ যোগবলে দেহ হইতে প্রাণ বিমুক্ত করিয়া নিরালম্বে অবস্থিত রহিলেন। সর্ব্বানন্দ দেব পূর্ণা দাদার পৃষ্ঠোপরি আসীন হইয়া একমনে মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবীমূর্ত্তির ধ্যান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে সমাধিমগ্ন সর্ব্বানন্দের হৃদ্‌কমল হইতে সূর্য্যসঙ্কাশ সুমহান্ তেজ নির্গত হইয়া সমস্ত বনভূমি ব্যাপ্ত হইল এবং সেই তেজোরাশির মধ্য হইতে দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া সর্ব্বানন্দকে বলিলেন, বৎস! বর গ্রহণ কর। সর্ব্বানন্দ দেবীবাক্য শ্রবণে চক্ষুরুন্মিলন পূর্ব্বক গুরুমন্ত্রোপদিষ্ট হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবী মূর্ত্তিকে সম্মুখে দর্শন করিয়া কৃত কৃতার্থ হইলেন। তাঁহার সমস্ত

মুর্খতা দূর হইয়া গেল। তিনি এক নূতন জীবন প্রাপ্ত হইলেন। সমগ্র শাস্ত্রই তাঁহার জিহ্বাগ্রে প্রতিভাত হইতে লাগিল ; তিনি নানা-বিধ প্রকারে দেবীর স্তুতি করিলেন। দেবী সন্তুষ্টা হইয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে পুত্রস্থানীয় করিলাম, অতঃপর তুমি যাহা কর্ত্তব্য মনে করিবে তৎসমস্তই ফলপ্রদ হইবে"। সর্ব্বানন্দ বলিলেন, "হে মাতঃ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদির চিরবাঞ্ছিত অতি গুহ্য তোমার অভয় পদ যখন দর্শন করিয়াছি, তখন আমার সমস্তই সফল হইয়াছে। আমার অন্য বরের প্রয়োজন কি? আমি আর কি বর প্রার্থনা করিব? তবে একান্তই যদি কোন বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা আমি জানি না, আমার সম্মুখে যে নিদ্রিত দাস সেই আমার অপর বর, তাহার প্রার্থিত বর প্রদান করুন।" তখন ভগবতী আদ্যাশক্তি পূর্ণানন্দের মস্তকে পদার্পণ করিয়া বলিলেন, হে বৎস পূর্ণানন্দ! তুমি মুক্ত হইয়াছ। যোগনিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক উঠ এবং আমার পরম পদ দর্শন করিয়া অভীষ্ট বর গ্রহণ কর। পূর্ণানন্দ দেবীর পাদপদ্মস্পর্শে সচেতন হইয়া অনেক স্তব করিয়াছিলেন; এবং দেবীর দশবিধ রূপ প্রদর্শনের প্রার্থনা করিলে, দেবী দশবিদ্যারূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদবধি সর্ব্বানন্দের বংশকে সর্ব্ববিদ্যার বংশ বলিয়া থাকে।

সর্ব্বানন্দ দেব সিদ্ধ হইয়া রাজসভার অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন এমত লিখিত আছে। তিনি একদা অমাবস্যা রজনীকে পূর্ণিমা বলিয়াছিলেন, এবং প্রতিশ্রুতিরক্ষার্থে রজনীতে দেবীর কৌশলে নখ চন্দ্র দর্শন করাইয়া লোকদিগকে পূর্ণ চন্দ্রের ভ্রম জন্মাইয়াছিলেন। সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের এরূপ আশ্চর্য্য প্রভাব দৃষ্টে সভা শুদ্ধ সকলেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, শীত নিবারণ জন্য রাজা একজোড়া উৎকৃষ্ট শাল সর্ব্বানন্দ দেবকে দান করেন, এবং তিনি উহা এক বারবনিতাকে প্রদান করেন।

রাজা তাহা শুনিয়া সেই স্থান হইতে উক্ত শাল আনাইয়া, কৌশলে গুরুদেবের নিকট ঐ শালের কথা উত্থাপন করিলে, তিনি মহামায়ার কৃপায় তদ্রূপ অপর একজোড়া শাল নিজ ভাগিনেয় ষড়ানন্দ দ্বারায়, বাটী হইতে আনয়ন করিয়া রাজাকে দেখাইয়াছিলেন। উভয় শাল একরূপ হওয়ায় সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। সর্ব্বানন্দ দেব স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক মেহার হইতে সেনহাটি নামক স্থানে যাইয়া পুনঃ দার পরিগ্রহ করেন, এবং পঞ্চাশৎ বৎসর বয়সে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক বারাণসীতে গমন করিয়া অবধূতবৎ আচার অবলম্বন করিয়াছিলেন।
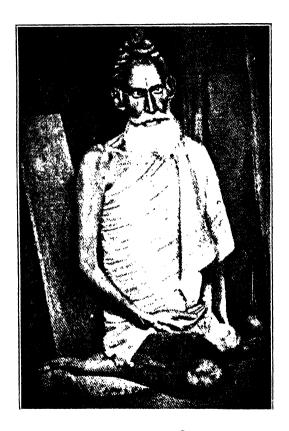
লোকনাথ ব্রহ্মচারী

বারদীর ব্রহ্মচারী।

"ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্ম্মলম্ সর্ব্বকামিকম্।
যেষাং বাক্যোদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনো জনাঃ॥"

ঢাকা জিলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের অধীন, মেঘনা নদীর পশ্চিম তটে, বারদী নামে এক প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। নাগবংশীয় জমিদারগণ সেখানে বাস করেন। বারদীর রাজারা পূর্ব্ববঙ্গে প্রসিদ্ধ। এখানে একটী ষ্টীমার ষ্টেসন আছে। ১২৭০ বঙ্গাব্দে এখানে এক মহাপুরুষের আগমন হয়, তিনিই বারদীর ব্রহ্মচারী নামে আখ্যাত। জমিদার-বাবুগণ ব্রহ্মচারীর বাসের জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই বারদীর ব্রহ্মচারী আশ্রম নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মচারীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সবিশেষ জানা যায় না। তিনি ১১৩৭ সনে পশ্চিম বঙ্গের কোন এক গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নাম লোকনাথ ছিল। শৈশবে ব্রহ্মচারীবেশে গুরুগৃহে শাস্ত্রালোচনা করেন এবং সংসারাশ্রম পরিত্যাগান্তে হিমালয়ের কোন নিভৃত স্থানে থাকিয়া, যোগাভ্যাস করতঃ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্ত বিষয়েই তিনি উত্তর দিতে পারিতেন। কথিত আছে, তিনি যোগবলে দেহ হইতে জীবাত্মাকে বহির্গত করিতে পারিতেন এবং ইতর প্রাণিগণের মনের ভাব বুঝিতে সক্ষম ছিলেন। সর্ব্বপ্রকার রোগ দূরীকরণে তাঁহার আশ্চর্য্য দৈবশক্তিসম্পন্ন ক্ষমতা ছিল।

ব্রহ্মচারী উলঙ্গাবস্থায় বারদীতে আগমন করেন। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বরফাবৃত স্থানে অবস্থান নিবন্ধন, তাঁহার সর্ব্ব শরীর একরূপ শ্বেত বর্ণের পুরু চর্ম্মাবৃত ছিল, এবং তজ্জন্য উলঙ্গ অবস্থায় শীতানুভব হইত না।

তাঁহার উন্নত শরীর, অত্যাশ্চর্য্য জ্যোতিসম্পন্ন সুদীর্ঘ নেত্রদ্বয়, ভূতলস্পর্শী বিশাল জটাকলাপ দৃষ্টে এক অভিনব জীব বলিয়া মনে হইত। খাদ্যাখাদ্যের কোন বিচার তাঁহার ছিল না, যথা তথা বাস করিতেন। এই জন্য গ্রামবাসীরা তাঁহাকে পাগল বলিয়াই অনুমান করিয়াছিল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে তাঁহার আশ্চর্য্য দৈবশক্তিদর্শনে মোহিত হইয়া অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষ জ্ঞানে ভক্তিভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। রোগীর রোগ দূর করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। শত শত লোক রোগের শান্তিকামনায় তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত থাকিত। যাঁহার প্রতি তাঁহার করুণাসঞ্চার হইত, তিনি যত কেন কঠিন রোগাক্রান্ত হউন না, নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিতেন। লোকের মুখ দৃষ্টে অনেককে তাঁহার জীবনের পূর্ব্বঘটনাদি বলিয়া দিতেন। কেহ কেহ তাঁহার দয়ার উদ্রেক করিতে না পারিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতেন, তাঁহার ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় উপদেশ অতীব সারগর্ভ। তিনি জাতিস্মর ছিলেন, নিজের পূর্ব্বজীবনের কথা স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইত। তিনি অন্যের রোগ নিজ দেহে আনিয়া রোগীর রোগ দূর করিতে পারিতেন। এইরূপ প্রক্রিয়ার বলে এক জন আসন্নমৃত্যু যক্ষ্মা রোগীর রোগ শিষ্যগণের অনুরোধে আপন দেহে আরোপিত করিয়া রোগীকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু ব্রহ্মচারীর দেহে ক্ষয়কাশের বীজ প্রবেশ করিয়া তাঁহারই প্রাণ নাশের চেষ্টা করিল।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পূর্ব্বাচার্য্য বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ব্রহ্মচারীর নিকট সময়ে সময়ে আগমন করিতেন। ব্রহ্মচারীর দর্শনে ও উপদেশে পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিয়া হিন্দুধর্ম্মে পুনঃ আস্থাবান্ হইয়াছিলেন। কথিত আছে, গোস্বামী মহাশয় একবার কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া মারাত্মক কাতর হইয়াছিলেন; তাঁহার চিকিৎসক জবাব দিয়াছিলেন; ব্রহ্মচারীর নিকট

কোন শিষ্য এই দুঃখের সংবাদ বিদিত করিলে তিনি যোগবলে গোস্বামী মহাশয়ের রোগশয্যাতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীর নিকট কোন গুরুতর বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, তিনি যোগবলে দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া সূক্ষ্ম দেহে জিজ্ঞাসিত বিষয়ের তত্ত্ব জানিয়া আসিয়া, সমগ্র ঘটনা বিবৃত করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেন। ১২৯৭ সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০ বৎসর বয়সে মহাপুরুষ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সেবকগণ সেই আশ্রমকে যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন।

নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বিহরষ্যামি তৈরহম্।
কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যামাহং পুনঃ॥
কৃষ্ণশ্চৈতন্য গৌরাঙ্গ গৌরচন্দ্র শচীসুত।
প্রভু গৌরহরি গৌরনামানি ভক্তিদানিমে॥

নবদ্বীপ বঙ্গে বিখ্যাত নগরী, ইহাকে নদীয়া বলে, নবদ্বীপে বঙ্গের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল। এই নগরী পুরাকালে ভাগীরথীর পূর্ব্ব তটে ছিল, কিন্তু নদীগর্ভের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা পশ্চিম কূলে অবস্থিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণের গ্রন্থে ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আছে; নয়টী দ্বীপ কিম্বা গ্রাম সংযোগে নবদ্বীপ নামাকরণ হইয়াছে। সেনরাজদিগের পূর্ব্বে নবদ্বীপের অস্তিত্ব ছিল কি না তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন—পুরাকালে এতদঞ্চল সমুদ্রমগ্ন ছিল, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সমুদ্র দূরে সরিয়া যাইলে ইহা জাগিয়া উঠে। সহরের নিকটে সমুদ্রগড় নামে এক গ্রাম আছে, পূর্ব্বে তিনটী নদীর মোহনা ছিল বলিয়া এই স্থানটিকে ত্রিমোহনী বলিত। নগরের পূর্ব্ব দিকে সুবর্ণবিহার নামে আর একটী গ্রাম আছে, বৌদ্ধ রাজগণের সময় উহা বৌদ্ধবিহার ছিল; বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। ই, আই, রেলের বেণ্ডেল ষ্টেসন হইতে নবদ্বীপ যাইবার জন্য রেল লাইন প্রস্তুত হইয়াছে।

পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তটপ্রান্তে নবদ্বীপ এক সময় বঙ্গের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। বখ্‌তিয়ার খিলিজির আগমনে সেনরাজ মন্ত্রীর

শ্রীচৈতন্যদেব

চক্রান্তে বিনাযুদ্ধে রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক তীর্থক্ষেত্রে প্রস্থান করিলে, রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন, বাণিজ্যেরও সবিশেষ অবনতি ঘটিল। সেন রাজবংশের সেই সমুন্নত রাজপ্রাসাদ আর নাই। ভগ্নাবশেষও কাল-কবলিত হইয়াছে। লক্ষ্মী চলিয়া গেলেও তাঁহার পদচিহ্ন একেবারে মুছিয়া যায় না; কোথাও পূর্ব্ব গৌরবের সামান্য কণা মাত্র পড়িয়া থাকিবেই থাকিবে। প্রাণহীন দেহ, প্রাণীশূন্য গেহ, জনবিহীন নগরী, ধ্বংসাবশেষ স্তূপাকৃতি রাজপুরী, প্রভৃতির দৃশ্য বড়ই ভীষণ বটে। নবদ্বীপও সেরূপ ভীষণ দৃশ্য। নবদ্বীপে মোসলমানের ভীষণ অত্যাচার হইয়াছিল। শাস্ত্রে রাজাকে বিষ্ণুতুল্য বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অধিষ্ঠানে লক্ষ্মী, সরস্বতী উভয়েই প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন; লক্ষ্মীর অন্তর্ধান হইলেও সরস্বতী দেবী এপর্য্যন্ত সমুজ্জ্বলভাবেই বিরাজ করিতেছেন। নবদ্বীপ সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনার প্রধান কেন্দ্র ছিল; পূর্ব্বে শত শত চতুষ্পাঠীতে অসংখ্য বিদ্যার্থী নানা দিক্‌দেশ হইতে সমাগত হইতেন। যে ন্যায় দর্শনালোচনায় বঙ্গদেশ জগদ্‌বিখ্যাত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, এই নবদ্বীপই সেই ন্যায় শাস্ত্রের জন্মভূমি। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন রঘুনাথ তর্কচূড়ামণি মিথিলা হইতে ন্যায় শাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবদ্বীপকে ভূষিত করিয়াছিলেন; কুশাগ্রবুদ্ধি রঘুনাথ কর্ত্তৃক মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছিল। স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দন স্মৃতিভাণ্ডার মন্থন করিয়া নব্য স্মৃতির আবিষ্কার করিয়াছিলেন; এখানেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পরমার্থ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া, বঙ্গভূমিকে পবিত্র করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বজনীন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ভারতে কয় জন জন্মিয়াছেন? শ্রীচৈতন্যদেবের অপার্থিব প্রেমের প্রবাহে নবদ্বীপ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া তাঁহাদের নিকট বৃন্দাবনের ন্যায় মহাতীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কেবল বৈষ্ণব কেন? হিন্দুমাত্রেরই ইহা তীর্থ স্থান। ফাল্গুনমাসে দোলযাত্রার সময় ধুলট্

নামক বৈষ্ণব পর্ব্বোপলক্ষে সমবেত বৈষ্ণবমণ্ডলীর নাম সংকীর্ত্তন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! প্রেম ভক্তির উদ্দীপক। নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সুতরাং এই আখ্যায়িকায় মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনী বৈষ্ণব গ্রন্থাদি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

হিন্দু-শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, যখন ধর্ম্মের অবনতি হইয়া দুরাচার পাষণ্ডদিগের প্রাবল্য হয় এবং সাধুদিগের অশেষ কষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে, তখনই সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্টের দমন ও ধর্ম্মের সংস্থাপন জন্য চিন্ময় ভগবান হরি মর্ত্তধামে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া সদুপদেশ প্রদান ও অলৌকিক কার্য্যাদি দ্বারা ধর্ম্মের সংস্থাপন করেন। ইঁহাকেই অবতার কহে। এই সুবিস্তীর্ণ ভারতভূমে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল প্রতাপে হিন্দুধর্ম্ম ধ্বংসপ্রায় হইয়া, যখন রাজা প্রজা সকলেই এক বাক্যে "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই বৌদ্ধমতের পোষকতা করিতেছিল; যখন অনেকেই হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রাজশাসনে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল; তাহার কয়েক শতাব্দী পরেই বঙ্গদেশে তান্ত্রিক মতের সূত্রপাত হয়। ভগবান শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য অমোঘ শাস্ত্রবিচারে বৌদ্ধশ্রমণকদিগকে পরাস্ত করিয়া যেই অদ্বৈতবাদ প্রচার করিলেন; তখনই আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি নানা প্রলোভনময় ঐশ্বর্য্যযুক্ত তান্ত্রিক মত দ্বারা জনগণকে একেবারে মোহিত করিয়া ফেলিলেন। সাধারণতঃ লোকে ধর্ম্মের কঠিন অংশ ত্যাগ কবিয়া সহজ অংশ টুকুই অবলম্বন করিয়া থাকে; তান্ত্রিকগণও তন্ত্রের নিগূঢ়ভাব গ্রহণ না করিয়া আশুপ্রীতিজনক মোহকর মদ্যমাংসাদিতে আসক্ত হইয়া, মূল ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িলেন। ইহাদের দলবৃদ্ধি ও যবন-রাজগণের ঘোর অত্যাচারে ভারতে ধর্ম্মভাবের ভয়ঙ্কর অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল! মিথ্যা ভাষণ, পরদ্রব্য হরণ, পরপীড়ন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, সতীর সতীত্ব নাশ ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ামধ্যে পরিগণিত হইল।

ধর্ম্মপ্রাণ সাধু ব্যক্তিগণের অসহ্য হৃদয়বিদারক ভীষণ মনস্তাপ ঘটিল। তাঁহারা নীরবে সর্ব্বদুঃখহর বিপদভঞ্জন হরিকে একমনে ডাকিতে লাগিলেন; তাঁহাদের সেই অশ্রুবারিসিক্ত হৃদয়ের অন্তস্থলভেদী করুণ বেদনা স্বর্গে ভগবানের সিংহাসন নাড়িল। ভক্তাধীন ভগবান আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অমনি আপনার পার্শ্বচরদিগকে অগ্রে জন্মগ্রহণ করিতে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। সেই সময় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, চন্দ্রশেখর, পুণ্ডরীক, নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনিবাস, মুরারী প্রভৃতি পরম ভাগবতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা একটী বৈষ্ণব সম্প্রদায় সৃষ্ট হইল বটে, কিন্তু কর্ণধারের অভাবে ইহার বিশেষ উন্নতিসাধিত হইতে পারিল না। পাষণ্ডিদিগের ভীষণ অত্যাচারে বৈষ্ণবকুল উৎপীড়িত হইয়া ভগবানকে যখন মন প্রাণে ডাকিতে লাগিলেন, তখনই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু অবতীর্ণ হইলেন।

১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুনমাসে পূর্ণিমা তিথিতে পবিত্র নবদ্বীপ নগরে জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে শচীদেবীর গর্ভে ভগবান শ্রীচৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ করেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে উল্লেখ আছে, জগন্নাথ মিশ্রের আদি-পুরুষ পরম সাধু মধুকর নামক একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ উড়িষ্যার অন্তর্গত জাজপুর গ্রামে বাস করিতেন, মহারাজ কপিলেন্দ্রদেবের ভয়ে শ্রীহট্ট গমন করিয়া জয়পুর নামক স্থানে কিছু ভূমি লাভ করিয়া বাস করেন। কেহ বলেন বড়গঙ্গ নামক স্থানে বাস করেন।

তাঁহার চারি পুত্র মধ্যে উপেন্দ্র মিশ্রের কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্ব্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ও ত্রিলোচন নামে সাতটী সন্তান জন্মে। জগন্নাথ মিশ্র দেশে ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়া সমধিক বিদ্যাশিক্ষার্থে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নবদ্বীপের বৈদিক নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, আপন দুহিতা শচী দেবীর সহিত জগন্নাথ মিশ্রের বিবাহ দেন। শচীদেবীর গর্ভে জগন্নাথ মিশ্রের বিশ্বরূপ নামক

প্রথম এক পুত্র জন্মে ; তিনি বাল্যকালেই সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া গৃহত্যাগী হন। জগন্নাথ মিশ্র মাতৃদর্শনার্থে সস্ত্রীক দেশে যাইয়া কিছুকাল বাস করেন, এই সময় শচীদেবীর পুনঃ গর্ভলক্ষণ প্রকাশ হইলে, মাতার অনুমতি গ্রহণে তিনি পুনরায় নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীচৈতন্য দেব ত্রয়োদশ মাস মাতৃগর্ভে বাস করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল, নবদ্বীপবাসীরা অপার আনন্দে দানধর্ম্ম, ঈশ্বরনামকীর্ত্তন, শঙ্খঘণ্টাদির ধ্বনি ও উল্লাসে মত্ত ছিলেন। চৈতন্য-দেব এইরূপ সুসময়ে জন্মগ্রহণ করায়, ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদনের বিশ্বাসের অন্যতর কারণ হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের অনেকগুলি নাম ছিল। মৃতবৎসা জননীর পুত্র বলিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের সহধর্ম্মিণী সীতাদেবী নিমাই নাম রাখেন ; অন্নপ্রাশনের সময়ে ইঁহার নামকরণ হয় বিশ্বাম্ভর ; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া ইঁহার অপর নাম গৌরাঙ্গ ; উত্তরকালে সন্ন্যাস গ্রহণের সময় ইনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র নাম প্রাপ্ত হন ; নামের এক দেশ শ্রীচৈতন্য নামে সাধারণের নিকট সবিশেষ পরিচিত। তাঁহাকে দেখিবার জন্য সকলেই জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে আসিয়াছিলেন, শিশুপদতলে ধ্বজ,, বজ্র, শঙ্খ, চক্র, মীন প্রভৃতি শুভচিহ্ন দৃষ্টে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মহাপুরুষ বলিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন। পরম বৈষ্ণব অদ্বৈতাচার্য্য ভাববাদীর ন্যায় পূর্ব্বেই ইঁহার অবতার ঘোষণা করিয়াছিলেন। নিমাই বাল্যকালে বড়ই চঞ্চল ও উদ্ধত ছিলেন। তিনি প্রতিবাসীর বাটীতে নানা প্রকার উৎপাত করিতেন, যাহা চাহিতেন, তাহা না পাইলে কাঁদিয়া আকুল হইতেন ; যদি কেহ মধুর হরিনাম করিত তখনই চুপ করিতেন। বাল্যকালেই তিনি অসামান্য মেধা ও অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। অতি অল্প বয়সেই পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, পুরাণ, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রের কূট প্রশ্নে,

তর্কে, ও অপূর্ব্ব মীমাংসায় কেহই তাঁহাকে আটিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহার এরূপ অনন্যসাধারণ প্রতিভা দৃষ্টে নবদ্বীপবাসী মাত্রই চমৎকৃত হইয়াছিলেন, চতুর্দ্দিকে তাঁহার যশঃসৌরভ বিস্তার হইল। ইহার কিছুকাল পরেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় নিমাই শোকাতুরা জননীর একমাত্র অবলম্বনীয় হইলেন। জগন্নাথ মিশ্রের সাংসারিক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না, নিমাই অত্যধিক পরিশ্রমে বিদ্যা শিক্ষা শেষ করিয়া একুশ বৎসর বয়সের সময় চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। নিমাই অতি মনোহর কমনীয় কান্তিবিশিষ্ট গৌরাঙ্গ পুরুষ ছিলেন, তাঁহার বিশাল আয়ত নেত্রযুগল দর্শন করিলেই লোক মোহিত হইয়া যাইত। পাঠ্যাবস্থাতেই মাতার একান্ত অনুরোধে বল্লভাচার্য্যের পরম রূপবতী কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে দেশ ভ্রমণের জন্য যে সময় পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন, তৎকালে সর্পাঘাতে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হয়। নিমাই দেশে প্রত্যাগত হইয়া সংসারের অনিত্যতা ভাবিয়া আর বিবাহ করিবেন না, প্রকাশ করিয়া অধ্যাপনার কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। এই সময়ে নানাবিধ বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতগণের সঙ্গে তাঁহার শাস্ত্র বিচার হইত, কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব মীমাংসা ও বিচারে সকলেই পরাভূত হইতেন, যশে দেশ ভরিয়া গেল, নানাস্থান হইতে ছাত্র আসিয়া চতুষ্পাঠীর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিল, সঙ্গে সঙ্গে অর্থকৃচ্ছ্রতাও দূর হইল। নিমাই মাতৃদেবীকে একান্ত ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার আজ্ঞায় সনাতন মিশ্রের রূপলাবণ্যবতী সুশীলা কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত পুনরায় তাঁহার পরিণয় হইল। কেশব নামক দিগ্‌বিজয়ী কাশ্মীরী পণ্ডিত নবদ্বীপ জয় করিতে আসিয়া শাস্ত্রবিচারে অন্যান্য পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া বড়ই গর্ব্ব করিতেছিলেন। একদিন রজতশুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতটে বসিয়া শিষ্যসহ নিমাই শাস্ত্রালাপ করিতেছেন, এমন সময় উক্ত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত সমাগত হইয়া বড়ই গর্ব্ব করিয়া বলিলেন, "অহে

নিমাই! তুমি নাকি বড় পণ্ডিত"। নিমাই বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি কি জানি, আপনি বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন, আমরা শুনিয়া সুখী হই"। কেশব পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ কয়েকটী শ্লোক রচনা করিয়া শুনাইলেন। নিমাই শ্লোকগুলির অর্থ ও অলঙ্কারাদি ঘটিত দোষ দেখাইয়া দিলেন, অনেক বিচারে আত্মাভিমানী দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত পরাভব মানিয়া নিমাইকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া, মনোদুঃখে দণ্ডী হইয়া চলিয়া গেলেন। নিমাই পণ্ডিতের প্রথমেই উদারতা ও ত্যাগের ভাব জন্মিয়াছিল, এক দিন তিনি ও অপর একজন পণ্ডিত এক নৌকায় ভাগীরথী পার হইতেছিলেন, পণ্ডিত তাঁহার হস্তে একখণ্ড ন্যায়ের টীকা দৃষ্টে বিমর্ষ হইয়াছিলেন, ইনি পণ্ডিতের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করায় পণ্ডিত বলিলেন "আমিও একখানি ন্যায়শাস্ত্রের টীকা লিখিয়াছি, কিন্তু আপনার টীকা বর্ত্তমান থাকিতে আমার টীকা কে পড়িবে?" অম্‌নি নিজকৃত টীকা নিমাই গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিলেন। দেশপ্রথানুসারে নিমাই পণ্ডিত পিতৃপিণ্ডপ্রদানার্থ গয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তথায় ফল্গুনদীতে স্নান ও পিতৃ কার্য্য সমাপনে ভগবান বিষ্ণুপদ দর্শনের জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিয়া গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন ও ব্রাহ্মণগণের স্তব, স্তুতি শ্রবণ করিয়া গৌরাঙ্গের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে ভাবের উচ্ছ্বাস প্রবলবেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; ভক্তি তরঙ্গ বহিল। তাঁহার মুখে বাক্য নাই, শরীর রোমাঞ্চ, স্বেদাদির ভাব প্রকাশ হইয়া অচৈতন্য হইলেন। গৌরাঙ্গের এভাব দর্শনে সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরী পুরীর চেষ্টায় তিনি চৈতন্য লাভ করিয়া তাঁহার নিকটে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন; এবং ভক্তিরসে প্লাবিত হইয়া কেবল হরিনাম জপ, হরিধ্যান ও হরিনাম সার করিয়া দেশে আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই সময়েই তাঁহার অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বুদ্ধগয়া দর্শনে বুদ্ধদেবের সিদ্ধিস্থানে বোধিদ্রুমের নিম্নে তিনি ঐশ্বরিক

ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঈশ্বরীপুরী ও সঙ্গীয় লোকে তাঁহাকে একান্ত আগ্রহ করিয়া দেশে আনিয়াছিলেন। এই সময় হইতে যেন তাঁহার নবজীবন লাভ হইল, হরিনাম ভিন্ন অন্য কিছু আর ইঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। ভক্তিপ্রেমে মগ্ন হইয়া সমস্ত কাজ ছাড়িয়া দিলেন, অধ্যাপনা কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল; কেননা ছাত্রদিগকে পড়াইবার সময় হরিনাম ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার মুখে আসিত না। পাণ্ডিত্য গর্ব্ব স্থানে ব্যাকুলতা ও বিনয় অধিকার লাভ করিয়াছে। সদাই ভাবে বিভোর, তাঁহার ভাব দৃষ্টে নগরবাসী অবাক হইয়া গেল। নবদ্বীপে অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে গোপনে যে হরিসভা হইত, গৌরাঙ্গ তাহাতে যোগ দিয়া দিবারাত্র প্রকাশ্যে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। দলের নেতা অদ্বৈতাচার্য্য নিমাইকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিলেন। নবদ্বীপে শ্রীনিবাস পণ্ডিতের বাটীতে গদাধর পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি সহ মিলিত হইয়া নিমাই কেবল হরিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন; এই সময়ে নিত্যানন্দ আসিয়া যোগ দিলেন। যবন হরিদাস হরিনাম রসে আর্দ্র হইয়া নানাবিধ ক্লেশ ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও হরিনাম ত্যাগ না করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন; উক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায় সকলই এক জাতি, তাঁহাদের বর্ণ বিচার নাই, তাঁহারা বলিলেন "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে। শুচি হয়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে"। নিমাই সাধুবৃন্দসহ সর্ব্বদা সাধনভজনায় রত থাকিয়া ধর্ম্মরাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দরজা বন্ধ করিয়া নাম গান হইত, এখন দ্বারে দ্বারে পল্লী পল্লী ভ্রমণ করিয়া "হরিহরায় নম, গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন" এই নাম সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে লোক আসিয়া যোগ দিতে লাগিল। হরিনামের প্রবল বন্যায় নদীয়া ভাসিয়া গেল। দুর্দ্দান্ত দস্যু জগাই মাধাই পাষণ্ডদ্বয় হরিনাম শ্রবণপূর্ব্বক, সকল কুকাজ ছাড়িয়া নিমাইর বশ্যতা স্বীকারে পরম বৈষ্ণব হইল। লোক সব আশ্চর্য্য হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে হৈ

চৈ পড়িয়া গেল। শাক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী আপনাদের ধর্ম্মনাশ আশঙ্কায় গৌরাঙ্গের বিরুদ্ধাচারী হইয়া ঘোর শত্রুতা করিতে লাগিলেন, তাঁহার নির্য্যাতনের চেষ্টা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সামাজিক আচার ব্যবহার সমস্ত রহিত করিয়া বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেন। নিমাই লোক-শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া ধর্ম্মার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

গৌরাঙ্গদেব কোন এক নিশিতে স্বপ্নে দেখিলেন যেন একজন মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন "নিমাই তুমি যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছ তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ? শীঘ্র সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক নামধর্ম্ম প্রচার কর।" ইহার কিছুকাল পরে নিমাই সংসারের বন্ধন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গের স্নেহ মমতা পরিহার করিয়া একদিন গভীর নিশীথে বুদ্ধদেবের ন্যায় স্নেহময়ী বৃদ্ধা জননী, প্রেমময়ী যুবতী ভার্য্যা, প্রিয় সুহৃদ ও সহচরবর্গকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া কাটোয়ায় দণ্ডী সম্প্রদায়ের কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসী হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র নাম হইল, এবং নামের একদেশ মাত্র শ্রীচৈতন্য নামে সর্ব্বত্র অভিহিত হইলেন। কাটোয়া হইতে চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া বৃন্দাবন যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ তাঁহাকে শান্তিপুরে ভক্ত অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে লইয়া আসিলেন। সেখানে সমস্ত ভক্তবৃন্দ সহ শচীদেবী সাক্ষাৎ করিলেন। সন্ন্যাসীর স্ত্রী দর্শন নিষেধ, সেই জন্য পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সাক্ষাৎ পাইলেন না। তিনি মধুর সম্ভাষণে সকলকে আপ্যায়িত করিয়া জননীকে অনেক প্রবোধ দিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন; নিত্যানন্দ, দামোদর, মুকুন্দরাম প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত বন্ধু তাঁহার সহিত গমন করিলেন। পথে নানা স্থানে কৃষ্ণ নাম বিতরণ করিতে লাগিলেন, একে নবীন বয়স, অপরূপ লাবণ্য গৌরাঙ্গমূর্ত্তি, কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, মুখে সদাই হরিনাম, যে

দেখিল সেই মোহিত হইল! সামান্য পাটনী হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার মুখনিঃসৃত হরিধ্বনি শ্রবণে, হরিনাম করিতে লাগিল। হরি নামের কি অপার মহিমা। জগন্নাথের পথে কত লোক যে হরিনামে দীক্ষিত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। পুরীর নিকটবর্ত্তী হইলে জগন্নাথ দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি এতদূর ব্যাকুল হইলেন যে, তিনি উন্মত্তের ন্যায় দৌড়িলেন, এবং শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলে জগন্নাথ দর্শনে অনুরাগের আবেগে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইবার আশায় যেমন ধাবিত হইলেন, অমনি প্রেমে বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেবকগণ উন্মাদ বিবেচনায় বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইল; দৈবচক্রে উপস্থিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের চক্ষু এই অপরূপ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট ভাবোন্মত্ত যুবকের প্রতি ন্যস্ত হওয়ায়, তিনি সেবকদিগকে নিবারণ করিয়া স্বয়ং মূর্চ্ছাগ্রস্ত চৈতন্য দেবের চৈতন্য সম্পাদনপূর্ব্বক, নিজ ভবনে লইয়া গেলেন। গদাধর প্রভৃতি সঙ্গিগণের নিকটে সার্ব্বভৌম যখন জানিতে পারিলেন, নবীন সন্ন্যাসী নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র এবং নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, তখন পরমানন্দে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌমের নিবাসও নবদ্বীপ, তিনি স্বকীয় প্রতিভাবলে পুরীরাজের অনুগ্রহ লাভ করিয়া মহামন্দিরে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।

সার্ব্বভৌম একজন তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন দাম্ভিক পণ্ডিত ছিলেন। চৈতন্য-দেব সর্ব্বদাই কৃষ্ণনামে মত্ত থাকিতেন, বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই প্রকাশ করিতেন না। সার্ব্বভৌমের ধারণা ছিল যে, তিনি বড় বেশী কিছু জানেন না; বিশেষতঃ বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষও ছিল, সুতরাং চৈতন্যকে প্রবোধ দিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোক আবৃত্তি করেন ঃ—

আত্মারামশ্চ মুনয়োনির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

সার্ব্বভৌম চৈতন্যদেবের বিদ্যা পরীক্ষার জন্য এই শ্লোকের অর্থ করিবার

জন্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন; চৈতন্যদেব অতি বিনয় সহিত উত্তর করিলেন, "মহাশয় মহামহোপাধ্যায় আপনি ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।" বাসুদেব পাণ্ডিত্য বলে এই শ্লোকের ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব তদ্‌ব্যতীত ঐ শ্লোকের আরও অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলে পাণ্ডিত্যাভিমানী সার্ব্বভৌমের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল এবং তদবধি চৈতন্যদেবকে ঈশ্বর ভাবিয়া তাঁহার শিষ্য হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সংবাদ শ্রবণে উৎকলবাসিগণ দলে দলে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। পুরীতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের একাধিপত্য হইল, অদ্যাপি তৎ নিদর্শন সম্পূর্ণভাবে জাতিনির্ব্বিশেষে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অনেকের মতে চৈতন্যদেব হইতেই জগন্নাথ ক্ষেত্রে মহাপ্রসাদের সর্ব্বতোভাবে প্রচলন হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে এরূপ ভাব ছিল না।

ধর্ম্মপ্রচার জন্য চৈতন্যদেব একমাত্র শিষ্য কৃষ্ণানন্দ সহ দক্ষিণ দেশে গমন করিয়াছিলেন; নিত্যানন্দ প্রভৃতি অনুযাত্রিগণকে দেশে পাঠাইয়া দেন। চৈতন্যদেব রামেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া তথাকার পাণ্ডাদিগকে কৃষ্ণনামে দীক্ষিত করেন, পথিমধ্যে গোদাবরী তীরে রাজা রামানন্দ রায়কে নিজ ধর্ম্মে আনিয়া রাজমহেন্দ্রী নগরের বিধর্ম্মীদিগকে নিজ ধর্ম্মে আনয়ন করেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, দাক্ষিণাত্যে তৎকালে, জ্ঞানী, কর্ম্মী পাষণ্ড ও বৌদ্ধদলের প্রাদুর্ভাব ছিল, তাই চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার মানসে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়া বৌদ্ধদিগকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ভক্তদিগকে হরিনাম শুনাইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, বৃদ্ধকাশী, শ্রীরঙ্গক্ষেত্র, ত্রিপতিমল্ল, ঋষভপর্ব্বত, মহেন্দ্রশৈল, মলয়পর্ব্বত, অগস্ত্যাশ্রম, কন্যাকুমারী, ঋষ্যমুখ, মাহেশ্বতীপুরী, নর্ম্মদাতট, পম্পা, পঞ্চবটী ও শৃঙ্গপুরে শৃঙ্গারী মঠে গমন ও অধিবাসিগণকে কৃষ্ণ নামে দীক্ষিত করিয়া পুরীতে আগমন করেন এবং কিছু কাল তথায় বাস করিয়া

পুনরায় মহানদী পার হইয়া আহাম্মদাবাদ, জুনাগর, অমরাবতী, বরোদা, দ্বারকাতীর্থ দর্শন ও তথায় কৃষ্ণনাম বিতরণ করিয়া শ্রীহট্ট, কামরূপ, দেওঘর প্রভৃতি স্থানে স্বীয় মত প্রচার করেন। রথযাত্রা উপলক্ষে বঙ্গবাসী বন্ধু ও শিষ্যগণ পুরীতে আগমন করিয়া সাক্ষাৎ করেন; এবং তাহাদের আগ্রহে পুনরায় বঙ্গদেশে আসিয়া মাতৃদেবীর চরণ দর্শন করেন। এবারও বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী পতিচরণ দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে পুরী হইয়া পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারকার্য্যে গমন এবং কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে আপন মত প্রচার করিয়াছিলেন।

মথুরা দর্শন করিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন, এই সময় প্রত্যেক বিষয়েই চৈতন্যদেবে কৃষ্ণভাব স্ফূরিত হইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে প্রেমভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। মথুরার পুরাতন তীর্থগুলি পূর্ব্ব হইতেই বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তিনি তাহার উদ্ধার সাধন করেন; এখানে যবন সৈনিক বিজুলী খাঁকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া রামদাস নাম দিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থসকল তাঁহার প্রধান শিষ্য রূপ সনাতনকে আবিষ্কার করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ংও কতক উদ্ধার করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব জাতি বিচার না করিয়া সকলকেই হরিনামে দীক্ষিত করিতেন এবং সকলের সহিত এক সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া আহারাদি করিতেন, যবন হরিদাস বিজলী খাঁ প্রভৃতি কেহই বাদ পড়িতেন না। তিনি অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন; সন্ন্যাসীর স্ত্রী ও রাজদর্শন নিষেধ, স্ত্রীদর্শনের আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্র অসীম ক্ষমতা সত্ত্বেও এবং বাসুদেব প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকের অনুরোধেও চৈতন্য দেবের সাক্ষাৎ পান নাই; তাঁহার পুত্রকে চৈতন্য দেব আদর করিয়া হরি নাম দিয়াছিলেন, উড়িষ্যার রাজবংশ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী বটেন। হরিদাস সাধু ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল একজন স্ত্রীলোক হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া প্রভুর সেবার জন্য

ভান্ড তণ্ডুল আনিয়াছিলেন, এইরূপে স্ত্রীমুখ দর্শন করায় হরিদাসকে প্রভু বর্জ্জন করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গের অনুরোধেও হরিদাসের মুখাবলোকন না করায় হরিদাস মনোদুঃখে নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া ত্রিবেণীতে প্রাণত্যাগ করেন। ধন্য সত্য সাধন! ধর্ম্মপালনে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে অন্তিমে তাহার লয় হয়। হায়! চৈতন্য প্রভু! এরূপভাবে পাষণ্ড দলন করিয়া যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার শেষ পরিণাম ফল আজ কি হইল!

শ্রীচৈতন্যদেব উনিশ বৎসর নীলাচলে বাস করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের চিহ্ন ভারতের সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু পরিলক্ষিত হয়। ভক্তপ্রধান উদ্ধব বলিয়াছিলেন "কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণ নাম বড়"। সেই নামমাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই যেন শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। পুরুষোত্তমে বাসকালে তিনি এক পূর্ণিমা নশীথে জ্যোৎস্না বিধৌত সুনীল জলধিবক্ষ দৃষ্টে যমুনায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের জলকেলী মনে করিয়া সমুদ্রে ঝম্ফ প্রদান করেন; এক জন ধীবর জালে মৃতকল্প প্রভু দেহ পাইয়া চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিল। চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে, শেষকালে তিনি কোথায় যে অন্তর্ধান হন তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না; কিন্তু দীনেশ চন্দ্র সেন কৃত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকে প্রকাশ, ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে বা ১৪৭৫ শকাব্দায় পুরীতে একদা আষাঢ় মাসে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যদেবের পদ ইষ্টকবিদ্ধ হয়, দুই এক দিনের মধ্যেই বেদনা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে তিনি শয্যাশায়ী হন এবং সপ্তমী তিথিতে এ মর্ত্তধাম ত্যাগ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে এতাধিক আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন যে, জগন্নাথ দেবের আঙ্গিনা মধ্যে শ্রীচৈতন্য প্রভুর মূর্ত্তি রীতিমতে পূজা হইয়া থাকে।
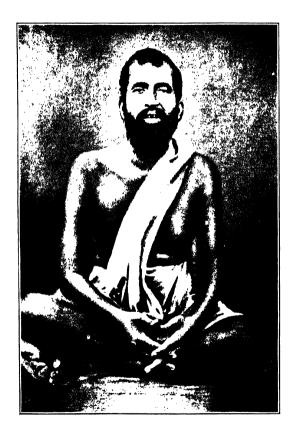
রামকৃষ্ণ পরমহংস

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী

ও

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

"শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগ স্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্।"

কলিকাতার প্রখ্যাতনাম্নী রাণী রাসমণি ভাগীরথী তীরবর্ত্তী দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে, তাঁহার সুরম্য উদ্যানে, ১২৫৯ সালে ৺কালী প্রতিমা স্থাপন করেন। দক্ষিণেশ্বর কলিকাতা হইতে ৬ মাইল উত্তর। কালী বাড়ীর পশ্চিমে গঙ্গার গর্ভে পোস্তা বাঁধা ঘাটের সোপানাবলীর চাতালের উপরেই সিংহ দরজা; উভয় পার্শ্বে দ্বাদশটী শিব মন্দির, মন্দিরের পিছনেই পুষ্পোদ্যান, দুই প্রান্তে দুইটী নহবতখানা। ভিতরে সুপ্রশস্ত আঙ্গিনা মধ্যে নবরত্ন সমন্বিত দেবীর সুদৃশ্য উচ্চ মন্দির; সম্মুখে নাটমন্দির, চতুর্দ্দিকে প্রাচীরসংলগ্ন বহু ঘর। মন্দির মধ্যে পিতল নির্ম্মিত সহস্রদল পদ্মোপরি চতুর্ভুজা মুণ্ডমালা কালী প্রতিমা; এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মূর্ত্তি কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; দর্শনেই মনে ভক্তি ও আনন্দ সঞ্চার হয়। মন্দিরের উত্তরে একটী প্রাসাদে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি। এখানে পূজা ও ভোগের আড়ম্বর আছে। আঙ্গিনার উত্তরের দরজা পার হইলেই বৈঠক খানার দালান; তৎপরেই পুরাতন পঞ্চবটী, পরমহংসদেবের সিদ্ধিস্থান। পার্শ্বেই শান্তি কুটির নামে তাঁহার বাসগৃহ। পঞ্চবটীর নিম্নেই সানের বাঁধা আসন, তদুপরি রামকৃষ্ণদেব বসিয়া সাধনা করিতেন। পূর্ব্বে এখানে শত শত লোকের সমাগমে স্থানটী সদাই আনন্দময় হইয়া থাকিত, কিন্তু এখন উহা নির্জ্জন ও সংস্কারবিহীন অবস্থায় রহিয়াছে।

হায়! সকলই কালের বিচিত্র খেলা। পরমহংসদেব এখানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং সংক্ষেপে তাঁহার জীবনী পাঠকগণের অবগতির জন্য সংগ্রহ করা গেল।

হুগলী জেলার জাহানাবাদ সবডিভিসনের অন্তর্গত কামারপুর গ্রামে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নামে শিষ্ট শান্ত এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র ও দুইটী কন্যা। জ্যেষ্ঠ রামকুমার, মধ্যম রামেশ্বর এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ ছিল। ১২১৪ সালের ফাল্গুন মাসের ১০ই তারিখ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বনাম গদাধর। বাল্যকালে তাঁহাকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু লেখাপড়া শিক্ষার প্রতি একেবারেই মনোযোগ ছিল না; অধিকাংশ সময়ই খেলা করিয়া কিম্বা কবি, পাঁচালী, যাত্রা প্রভৃতি সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বেড়াইতেন। তিনি বাল্যকালেই সঙ্গীত বিদ্যায় সুনিপুণ হইয়াছিলেন, তাঁহার গলার স্বর বড়ই মিষ্ট ছিল। রামকুমারের কলিকাতা ঝামাপুকুরে একটী চতুষ্পাঠী ছিল, তদ্দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করিতেন সংসার চালাইতেন। কিছুকাল পরে তিনি রামকৃষ্ণকে কলিকাতায় লইয়া আসেন, এই সময়ে রামকুমার দক্ষিণেশ্বর কালীর পূজারী স্বরূপে নিযুক্ত হইলেন। রামকৃষ্ণও কালীবাড়ীতেই বাস করিতেন। পরমহংসদেবের আঠার বৎসর বয়সে, জয়রামবাটী নিবাসী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সারদাসুন্দরী দেবীর সহিত বিবাহ হয়। ইহার কিছুকাল পরে রামকুমারের মৃত্যু হইলে, রামকৃষ্ণদেবই পূজকরূপে নিযুক্ত হন। এখন হইতেই তাঁহার ধর্ম্মভাবের অপূর্ব্ব স্ফূরণ হইতে থাকে। তিনি ঈশ্বরকে মাতৃভাবে পূজা করিতেন। তিনি সমস্ত ধর্ম্মের সার সংগ্রহ মানসে, কয়েকদিন মুসলমান বেশে আল্লার উপাসনা করিয়াছিলেন; খ্রীষ্টধর্ম্মের মর্ম্মাবগত হইবার জন্য গির্জ্জায় যাইয়া খ্রীষ্ট ভজনায় যোগও দিয়াছিলেন; গোপীবেশে শ্রীকৃষ্ণ প্রেম উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন; আবার কখনও

আপনাকে হনূমান কল্পনা করিয়া দাস্যভাবে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনাও করিয়াছিলেন। তিনি শৈব কি শাক্ত, বৈষ্ণব কি বৈদান্তিক কোন একটী ধর্ম্মেই লিপ্ত ছিলেন না, অথচ সকল ধর্ম্মেরই সার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের উদার ভাব ছিল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, তাঁহার নিকট হইতেই সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় ভাব গ্রহণ করিয়া নববিধান সমাজের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবটীর নিম্নে নির্জ্জনে তিনি অনেক সাধনা করিতেন। ভক্তের অধীন ভগবান। একমনে ভগবানকে সর্ব্বদা চিন্তা করিলে নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ হয়। রামকৃষ্ণদেব সমস্ত বিষয়বাসনা, টাকা পয়সা, ঘর বাড়ী এবং স্ত্রীকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া একমনে কালীদেবীর উপাসনা করিতেন, এবং অচিরেই যোগবলে তাহাতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ হয় নাই, কিন্তু তিনি যেরূপ জ্ঞানগর্ভ উপদেশসকল প্রদান করিতেন, তাহা শ্রবণ করিয়া বিজ্ঞ ও শিক্ষিত ব্যক্তিসকল চমৎকৃত হইতেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মহেন্দ্রলাল সরকার, নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিয়া উপদেশ শ্রবণ করিতেন। পরমহংসদেব কামিনী ও কাঞ্চনকে ধর্ম্ম সাধনের প্রধান অন্তরায় বলিয়া অভিমত করিতেন।

তিনি এক হস্তে টাকা ও অপর হস্তে মাটি লইয়া, মাটিকে টাকা ও টাকাকে মাটি বলিতেন; তিনি টাকা ও মাটি এই উভয়ের কিছুই পার্থক্য মনে করিতেন না। তাঁহার শরীরের কোন স্থানে টাকা স্পর্শিত হইলেই, সেই স্থান সঙ্কুচিত হইয়া যাইত। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সারদাসুন্দরী দেবীর সম্মতি গ্রহণে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কামিনীকাঞ্চনত্যাগের এরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্যই বুঝি তিনি এ মর্ত্তধামে আগমন করিয়াছিলেন। গীতাতে ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, ত্যাগ করিতে না পারিলে শান্তি লাভ হয় না।

পরমহংসদেবের মুখে নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যিনিই তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ একবার শ্রবণ করিতেন তিনিই মোহিত হইতেন। তাঁহার দর্শনলালসায় দক্ষিণেশ্বরে বহু লোকের সমাগম হইত। কথিত আছে, তোতাপুরীর নিকট তিনি যোগাভ্যাস করিয়া অধিকাংশ সময়ই সমাধিস্থ থাকিতেন। তিনি যোগীর বেশ ধারণ না করিয়া সংসারে থাকিয়াই নির্লিপ্তভাবে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। যাঁহার প্রতি তাঁহার কৃপা হইত, তিনিই উদ্ধার হইয়া যাইতেন। তাঁহার উপদেশে কত লোকের যে চরিত্র সংশোধিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি অতি সহজ ভাষায় গল্পচ্ছলে নানাবিধ উপমা দ্বারায় বেদান্ত ও পুরাণাদির নিগূঢ় তত্ত্ব সমাগত লোকসকলকে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার মনে কখনও আত্মাভিমান স্থান পায় নাই, শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার সময় তিনি নিজকে গুরু বলিয়া মনে করিতেন না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পরমহংসদেব সঙ্গীতে নিপুণ ছিলেন, অতি মধুরস্বরে গান গাইতে গাইতে কিম্বা উপদেশ দিতে, ভাবে বিভোর হইয়া সমাধিস্থ হইতেন; তখন তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পাইত। কলেজের শিক্ষিত অনেক ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে নরেন্দ্রনাথ দত্তই তাঁহার একান্ত প্রিয় শিষ্য ছিলেন। উত্তরকালে এই নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া গিয়াছেন। ১২৯৩ সনের শ্রাবণ মাসের ১৩ই তারিখ পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার চির আরাধ্য মাতৃক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর তাঁহার শিষ্যগণ স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা পরিচালিত হইয়া একটী সমাজ গঠন করিয়াছেন এবং তাহাই রামকৃষ্ণ মিসন নামে পরিচিত। রামকৃষ্ণমিসন ভারতের নানাস্থানে অনেক সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া দুঃস্থ ও পীড়িতগণের সাহায্য দান ইত্যাদি সময়োচিত কার্য্য করিতেছেন। বিবেকানন্দ স্বামী

বেলুর মঠে গুরুদেবের চিতাভস্মাস্থি, পাদুকা, শয্যা ইত্যাদি যত্নের সহিত রক্ষা করিয়াছেন। পরমহংসদেবের প্রতিমূর্ত্তির রীতিমতে পূজাদি হইয়া থাকে। তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাবের দিন মহা মহোৎসব হইয়া থাকে। একবার আমরা পরমহংসদেবের জন্মোৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম। আহিরীটোলার ঘাট হইতে সমস্ত দিন চারিখানা ষ্টিমারে সহস্র সহস্র লোক গমনাগমন করিয়াছিল, তথাপি ষ্টিমারে এরূপ ভিড় যে, অনেককে দাঁড়াইয়াই থাকিতে হইত। পরমহংসদেব ও তাঁহার প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম্মরাজ্যে এক নূতন স্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। পরমহংসদেব তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণের নিকট ঈশ্বরাবতার স্বরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

বিবেকানন্দ স্বামী

৺ পরমহংসদেবের জীবনচরিতে স্বামী বিবেকানন্দের নাম উল্লেখ না করিলে, তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। একে জ্ঞান, অপরে কর্ম্ম। পরমহংসদেবের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য স্বামীজী দ্বারায় সাধিত হইয়াছে। জনৈক কবি বলিয়াছেন, "পূর্ণব্রহ্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের যেমন পূর্ণত্ব বিকাশ হইয়াছে গীতায় অর্জ্জুনে, তেমনি, রামকৃষ্ণদেবের আংশিক বিকাশ পাইয়াছে শিষ্য বিবেকানন্দের মনীষায়।" আমেরিকার সুবিখ্যাত সংবাদ পত্রিকা দি নিউ ইয়র্ক হেরল্ড চিকাগো ধর্ম্মমেলার সময় বলিয়াছিলেন, "হিন্দুজাতির ন্যায় পণ্ডিত জাতিমধ্যে খ্রীষ্টান মিসনারী প্রেরণ করা যে নির্বুদ্ধিতার কার্য্য, স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণের পর তাহা আমি বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতেছি।" যে মহাপুরুষের বৈদান্তিক ধর্ম্মের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যায়, আমেরিকা, ইউরোপ, সিংহল ও ভারতের লোকসকল মুগ্ধ হইয়াছিলেন, আমরা এই আখ্যায়িকায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত করিলাম।

কলিকাতা সিমুলিয়া নিবাসী বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় হাইকোর্টে এটর্নি ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্র নাথ দত্ত ১২৬৯ সালে পৌষ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁহাকে বিশ্বেশ্বর বলিয়া ডাকিত। পাঠাবস্থাতে তাঁহার নাম নরেন্দ্র নাথ দত্ত ছিল। সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিয়া বিবেকানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সরল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি কুটিলতা ও হিংসা একেবারেই জানিতেন না। কলেজে উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য দর্শনাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি নাস্তিকতার দিকে কিছু অগ্রসর হইয়াছিলেন। ধর্ম্মলালসা

বলবতী থাকায় সত্য নিৰ্দ্ধারণে তিনি খ্রীষ্টধৰ্ম্ম, মোসলমান ধৰ্ম্ম, বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম, ব্রাহ্ম ধৰ্ম্মাদি পর্য্যালোচনা করিয়া, সার উদ্ধার করিতে না পারিয়া উৎকণ্ঠায় কাল যাপন করিতেন। তাঁহার একজন আত্মীয় পরমহংস দেবের শিষ্য ছিলেন, একদিন তিনি নরেন্দ্র নাথ দত্তকে রামকৃষ্ণ দেবের নিকট লইয়া যান। নরেন্দ্র নাথ দত্ত সঙ্গীত অভ্যাস করিয়াছিলেন, গলার স্বর অতি মিষ্ট ছিল, তাঁহার দুইটী গান শুনিয়া পরমহংসদেব সন্তুষ্ট হন এবং সময় সময় তাঁহার নিকট আসিবার জন্য বলেন। সেই হইতেই নরেন্দ্র নাথ দত্তের সহিত পরমহংসদেবের পরিচয় হয় এবং তাঁহার ধৰ্ম্ম জীবনের সূত্রপাত হয়। পরমহংসদেবের উপদেশে তাঁহার অন্তঃকরণে সংশয় দূর হইয়া জ্ঞানের উদয় হইল এবং হিন্দু ধৰ্ম্মের প্রতি একান্ত বিশ্বাস জন্মে। রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ মতে ইনি সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদ, উপনিষদ ও পুরাণাদি ধৰ্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া যোগশিক্ষা করেন।

পিতৃবিয়োগের পরেই নরেন্দ্র নাথ দত্তের মনে বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল। তাঁহার মাতৃদেবী বিবাহের চেষ্টা করেন কিন্তু নরেন্দ্র কোন মতেই বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন না। পরমহংসদেবের কৃপায় ও সদুপদেশে তাঁহার মনের মলিনতা দূর হয় এবং তিনি সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া সন্ন্যাস ধৰ্ম্ম গ্রহণ করেন। পরমহংসদেব দেহ ত্যাগ করিলে শিষ্যমণ্ডলী বিবেকানন্দ স্বামীকে অবলম্বনে গুরুনির্দ্দিষ্ট পথে স্থিরপ্রতিজ্ঞ রহিলেন। বিবেকানন্দ স্বামী কয়েক বৎসর হিমালয়ে বাস করিয়া যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তিব্বত ভ্রমণ করিয়া মান্দ্রাজ প্রদেশে অনেক লোককে স্বীয় মতে দীক্ষিত করেন। দুই একজন রাজাও তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। আমেরিকায় চিকাগো ধৰ্ম্মমেলায়, বিবেকানন্দ স্বামী মান্দ্রাজবাসীর অর্থসাহায্যে হিন্দুধৰ্ম্মের প্রতিনিধিস্বরূপ গমন করেন। সভাস্থলে তিনি আপন বাগ্মীতা ও অপূৰ্ব্ব যুক্তিবলে হিন্দুধৰ্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তৎশ্রবণে আমেরিকাবাসিগণ

মোহিত হইয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে হুলু স্থূল পড়িয়া গিয়াছিল; কত সভা সমিতিতে যে তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছিল তাহার অন্ত নাই। বেদান্ত ও গীতা শাস্ত্রের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া বহু খ্রীষ্টান নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দুই বৎসর আমেরিকায় বাস করত ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথায়ও বৈদান্তিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া অনেক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এখানেও কেহ কেহ তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভগিনী নিবেদিতাই প্রধান।

ইউরোপে গীতাধর্ম্মপ্রচার করিয়া তদ্দেশীয় শিষ্য সমভিব্যাহারে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। পথিমধ্যে সিংহলে তাঁহাকে মহা সমারোহে সিংহলবাসীরা অভ্যর্থনা করিয়াছিল। কলিকাতা ফিরিয়া আসিলে তিনি যেরূপ সম্মান ও সমারোহে গৃহীত হইয়াছিলেন, তেমন রাজা মহারাজাদিগের ভাগ্যেও কদাচিৎ ঘটে। তিনি কলিকাতার সন্নিকট গঙ্গাতীরে বেলুড় নামক স্থানে এক মঠ স্থাপন করিয়া গুরু রামকৃষ্ণদেবের চিতাভস্মাস্থি, পাদুকা, শয্যা ইত্যাদি সযত্নে রক্ষা করিয়া-ছেন। বেলুড় মঠের ন্যায় মান্দ্রাজ প্রদেশের সমুদ্রতটে কেমেলকার্ণল নামক এক মঠ এবং আলমোড়ার সন্নিহিত মায়াবতীতে অপর এক মঠ তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মঠে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায় দ্বারায় রীতিমত ধর্ম্মালোচনা ও নানাবিধ সদনুষ্ঠান কার্য্যাদি হইয়া থাকে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে দেহ রক্ষা করেন। তিনি দেখিতে যেমন সুন্দর ও সুশ্রী ছিলেন, সঙ্গীতেও তেমনি তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট ছিল। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, বহু ভাষাজ্ঞান, ধর্ম্মপ্রবণতা, আশ্চর্য্য গুরুভক্তি, লোকের প্রতি সদয় ও সরল ভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

নিত্যানন্দ প্রভু।

"নিত্যানন্দো ভক্তরূপো ব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধঃ।
ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ॥"

নিত্যানন্দ ঠাকুর ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে বীরভূম জেলার একচক্র গ্রামে হাড়াই পণ্ডিতের ঔরসে ও পদ্মাবতীর গর্ভে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি চৈতন্যদেবের প্রধান সহচর,—দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। চৈতন্য দেব হইতে দ্বাদশ বৎসরের বয়োধিক। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্ম্মানুরাগী ও শান্তশীল এবং বাল্যকালেই সন্ন্যাসগ্রহণে সংকল্প করিয়া মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত তীর্থভ্রমণে বহির্গত হয়েন। অবধূতবেশে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের কিছু পূর্ব্বে, নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। তাঁহার উৎকট প্রেম ও ভক্তিতে সকলে মোহিত হইতেন। হরিনাম সংকীর্ত্তনে নিতাই বড়ই আগ্রহ করিতেন; হরি নাম শ্রবণে তাঁহার স্বেদ, অশ্রু ও রোমহর্ষণ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পাইত। তাঁহার স্বভাবসুন্দর প্রকৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া গৌরাঙ্গদেব প্রধান সহচররূপে তাঁহাকে পরিগণিত করিলেন। যে সময় দল বাঁধিয়া গৌরাঙ্গদেব পল্লীতে পল্লীতে, দ্বারে দ্বারে, মৃদঙ্গাদির ধ্বনিতে মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন; যখন হরিনামের প্রবল বন্যায় নদীয়া ডুবু ডুবু হইয়াছিল; তখন জগাই মাধাই নামক দুই জন ঘোর পাষণ্ডকে নিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহারা সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া নবদ্বীপের পথে পথে বেড়াইত ও নিরীহ বৈষ্ণবদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিত। ইহাদের ভয়ে কুলনারীগণ পর্য্যন্ত পথে বাহির হইতে ভয় পাইত। উহারা পরস্বাপহরণ,

মিথ্যাকথন, পরপীড়নে কিছু মাত্র শঙ্কা বোধ করিত না। নিত্যানন্দ সেই দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডদ্বয়কে হরিনাম প্রদান করিয়া উদ্ধারের জন্য বড়ই উৎসুক হইলেন। প্রথমে ইঁহার উপদেশে পাষণ্ডেরা উপহাস করিত, পরে যথার্থ ই নিত্যানন্দের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। একদিন নিত্যানন্দ ঠাকুর হরিসংকীর্ত্তন করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে পাষণ্ডদ্বয় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আক্রমণ করিল; নিতাই তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া একমনে কেবল হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মাধাই ক্রোধে নিতাইএর মস্তকে ভগ্ন কলসীর কাণা ফেলিয়া মারিল, মাথা ফাটিয়া দরদরধারে রুধির পড়িতে লাগিল; সংবাদ পাইয়া গৌরাঙ্গদেব তথায় আসিলেন, সকলেই হরি-সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের আঘাতের প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই। জগাই মাধাইকে ঘেরিয়া চতুর্দ্দিকে কেবল হরি বল, হরি বল শব্দ হইতে লাগিল; নিত্যানন্দদেবের প্রেমে পাষণ্ডদ্বয় স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহাদের পাষাণ হৃদয় দ্রব হইল, ভগবানের নাম শ্রবণে তাহাদের দুই চক্ষু হইতে জলধারা বহিতে লাগিল। হরিনামের মাহাত্ম্যে, প্রভুর কৃপায়, উহারা পূর্ব্ব-স্বভাব পরিত্যাগে পরম ভক্ত বৈষ্ণবরূপে পরিণত হইল। ধন্য নিতাই! তোমার অপূর্ব্ব প্রেমমহিমা! প্রভু আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও শত্রুপরি ক্রোধ না করিয়া নিজ শক্তিবলে ঘোর পাষণ্ডদ্বয়কে উদ্ধার করিলেন। তুমিই ধন্য! জগতে প্রেম শিক্ষার অভূতপূর্ব্ব আদর্শ।

চৈতন্যদেব পুরীতে গমন করিলে তাঁহার অনুমতিক্রমে নিতাই দেশে আসিয়া হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট বহু সহস্র লোকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। সপ্তগ্রামের সমস্ত বণিক্ সম্প্রদায় তাঁহারই শিষ্য। নিত্যানন্দ প্রভু বঙ্গদেশে হরি নামের প্রবল তরঙ্গ উত্থিত করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব যেমন সংসার পরিত্যাগান্তে জনগণকে হরিনাম শিক্ষার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন,

নিত্যানন্দঠাকুর আবার তদ্‌বিপরীতে হরিনাম কীর্ত্তনের উপদেশ দিবার জন্যই সন্ন্যাস পরিত্যাগে গৃহীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি পুত্র-শোকাতুরা চৈতন্য-জননী বৃদ্ধা শচীদেবীর গৃহে পুত্রস্বরূপ অবস্থিতি করিতেন। ইঁহার আগমনে নদীয়া পুনরায় হরিনামের মহারোলে জাগিয়া উঠিল। সমস্ত বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে নিত্যানন্দসহিত যোগ দিলেন। নিত্যানন্দ নবদ্বীপের নিকটস্থ শালিগ্রামের সূর্য্যদাস পণ্ডিতের বসুধা ও জাহ্নবী নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর তিনি খড়দহগ্রামে বাসভবন প্রস্তুত করিলেন, জাহ্নবীনাম্নী পত্নীর গর্ভে তাঁহার বীরভদ্র নামে পুত্রসন্তান ও গঙ্গানামে এক কন্যা জন্মিয়াছিল। খড়দহের গোস্বামীবংশ বীরভদ্রের বংশধর এবং বলাগড়ের গোস্বামীগণ গঙ্গাদেবীর গর্ভের দৌহিত্র সন্তান। চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের পর নিত্যানন্দ ঠাকুর দেহত্যাগ করেন। তাঁহার ন্যায় প্রেমিক দুর্লভ।

অদ্বৈত প্রভু।

নদীয়া জেলায় শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য নামে একজন কৃষ্ণভক্ত মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি চৈতন্যদেব হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। চৈতন্যদেবের জন্মের বহুপূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্য ভাববাদীর ন্যায় বলিতেন, "নবদ্বীপে যিনি জন্মগ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহার অনুচর হইব"। যিশুখৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বেও ভাববাদীরা তাঁহার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাকে পাশ্চাত্য জগতের "জন দি ব্যাপ্‌টিষ্টের" সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহার জন্ম সনের কোন নিদর্শন নাই, বৈষ্ণবদিগের পর্ব্বদিনে দেখা যায় ইনি মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে ইনি শিবাবতার বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহাকে একান্ত কৃষ্ণভক্ত বলিয়া দেখা গিয়াছে; সর্ব্বদা ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ করিতেন, গোপনে নাম সংকীর্ত্তন করিতেন। তৎকালে তান্ত্রিকের ভীষণ অত্যাচারে বৈষ্ণবকুল সদা শঙ্কিত থাকিতেন। চৈতন্যদেব গয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রথমে ইঁহার বাটীতে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেন, পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে অদ্বৈতাচার্য্যও সংসারের মায়া বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহারই অনুচর হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ইনি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ইঁহার আটটী পুত্র ছিল, তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ অচ্যুতই পিতার ন্যায় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, অপর সাত পুত্র যথেচ্ছাচারী ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণভক্তিবলে নবদ্বীপে চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রভুর পরেই আসন লাভ করিয়াছিলেন এবং দেহত্যাগের পর নবদ্বীপবাসিগণ তাঁহাদের তিন জনেরই দারুময়মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন, অদ্যাপি যথানিয়মে মূর্ত্তিত্রয়ের সেবাদি হইয়া থাকে। শান্তিপুরের অধিকাংশ গোস্বামীগণই অদ্বৈত প্রভুর বংশধর। অদ্বৈত প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদনগোপাল নামে কৃষ্ণদেবের মূর্ত্তি শান্তিপুরে সংস্থিত আছে এবং রাসপর্ব্বোপলক্ষে বিশেষ জাঁকজমক হইয়া থাকে।

শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী।

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং
নশ্বরং জগদিদমবধারয়॥

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "কামিনী কাঞ্চন" ধর্ম্ম সাধনের প্রধান অন্তরায়। যাঁহারা সাধুজীবন লাভ করিয়া মহাপুরুষ হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকেই এই দুইটী লোভজনক আকর্ষণ হইতে দূরে থাকিতে দেখা গিয়াছে। এই ত্যাগের জলন্ত উদাহরণ প্রদর্শনার্থেই বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের অন্যতর কারণ। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত, উচ্চ সম্মানে সম্মানিত, বাল্যাবধি সুখে লালিতপালিত, বিদ্যা ও বুদ্ধিবত্তায় গর্ব্বিত হইয়া কিরূপে ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, মান, সম্মান, পরিত্যাগে নির্লোভ, প্রেমিক, নিরভিমান ও সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া ঈশ্বরারাধনা করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থে আমরা উপরোক্ত মহাত্মাদ্বয়ের সংক্ষেপ জীবনীর অবতারণা করিলাম।

পঞ্চদশ শতাব্দিতে বঙ্গেশ্বর নবাব সৈয়দ হুসেন সাহের রাজত্ব সময়ে, কুমার দেব নামক একজন ভরদ্বাজ গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ নৈহাটী গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার আদি পুরুষ রূপেশ্বর দেব ভ্রাতৃবিরোধে কর্ণাট হইতে তাড়িত হইয়া গৌড়েশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ স্বীয় প্রতিভাবলে রাজার মন্ত্রিত্বপদ লাভ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে নৈহাটীতে বাস করেন। পদ্মনাভ কুমার দেবের পিতামহ। কুমার দেব অতি শান্ত ও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, তাঁহার পত্নী রেবতী দেবীর গর্ভে সনাতন, রূপ ও বল্লভ নামে তিন পুত্র জন্মে। বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত

আছে, সনাতন ১৪১০ ও রূপ ১৪১১ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সনাতন ও রূপের পিতৃদত্ত নাম যথাক্রমে অমর ও সন্তোষ ছিল। ইঁহারা উভয়েই বাল্যকালে চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তদানীন্তন রাজভাষা পারসী বিদ্যায়ও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যশঃ সৌরভ বঙ্গেশ্বর সৈয়দ হুসেন সাহের শ্রুতিগোচর হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন; এবং উভয়ের বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া সনাতনকে 'সাকর মল্লিক' ও রূপকে 'দবির খাস' উপাধিতে ভূষিত করিয়া মন্ত্রিত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

বঙ্গেশ্বরের মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত হইয়া ইঁহারা অত্যাচারী হইয়াছিলেন এবং নানা উপায়ে প্রভূত ধন ও সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পিতামহ ও গৌড়েশ্বরের মন্ত্রিত্বে বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন সুতরাং বিদ্যা, সম্মান, অর্থ কিছুরই তাঁহাদের অভাব ছিল না। এই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণে ভারতের নানা স্থানে মধুর হরিনাম বিলাইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। ধনী নির্ধন, ছোট বড়, সৎ অসৎ, পণ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, হিন্দু মোসলমান সকলে যখন নাম সুধা পান করিবার নিমিত্ত আকুল হইয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্যদেবমুখনিঃসৃত সুমধুর কৃষ্ণনাম শুনিয়া অতর্কিতভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল, তখন সেই উচ্চ পদাধিষ্ঠিত ভ্রাতৃদ্বয়ের কর্ণেও শ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা পঁহুছিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক ভাব ও গুণগরিমা শ্রবণে রূপ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করিয়াও বাজে কার্য্যানুরোধে অকৃতকার্য্য হইয়া আপন মনোভাব শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট পত্র দ্বারায় জ্ঞাপন করাইলে তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতেই রূপের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। বৈরাগ্য না জন্মিলে ত্যাগের দর্শন লাভ হয় না, এবং ত্যাগ না করিতে পারিলে শান্তিলাভ হয় না। যখনই প্রকৃত শান্তি হইবে তখনই ভগবদ্দর্শন হইবে ইহা আপ্তবাক্য।

একদিন নিশীথে নবাব দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য রূপের নামে আদেশ আসিল। রজনী গাঢ় অন্ধকার, উপর হইতে মূষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, চতুর্দ্দিকে প্রবল বায়ু বহিতেছে, বিদ্যুৎ চমকিতেছে, মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, এরূপ ভীষণ সময়ে রূপ শিবিকারোহণে গমন করিতেছেন, পথিমধ্যে একহাঁটু জল, বেহারাগণের পদশব্দে শপ্, শপ্ করিতেছে। পথিপার্শ্বে একখানি জীর্ণ কুটীরে এক ফকীর সস্ত্রীক বাস করিত। ফকীরের স্ত্রী ঐ শব্দ শ্রবণে হিংস্র জন্তুর আগমন সম্ভাবনায় স্বামীকে ভীতিবিহ্বলচিত্তে কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ফকীর বলিল ইহা কোন হিংস্র জন্তু অথবা অন্য পশুর শব্দ নহে, এরূপ দুর্য্যোগমধ্যে শৃগাল কুক্কুরও ঘরের বাহির হয় না। বোধ হয় কোন রাজকর্ম্মচারী পাদসাহার আদেশে গমন করিতেছে। ফকীরের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে রূপের লুপ্ত বৈরাগ্য যেন সহসা জাগিয়া উঠিল; চাকুরী, পরাধীনতার প্রতি ধিক্কার জন্মিল, মনে হইল, আমি অর্থলোভে পরপদসেবী হইয়া ঘৃণিত পশু হইতেও অধম হইয়াছি। যদি এ ভাবে জগদীশ্বরের নাম গ্রহণ করিতে পারি তবে জীবন সফল হইতে পারে। এই চিন্তা করিতে করিতে রূপ নবাব দরবার হইতে আসিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া সমস্ত বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের চরণপ্রান্তে শরণ লইলেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার আদেশে বৃন্দাবনে গমন করিয়া কঠোরভাবে ধর্ম্মসাধনা করিতে লাগিলেন।

সাধনার বলে রাগ, দ্বেষ, অভিমান, সমস্ত দূর হইয়া গেল, তিনি ভিক্ষুর আদর্শজীবন লাভ করিলেন। কথিত আছে, একজন দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত তাঁহার সহিত বিচার করিবার জন্য সমাগত হইলে তিনি বিনা বিচারেই জয়পত্র লিখিয়া দিলেন। কিন্তু রূপের শিষ্য জীব গোস্বামী গুরুর অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া বিচারে দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করিলেন। রূপ গোস্বামী তাহা শ্রবণ করিয়া জীবকে তিরস্কার

চ্ছলে বলিলেন, বৈষ্ণব হইয়াও তোমার জয়, পরাজয়, সম্মান, অপমান বোধ, দূর হইল না।

শ্রীরূপ গোস্বামী বৈরাগী হইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলে সনাতন পূর্ব্বমতই রাজার মন্ত্রিত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি আপন বাটীর পরিসর বৃদ্ধি করিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের বসতির কতক অংশ গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ বহু অনুনয় বিনয় করিয়াও সনাতনের দয়ার উদ্রেক করিতে না পারিয়া নিরুপায় হইয়া বৃন্দাবনে যাইয়া রূপ গোস্বামীর শরণাপন্ন হইলেন, রূপ সমস্ত শ্রবণ করিয়া সনাতনকে "য—রী, র—লা, ই—রং, ন—য়," এই আটটি অক্ষরযুক্ত একখান পত্র দিলেন। সংস্কৃতাভিজ্ঞ সনাতন এই কয়েকটী বর্ণদ্বারায় যে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রস্তাবের শীর্ষদেশে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকের অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহারও বৈরাগ্যভাব প্রজ্বলিত হইল। তিনি ব্রাহ্মণের বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে প্রভূত অর্থ প্রদান করিলেন এবং রাজকার্য্য পরিহার জন্য বিষয়ে অমনোযোগী হইলেন। গুণগ্রাহী নরপতি সনাতনের ঔদাস্য দর্শনে স্বয়ং প্রবোধ দিবার জন্য সনাতনের বাটীতে আসিয়া নানারূপে বুঝাইলেন কিন্তু সনাতন বিষয়ে মনোনিবেশ না করায় তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন।

যৎকালে উড়িষ্যারাজের সহিত নবাব সাহেবের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন নবাব সাহেবের অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ পাইয়া, কারারক্ষীকে বহু অর্থে বশীভূত করিয়া ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, মায়া, সম্ভ্রম, সমস্ত বিষয় তুচ্ছ করিয়া এক মাত্র হরিনাম সার করিয়া সনাতন বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট গমন করিলেন। মহাপ্রভু সনাতনের আগমনে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া দীক্ষিত হইতে বলিলেন। সনাতন ভিক্ষা করিয়া একখানি জীর্ণ বস্ত্র আনিয়া পরিধান করিলেন, আপনার ভগ্নীপতি শীতনিবারণ জন্য যে শাল,

কম্বল দিয়াছিলেন তাহাও পরিত্যাগ করিলেন এবং অতি দীনবেশে ভিক্ষা করিয়া কোন রূপে উদর পরিতোষ করিতেন এবং সর্ব্বদা হরিনাম জপ ও ধর্ম্ম গ্রন্থাদি রচনায় দিন কর্ত্তন করিয়া বৈরাগীর আদর্শ জীবন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

বৃন্দাবনে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর যত্নেই লুপ্ত তীর্থ সকলের উদ্ধার হইয়াছিল। বৃন্দাবনের প্রধান প্রধান দেবালয় সকল তাঁহাদের দ্বারাই স্থাপিত হইয়াছিল, অম্বরাধিপতির অর্থে গোবিন্দ জিউর পুরাতন মন্দির রূপ সনাতনের কর্ত্তৃত্বে প্রস্তুত হইয়া বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছিল এরূপ জনশ্রুতি আছে। ইঁহারা উভয় ভ্রাতাই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। সনাতন কৃত বৃহদ্ভাগবৎ, হরিভক্তিবিলাস, বৈষ্ণবতোষিণী টীকা ; এবং রূপ গোস্বামীর রচিত ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, মথুরামাহাত্ম্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থসকল বঙ্গ সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে। বৃন্দাবনে তাঁহাদের দৈববলের অনেক গল্প শুনা যায়। যাত্রিগণ ভক্তির সহিত তাঁহাদের সমাধি অদ্যাপি দর্শন করিয়া থাকে। ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সনাতন গোস্বামী এবং ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে লীলা সম্বরণ করিয়া বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

সাধক রামপ্রসাদ।

"আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নয় শঙ্করী॥"

শাস্ত্রে জঙ্গমতীর্থ নামে একটী সংজ্ঞা আছে। নির্ম্মল শাস্ত্রজ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞানানুসারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান, উপদেশানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান, সাধু জীবনের আদর্শ ও তাঁহাদের ঈশ্বরভাব প্রণোদনকারী উদ্দীপক বাক্য বা সঙ্গীতাদি দ্বারা মানব মনের মালিন্য দূর হইয়া থাকে; এই জন্যই এ সকলকে জঙ্গমতীর্থ নামে আখ্যাত করা হয়। অনেক সময় দেখা যায়, দশটি শাস্ত্রবচন শ্রবণে মনে যে ভাবের উদয় না হয়, ভাবপ্রবণ ঈশ্বর প্রেমোদ্দীপক একটী সঙ্গীতেও মনের ভাব ততোধিক বৃদ্ধি করিয়া দেয়। তাই অদ্য আমরা এই তীর্থ বিবরণে সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের নাম সন্নিবেশিত করিলাম। রামপ্রসাদ সেন সঙ্গীতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার শ্যামা-সঙ্গীত মালসী প্রভৃতি বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ সকলেরই নিকট আদরের সঙ্গীত। গানের বৈঠকে অনেকে রামপ্রসাদের কালী-সঙ্গীত শুনিবার জন্য গায়ককে অনুরোধ করেন, এবং একাগ্রমনে তৎশ্রবণে ভাব-লহরীতে মগ্ন হইয়া যান। রামপ্রসাদ অহৈতুকী ভক্তির বলে একমাত্র সঙ্গীতদ্বারাই মহামায়ার আরাধনা করিয়া সিদ্ধপুরুষ হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গীত মনোযোগসহকারে শ্রবণ কি পাঠ করিলে, তিনি যে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে সেই পরমাপ্রকৃতি বিশ্বজননী শ্যামা মাকে সর্ব্বত্র পরিদর্শন করিতেন ও তাঁহাতেই মগ্ন থাকিতেন ইহাই পরিলক্ষিত হয়। তাই সাধনরাজ্যে রামপ্রসাদের সঙ্গীত এত উচ্চ স্থান পাইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণায় মহাবীর অর্জ্জুন যেমন জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে

বিশ্বনাথের অনন্ত বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, সাধকপ্রবর রামপ্রসাদও শ্যামা মায়ের জগৎব্রহ্মাণ্ডব্যাপীরূপ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে স্থাবর জঙ্গম প্রাণীরূপে সর্ব্বত্র সমভাবে পরিদর্শন করিয়া মনের অন্তস্তল প্রদেশ হইতে ভাবপ্রবণ সঙ্গীত স্রোতপ্রবাহে বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছেন। তীর্থ ভ্রমণে যেমন পাপক্ষয় হয়, রামপ্রসাদ সেনের সঙ্গীতের ভাবে বিভোর হইতে পারিলেও মনের মলিনতা দূর হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, এই মহা পুরুষের স্মৃতিরক্ষার জন্য বাঙ্গালী উদাসীন।

১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে কুমারহট্ট বর্ত্তমান হালিসহর গ্রামে বৈদ্য বংশে ৺রামপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। তাঁহার সাধনার পঞ্চমুণ্ডি আসনের কিয়দংশ স্থান ভিন্ন বাসস্থানের অন্য কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। পিতার যত্নে শিশুকালেই তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যেই তাঁহার কবিত্ব শক্তি বিকাশ পাইয়াছিল। তন্ত্রোক্ত কৌলাচার ধর্ম্মেই তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সংসার প্রতিপালনের সমস্ত ভার তাঁহার স্কন্ধে পতিত হইয়াছিল।

রামপ্রসাদ কলিকাতার কোন ধনীগৃহে সামান্য মুহুরী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে সর্ব্বদাই ভাবলহরী উঠিত, এবং সময় পাইলেই শ্যামা বিষয়ক গীত রচনা করিয়া হিসাবের খাতায় তাহা লিখিয়া রাখিতেন। একদিন তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ইহা দেখিতে পাইয়া প্রভুর প্রিয়পাত্র হইবার মানসে ঐ খাতা তাঁহার প্রভুকে দেখাইলেন। গুণগ্রাহী; সদাশয় প্রভু খাতার প্রথমেই "আমায় দেও মা তবিলদারী" ইত্যাদি গীত দৃষ্টে সমস্ত গীতগুলি ক্রমে ক্রমে পাঠ করিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং রামপ্রসাদকে ডাকাইয়া আনিয়া অতি মিষ্ট বচনে বলিলেন, "আমি তোমার মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দিলাম, তুমি নির্বিঘ্নমনে বাটী বসিয়া শ্যামা সঙ্গীত রচনা কর"। তদবধি তিনি বাটীতে থাকিয়া

সর্ব্বদা শ্যামা মায়ের ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া নির্লিপ্তভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। নদীয়ার গুণগ্রাহী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের সঙ্গীতে সাতিশয় প্রীত হইয়া একশত বিঘা ভূমি নিষ্কর প্রদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, নবাব সিরাজউদ্দৌলাও রামপ্রসাদের সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ শ্যামা মায়ের সাক্ষাৎ দর্শন না পাইলেও কন্যারূপে দেবীকর্ত্তৃক ঘরের বেড়া বাঁধা, মাঘ মাসে কচি আম ও পনামাছের সাধের অম্বল খাওয়ান, জনৈক স্ত্রীলোকের রূপ ধারণ করিয়া কাশী যাইয়া রামপ্রসাদের অন্নপূর্ণা দেবীকে সঙ্গীত শ্রবণ করান ইত্যাদি অনেক অলৌকিক জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। শেষ জীবনে তিনি যোগাভ্যাস করেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বায়ান্ন বৎসর বয়সে কালীপূজার পর দেবীর প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে রামপ্রসাদ ভাগীরথীর জলে অবগাহন করিয়া "দক্ষিণান্ত হয়েছে" এই কথাটী বলিয়াই যোগবলে ব্রহ্মরন্ধ্রপথে প্রাণবায়ু বহির্গত করিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন।

পরিশিষ্ট

বারাণসী দৃশ্য।

কাশী।

"বারাণস্যাং বিশালাক্ষী দেবতা কালভৈরবঃ।
মণিকর্ণীতি বিখ্যাতা কুণ্ডলঞ্চ মমশ্রুতেঃ॥"
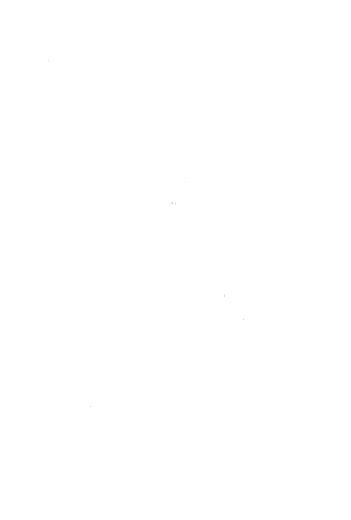
আমরা গয়ার কার্য্য শেষ করিয়া সাহেবগঞ্জ ষ্টেশন হইতে ই, আই, রেল যোগে কাশী রওনা হইলাম। বঙ্গদেশ হইতে কাশী যাইতে হইলে সাহেবগঞ্জ ষ্টেশন না হইয়া যাইবার অন্য পথ নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সাহেবগঞ্জ গয়ার ষ্টেশন, সুতরাং কাশী যাত্রিগণের এখানে নামিয়া গয়া-কার্য্য সমাপনান্তে যাওয়াই সঙ্গত। সাহেবগঞ্জ হইতে কাশী ২১৭ মাইল। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ২।৩ পাই। কলিকাতা হইতে ৪২৯ মাইল, ভাড়া ৪।৵০ আনা। মোগলসরাই নামক স্থানে গাড়ী বদলাইয়া আউড্ রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে উঠিতে হয়। কাশীর পূর্ব্ব প্রান্তে রাজঘাট ও পশ্চিমে বেণারস কেণ্টন্‌মেণ্ট নামক দুইটি ষ্টেশন, যাহার যেমন সুবিধা তদনুসারে নামিতে পারেন। ষ্টেশনে পাল্কীগাড়ী ও এক্কাগাড়ী দ্বিবিধ যানই পাওয়া যায়; এক্কাগাড়ীর সংখ্যাই পশ্চিমাঞ্চলে সমধিক। আট আনা দিলেই বাঙ্গালীটোলা গাড়ীতে যাওয়া যায়। অধিকাংশ বাঙ্গালী যাত্রীই তথায় যাইয়া বাস করেন।

কাশী হিন্দুদিগের অতি প্রাচীন তীর্থ। এখানে জীবগণ শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইয়া মুক্তি পাইয়া থাকে। এইজন্যই ইহাকে অভিমুক্ত বারাণসী ক্ষেত্র বলে। কাশীর পূর্ব্ব প্রান্তে পূতসলিলা ভাগীরথী উত্তরবাহিনী; দুই প্রান্ত দিয়া অসি ও বরুণা নদীদ্বয় ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে; ইহা হইতেই বারাণসী নামের সৃষ্টি হইয়াছে। কথিত আছে, এই নগরী সত্যযুগে শিবের ত্রিশূলের

উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা পৃথিবী হইতে পৃথক; ইহা কৈবল্যধাম। শাস্ত্রে লিখিত আছে, কাশীতে মৃত্যু হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। ইহার পরিমাণ পঞ্চ ক্রোশ। শাস্ত্রের বচন বিশ্বাস করিয়াই সহস্র সহস্র লোক কেবল মরিবার জন্যই এখানে আসিয়া বাস করেন।

মোগলসরাই হইতে কাশীর পথে বারাণসীর সেই বিশ্ববিমোহিনী চমৎকার স্বর্গীয় শোভাদৃষ্টে মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ রসের সঞ্চার হয়। সম্মুখে রজতধবল পুণ্যসলিলা ভাগীরথী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রাতঃ-সূর্য্য কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া কল্ কল্ নাদে পবিত্র নগরীর পাদদেশ ধৌত করিয়া চঞ্চল-তরঙ্গ-শিশুগুলি চঞ্চল বাতাসের সহিত যেন ক্রীড়া করিতেছে। তটভূমে শত শত দেবালয়ের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়াসকল নীলাম্বরে ন্যস্ত রহিয়াছে। বেণীমাধবের ধ্বজার উত্তুঙ্গ মিনারদ্বয় হিন্দু বিদ্বেষী মোগল সম্রাটের আদেশে মসজিদে পরিণত হইয়া অদ্যাপি প্রাচীন স্থপতি কার্য্যের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। নবোদিত অরুণের কিরণমালায় শত শত মন্দির ও সৌধরাজির নির্ম্মল ধবল ছবি স্বচ্ছসলিলা গঙ্গাম্বুতে প্রতিফলিত হইয়া যেন আর একটি সুরপুরী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। গঙ্গার বক্ষোপরি সুবিস্তীর্ণ ডফরিণ ব্রিজ। সেতু পার হইলেই ষ্টেশন, নিকটে ধর্ম্মশালা। পাকা রাস্তা দিয়া দুই মাইল যাইলেই দেব মন্দির ও তীর্থ স্নান ঘাট। কাশীতে যত দেবালয় আছে অন্য কোন তীর্থে তত দেখা যায় না। দেব মূর্ত্তির মধ্যে শিব মূর্ত্তিই অধিক। কাশীর রাস্তাগুলি বড়ই সঙ্কীর্ণ, বাজার কি গলি মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে যাত্রীদিগকে সহজে ভ্রমে পতিত হইয়া দিশেহারা হইতে হয়। কেননা গলিগুলি ও দালানাদি দেখিতে প্রায় একরূপ। সহরের ভিতর ৪।৫টি বড় ও প্রশস্ত সড়ক আছে, এতদ্‌ভিন্ন সমস্তই ছোট ছোট গলি, উচু নীচু হইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া দুই তিনটা একত্রে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। রাস্তাগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত, দুইধারে দ্বিতল, ত্রিতল এবং চৌতালা বাটী পরস্পর সম্মিলিত; ছাদে না

উঠিলে নির্ম্মল বায়ু সেবনের উপায় নাই। ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ নিতান্ত বিরল; দালানের ছাদ, থাম্বা, চৌকাট ইত্যাদি প্রস্তর চিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে বাঙ্গালী ও মহারাষ্ট্রী অধিবাসীর সংখ্যা অধিক; আমরা যে কয়েকবার গিসিয়াছিলাম বাঙ্গালীটোলাতেই বাস করিয়াছি।

যাঁত্রিগণ কাশীতে আসিয়া পাণ্ডার বাটীতেই থাকিতে পায়, কেহ ইচ্ছা করিয়া পৃথক বাটী ভাড়া করিয়াও থাকিতে পারেন, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন বাটী ভাড়া সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, লোকাধিক্যই ইহার কারণ। পূর্ব্বে হিন্দুস্থানী পাণ্ডাগণের ভীষণ অত্যাচার ছিল, এখন সেরূপ নাই। অনেক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণও পাণ্ডার কার্য্য করিয়া থাকেন। বাসিন্দা হইলেই এই কার্য্য করিতে পারেন। যাত্রাওয়ালা ও গঙ্গাযাত্রী নামে দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, নূতন যাত্রীরা কোন মতেই তাঁহাদের হাত এড়াইতে পারেন না। গঙ্গাযাত্রীরা ভাগীরথী তটে বড় বড় ছত্রের নিম্নে বসিয়া যাত্রীদিগের স্নান-তর্পণাদি মন্ত্র পাঠ করাইয়া দক্ষিণা পাইয়া থাকেন। যাত্রাওয়ালা-দিগের প্রধান কার্য্য বারাণসী ক্ষেত্রে যত দেবালয় তীর্থঘাট ইত্যাদি আছে তাহা যাত্রীদিগকে দেখাইয়া দেওয়া, বস্তুত ইহারা বিশ্বস্ত পরিচিত সহচরের ন্যায় যাত্রীদিগকে সর্ব্বদা সহায়তা করিয়া থাকে। ইহাদের দক্ষিণা ১/০ আনা হিসাবে দিতে হয়। পাণ্ডার বাটীতে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ, কুমারী পূজা, দণ্ডী ভোজন, ব্রাহ্মণ ভোজন, সধবা ভোজন, দান দক্ষিণা ইত্যাদি করিতে হয়। দেবতা মন্দিরে যাত্রিগণ আপন স্বেচ্ছামত ভোগ পূজা ও দানাদি করিতে পারেন, তথায় বাঁধা বাঁধি কোন নিয়ম নাই।

কাশীতে আসিয়া চক্রতীর্থ, মণিকর্ণিকা ও ভাগীরথীতে স্নান তর্পণ; বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা দর্শন পূজন; ঢুণ্ডীরাজ গণেশজী, দণ্ডপাণি, কাল ভৈরব, মহেশ্বর, মহাবিষ্ণু, শীতলাদেবী, দুর্গাদেবী, কেদারেশ্বর, বেণীমাধবজিউ প্রভৃতি দেব দর্শন; সন্ন্যাসী, মহাত্মা সাধুগণের দর্শন; কুমারী ভোজন, দণ্ডী ভোজন, ব্রাহ্মণ ভোজন, দান ও সাধ্যমত দেবতা,

ব্রাহ্মণ ও অতিথিদিগের তৃপ্তিসাধন করাই প্রধান কার্য্য। এখানে কখনও কাহার সহিত কলহ, অসৎ ব্যবহার,প্রবঞ্চনা করিতে নাই; কোনরূপ পাপ কার্য্য মনেও স্থান না দিয়া সর্ব্বদা ভগবান চিন্তায় সময় কর্ত্তন করাই ধর্ম্ম কার্য্য।

আমরা বাঙ্গালীটোলাতে বাসা করিয়াছিলাম, দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান তর্পণাদি করিয়া প্রথমেই দেবী অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বর দর্শনে গেলাম। ঘাট হইতে মন্দিরের দ্বার পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই পুষ্প, বিল্বপত্র ও ফুলের মালা পাওয়া যায়। রাস্তার দুইধারে দোকানীরা আপন আপন পণ্য-বীথিকায় নানাবিধ মনোহারী দ্রব্য, কাশীর প্রস্তুতি তৈজস, বস্ত্র, মিঠাই, কাঠের কৌটা, পূজার দ্রব্য ও উপকরণাদি, সাজাইয়া রাখিয়াছে। এখানে অনবরত যাত্রীসমাগমে ও খরিদ বিক্রয়ে সর্ব্বদাই লোকের ভিড়। পথের দুই পার্শ্বে দুঃখী কাঙ্গালিগণ ভিক্ষার লালসায় সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কাপড় পাতিয়া বসিয়া থাকে। কাশীতে দুঃখী কাঙ্গালীর সংখ্যা অত্যধিক; ইহারা ভিক্ষা দ্বারা ও ছত্রাদিতে অন্ন প্রাপ্ত হইয়া উদর পোষণ করতঃ অন্নপূর্ণা দেবীর নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

কাশীতে রাজা, মহারাজা, জমিদার ও পুণ্যাত্মা ধনিগণের বহুতর অন্নছত্র ও মঠ আছে; তাহাতে প্রতিনিয়ত শত সহস্র লোকের অন্ন বিতরিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ছত্রেই বিগ্রহ স্থাপিত আছেন, পূজা অন্তে ভোগ হইলেই প্রথম উপস্থিত ব্রাহ্মণ ভোজন, তৎপর দীন দুঃখী কাঙ্গালিগণের আহার হয়। এখানে কেহই অভুক্ত থাকিতে পারে না। কাশীর প্রধান প্রধান দেবমন্দির ও স্নানের ঘাট এবং দর্শনীয় স্থানগুলির বিষয় সাধারণের অবগতির জন্য পৃথক্‌ভাবে কিছু কিছু লিখা গেল, ইহাতে একটী যাত্রীরও যদি উপকার হয় তবে শ্রম সার্থক মনে করিব।

অন্নপূর্ণার বাড়ী—সড়ক হইতে সঙ্কীর্ণ গলিপথে অন্নপূর্ণার মন্দিরে যাইতে হয়। গলীর সম্মুখেই সিংহদ্বার, তথায় ঢুণ্ডীরাজ গণেশজিউর বিরাট মূর্ত্তি, তিনিই পুরীর রক্ষক। সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে পুষ্প, বিল্বপত্র ও

একটী পয়সা দক্ষিণা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। অপরিসর পথের দুইধারে কাঙ্গালিগণ বসিয়া আছে, যাত্রিগণের অনবরত গমনাগমনে সঙ্কীর্ণ পথ আরও সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া এই জনতা ভেদ করিয়া যাওয়া আরও দুরূহ। দেবদর্শনকারিগণ মধ্যে রমণীগণের সংখ্যাই অধিক। সিংহদ্বার পার হইয়া কয়েক হাত অগ্রসর হইলেই অন্নপূর্ণার প্রাঙ্গণ। একটী ক্ষুদ্র দ্বারপথে ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকেই দ্বিতল অট্টালিকা। নিম্নের তিন দিকের বারান্দায় হিন্দুস্থানী ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ চণ্ডী, গীতা, ভাগবত ইত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রতিদিন সকাল বেলায় পাঠ করিয়া থাকেন।

পশ্চাৎদিকের একটী বারান্দায় বড় বড় কপিলা গাভীসকল পূজার দুগ্ধের জন্য প্রতিপালিত হইতেছে। উপরের একটী বড় ঘরে সুবর্ণ নির্ম্মিত অন্নপূর্ণা দেবী শিবঠাকুরকে অন্ন ভিক্ষা দিবার জন্যই যেন জগতের সমস্ত ভাণ্ডার আহরণ করিয়া রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মানা। এই মূর্ত্তি সর্ব্বদা লোক চক্ষুর গোচরীভূত হয় না; বিশেষ কোন পর্ব্ব উপলক্ষে ও কার্ত্তিক মাসে অন্নকূট যাত্রার সময় প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আঙ্গিনার মধ্যে নানাবিধ কারুকার্য্য খচিত শ্বেত কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত নাট-মন্দির এবং তৎসংলগ্ন একটী ছোট মন্দিরাভ্যন্তরে নানালঙ্কারভূষিতা সুবর্ণমণ্ডিতা বিশ্বজননী ভুবনমোহিনীরূপে অন্নপূর্ণা দেবী উচ্চ আসনোপরি সংস্থাপিতা। মার প্রকৃত মূর্ত্তি পাষাণময়ী। পূজারি পাণ্ডাকে বিশেষ কিছু দক্ষিণা দিলে সুবর্ণমণ্ডিত দেহাবরণ অপসারিত করিয়া প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখাইয়া থাকেন। এখানে দেবীর পূজার জন্য পুষ্প, বিল্বপত্র, ফুলের মালা, নৈবেদ্য, সন্দেশাদি, ফল, সিন্দূর, লালবস্ত্র, অলঙ্কারাদি ও দক্ষিণা যাত্রিগণের স্বেচ্ছামতে দিতে হয়।

বিশ্বেশ্বর—অন্নপূর্ণার মন্দির হইতে বাহির হইয়া সেই গলিপথে পূর্ব্ব-দিকে অগ্রসর হইলেই উত্তর ধারে বিশ্বেশ্বরের বাটী। বিশ্বেশ্বরের মন্দির

ও নাটমন্দির অপেক্ষাকৃত ছোট, চতুর্দ্দিকে পথ, আঙ্গিনা সমস্তই শ্বেত কৃষ্ণ প্রস্তরে মণ্ডিত, সিংহদ্বার হইতেই মন্দিরাভ্যন্তর পর্য্যন্ত ভক্তপ্রদত্ত রৌপ্য মুদ্রা স্থানে স্থানে পাথরে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। প্রাঙ্গণ মধ্যে নাটমন্দির ও তৎসংলগ্ন বিশ্বেশ্বরের সেই জগদ্‌বিখ্যাত স্বর্ণমন্দির। চূড়ার উপর ত্রিশূল ও স্বর্ণ পতাকা। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ ও মহারাণী অহল্যাবাই কর্ত্তৃক লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিশ্বেশ্বরের পূজা ফুল, বিল্বপত্র, গঙ্গাজল ও ফলাদি নৈবেদ্য দ্বারায় সম্পাদিত হয়, এবং তাহা লিঙ্গমূর্ত্তি একেবারে অদৃশ্য করিয়া রাখে; সম্মুখের কুণ্ড জলে ভরিয়া যায়। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের এককোণে একটী সুগন্ধি প্রদীপ সর্ব্বদাই জ্বলিতে থাকে। এখানে যাত্রিগণ ইচ্ছামত দক্ষিণা দিয়া আশীর্ব্বাদ স্বরূপ পুষ্পমালা পাইয়া থাকেন। নাটমন্দিরের মধ্যে একটী কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত শিবলিঙ্গ ও অদূরে বৃষ মূর্ত্তি। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে একসারি ঘরের মধ্যে নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। যাত্রিগণ ছুটাছুটি করিয়া তাহা দর্শন ও পূজা করে এবং দক্ষিণা স্বরূপ একটী করিয়া পয়সা প্রদান করে। সর্ব্বদাই স্থানের সঙ্কীর্ণতা বলিয়া লোকের ঠেলাঠেলী হয়। কোন বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে তুর্ব্বল-কায় বাঙ্গালীর পক্ষে দেবদর্শন বড়ই তুরূহ ব্যাপার। দোলের পর কৃষ্ণএকাদশী রজনীতে বিশ্বেশ্বরের রাজরাজেশ্বর স্বর্ণমূর্ত্তির পূজা হয়। অঙ্ক উপরি অন্নপূর্ণা এই যুগল মূর্ত্তি দর্শনার্থ সহস্র সহস্র লোক সমবেত হয়। শত শত পুলিশ কর্ম্মচারী শান্তি রক্ষা করিয়া থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বিশ্বেশ্বরের আরতি হইয়া থাকে। ইহা বিশেষ দর্শনীয়। ঘণ্টাকাল ব্যাপী এই আরতিতে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের তান মান লয় সংযুক্ত যন্ত্র সহযোগে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরে বেদমন্ত্র পাঠ বড়ই শ্রুতিমধুর। শ্রবণে এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয়ভাবের উদয় হইয়া নীরস মনকে সরস করিয়া ভক্তির সঞ্চার করিয়া দেয়। আহা! ইহাই কাশীর মাহাত্ম্য। না দেখিলে অনুভব করা যায় না।

জ্ঞানবাপী—বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের পিছনেই জ্ঞানবাপী নামক বৃহৎ কূপ, ইহার জল পান করিলে সজ্ঞানে মৃত্যু হয়। প্রবাদ ইহা গণপতি কৃত একটী পবিত্র কূপ। পূর্ব্বে ইহার জল নির্ম্মল ছিল, ক্রমাগত যাত্রীপ্রদত্ত পুষ্প বিল্বপত্র পচিয়া বড়ই দূষিত হইয়াছে। একটী পয়সা দক্ষিণা লইয়া এক একজন যাত্রী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল নিয়া থাকে। যৎকালে মোসলমান-রাজের অত্যাচারে বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভগ্ন হয় তৎকালে পাণ্ডারা আদি বিশ্বেশ্বরকে এই কূপে লুকাইয়া রাখেন।

কালভৈরব নাথ—কালভৈরব নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেই ভৈরব নাথের রৌপ্যময় বৃহৎ দুইটী চক্ষু ও বিরাট মূর্ত্তি এবং পার্শ্বে তাহার বাহন কুকুরের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবতা কাশীর কতোয়াল স্বরূপে কাশীবাসীদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন ও পাপ পুণ্যের বিচার করেন। যাত্রিগণ বিঘ্ননাশের জন্য কালভৈরবের পূজা দিয়া থাকেন।

মণিকর্ণিকা—কাশীতে মণিকর্ণিকাই সর্ব্ব প্রধান তীর্থ। এখানে প্রতি-দিন সহস্র সহস্র লোক স্নান তর্পণ করিয়া থাকেন। ইহার দৃশ্য অতি মনো-হর। এই ঘাটের উপর বিষ্ণুর চরণচিহ্ন পাদুকা আছে। ইহা একটী কুণ্ড, নীচে নামিবার জন্য চতুষ্পার্শ্বেই সিঁড়ি আছে। গঙ্গার সহিত একটি বান্ধা সুড়ঙ্গ পথ আছে, তদ্দ্বারা ভাগীরথীর জল গমনাগমন করে। বর্ষাতে গঙ্গাজলে ইহা ডুবিয়া গেলে বালিদ্বারা ভরিয়া যায়। কার্ত্তিক মাসে জল শুষ্ক হইলে বালি ক্ষোদিয়া কূপের উদ্ধার সাধন করিয়া থাকে।

মণিকর্ণিকার উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন মত আছে। কেহ বলেন, দক্ষযজ্ঞে সতী দেহ ত্যাগ করিলে মহাদেব সতীশোকে উন্মত্তাবস্থায় সতীদেহ স্কন্ধে বহন করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন কালে বিষ্ণু চক্রদ্বারা সতী দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া নানাস্থানে ফেলিয়াছিলেন; সতীর কর্ণাভরণ কুণ্ডল এখানে পতিত হইয়াছিল, তদবধি এই স্থানে মণিকর্ণিকা নামক মহা-তীর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। কাহারও মতে গল্পটি অন্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

মহাদেব আপন ত্রিশূলোপরি কাশী নির্ম্মাণ করিয়া সমুদয় দেবের সন্নিবেশ করিলে ভগবান বিষ্ণু এইস্থানে মহাদেবের উপাসনা করিয়া আপন চক্র দ্বারা মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক জলোত্তোলন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই চক্রতীর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। মণিকর্ণিকার অপর নাম চক্রতীর্থ। ভূতনাথ মহেশ্বর একান্ত আহ্লাদিত হইয়া উন্মত্তভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহাতেই আপন মণিময় কুণ্ডলদ্বয় কর্ণ হইতে পড়িয়া যায়, ইহাহইতেই মণিকর্ণিকার উৎপত্তি হইয়াছে। মণিকর্ণিকায় স্নান তর্পণ পিতৃলোকের কার্য্যাদি করিয়া থাকে এবং পাণ্ডার দক্ষিণা দিতে হয়। এতৎসংলগ্ন ভাগীরথীস্থ ঘাটকে মণিকর্ণিকা ঘাট বলিয়া থাকে, ইহা বিশ্বেশ্বরের বাটীর পূর্ব্বদিকের সন্নিকট। মণিকর্ণিকা-কুণ্ড-স্নানে সমস্ত মহাপাতকাদি বিনাশ পায়।

এতদ্ব্যতীত শীতলাদেবীর মন্দির, নবগ্রহের মন্দির, কালেশ্বরের মন্দির, গঙ্গাকেশবের মন্দির ও বহুবিধ শিব ও দেবদেবীর মন্দির আছে। কাশী ভারতের সমস্ত তীর্থ ও দেব দেবীর আবাস স্থান। গয়াক্ষেত্র, চন্দ্রনাথ তীর্থ, জগন্নাথ ক্ষেত্র, প্রয়াগ ঘাট, কামাখ্যা তীর্থ সমস্তই এখানে দর্শিত হয়। নাগকূপ, কালকূপ ইত্যাদি অনেক তীর্থ কূপ আছে। পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দির হিন্দুদ্বেষী যবন সম্রাট্ কর্ত্তৃক মসজিদে পরিণত হইয়া বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তরদিকে অবস্থিত আছে। উত্তরবাহিনী গঙ্গা ধনুর আকারে কাশীর পাদমূল বিধৌত করিয়া প্রবাহিতা। দীর্ঘে ৩।৪ মাইল পর্য্যন্ত গঙ্গাতে বহুতর ঘাট আছে; তন্মধ্যে দশাশ্বমেধঘাট, নারদঘাট, কেদারঘাট, জরাসন্ধঘাট, অসিসঙ্গমঘাট, তুলসীঘাট, গণেশঘাট, মহাশ্মশানঘাট, শিবালয়ঘাট, দণ্ডীঘাট, মানমন্দিরঘাট, পঞ্চগঙ্গাঘাট, দুর্গাঘাট, চৌষট্টি যোগিনীঘাট, সুরভিঘাট, ত্রিলোচনঘাট, সিন্ধিয়াঘাট, পিশাচমোচনঘাট ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

বেণীমাধবজিউ—উত্তরবাহিনী পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর উপরিভাগেই সেই মন্দির স্থাপিত। বেণীমাধবজিউর শ্রীমূর্ত্তি বড়ই সুন্দর। পূর্ব্বে এই

বিগ্রহ নিকটস্থ উচ্চমিনারস্থিত মন্দির মধ্যেই ছিলেন। সেই জন্যই মিনার দুইটীকে বেণীমাধবের ধ্বজা কহে। মিনারের উপরে উঠিবার জন্য অপ্রশস্ত সিঁড়ি আছে। শিখরদেশে উঠিলে কাশীর সমস্ত সহর দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদ্বেষী যবন সম্রাট্ মন্দির ধ্বংস করিয়া মসজিদ্ ও গোরস্থল প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

নন্দিকেদারেশ্বর—কাশীর দক্ষিণ ভাগে বাঙ্গালী টোলায় কেদারঘাটের উপরে এই মন্দির অবস্থিত আছে। কাশীর মধ্যে এই দেবই বিখ্যাত প্রাচীন অনাদিলিঙ্গ। মন্দিরের প্রাচীর হইতে পূর্ব্বদিকে গঙ্গা পর্য্যন্ত অতি সুন্দর সিঁড়ি বাঁধা প্রস্তরময় ঘাট। দেবালয় মধ্যে বহুতর বিগ্রহ মূর্ত্তি। এই মন্দিরের অনতিদূরেই পাষাণময় শিবলিঙ্গ, তিল তিল করিয়া বৃদ্ধিপায় বলিয়া তিলভাণ্ডকেশ্বর নামে বিখ্যাত।

শ্রীদুর্গাবাটী—বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে দক্ষিণ দিকে প্রায় দুইমাইল ব্যবধান। দুর্গাবাটী, বাঙ্গালী টোলার দক্ষিণে অবস্থিত। বড় মন্দির রাণী ভবানী কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। কাশীতে রাণী ভবানী ও অহল্যাবাইর বহুতর কীর্ত্তি ও দাতব্য অসংখ্য বাটী আছে। ছোট মন্দিরটী অনাদি। মহারাণী অহল্যাবাইর সময় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ দান পরিগ্রহ করিতেন না। মহারাণী অহল্যাবাই প্রত্যহ একটী করিয়া এক বৎসর ৩৬৫টী বাটী দান করেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণকে দান গ্রহণ করাইয়াছিলেন। তাহাদের অধিকাংশ বাটীই রাণীর প্রদত্ত। এরূপ দানশীলা পুণ্যবতী রমণী ভারতে অতি বিরল, অদ্যাপি লোকে রাণীকে মহামায়ার অংশ বলিয়া মনে করে। দুর্গাবাটীতে প্রতিদিন ছাগ বলি হইয়া থাকে। কাশীর অন্যত্র ছাগাদি বলি হয় না। এই বাটীতে বহুতর বানর সর্ব্বদা থাকে, যাত্রীদিগকে কিছুমাত্র অত্যাচার করে না। শরৎকালে পূজার বিশেষ জাঁক জমক আছে। এই মন্দিরের পূর্ব্বধারেই ভাস্করানন্দ স্বামীর সমাধি স্থান

ব্যাসকাশী

'রামনগরের পূর্ব্বদিকে কাশীহইতে প্রায় তিনমাইল ব্যবধানে ব্যাসকাশী। ব্যাসকাশীতে দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। একটী মাত্র সামান্য মন্দির বর্ত্তমান থাকিয়া ব্যাসকাশীর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। মন্দির মধ্যে শিব-লিঙ্গ স্থাপিত, ইহাকেই ব্যাসদেবস্থাপিত লিঙ্গমূর্ত্তি বলিয়াথাকে। 'রামলীলা উপলক্ষে মাঘমাসে এখানে একটী মেলা হইয়া বহুলোকের সমাগম হয়।

কাশী নির্ম্মিত হইলে ব্যাসদেব এখানে আসিয়া মহাদেবের সঙ্গে ঝগড়া করেন, এবং ভগবান শিবের আদেশে কাশী হইতে বিতাড়িত হন। ব্যাসদেব কাশীতে স্থান না পাইয়া মনোদুঃখে দ্বিতীয় কাশী প্রস্তুত করিবার জন্য বারাণসীর অপর তীরে আসিয়া ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁহার তপোবিঘ্ন করিবার মানসে ভগবতী অন্নপূর্ণাদেবী ব্যাসদেবকে ছলনা পূর্ব্বক আরব্ধ কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য, মায়ারূপে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধের বেশ ধারণ পূর্ব্বক, যষ্টি হস্তে ধীরে ধীরে যথায় ব্যাসদেব কাশী নির্ম্মাণ জন্য তপস্যা করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া মৃদুস্বরে ব্যাসদেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, এখানে তুমি কি অনুষ্ঠান করিতেছ।" ব্যাসদেব গর্ব্বভাবে বলিলেন, "বুড়ী আমি কাশীপুরী নির্ম্মাণের জন্য তপস্যা করিতেছি; এখানে বাস করিয়া মনুষ্যেরা যতই কেন পাপকর্ম্ম না করুক, তাহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে।" ছদ্মবেশী বুড়ী এই কথা শুনিয়া কিছুদূর চলিয়া পুনরায় আসিয়া বলিলেন, বাবা আমি কাণে কম শুনি, এখানে মরিলে কি হয় বলিয়াছিলা। ব্যাসদেব বলিলেন, "এখানে মরিলে প্রাণী সদ্য মুক্তি পাইবে।" বুড়ী পুনঃ পুনঃ আসিয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিলে ব্যাসদেব ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন, "এখানে মরিলে গাধা হয়," দেবী "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তদবধি এখানে মরিলে গাধা হয় এমত জনশ্রুতি আছে।

বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনী।

"সর্ব্বক্ষেত্রেষু তীর্থেষু পূজা দ্বারবতীসমা।
বিন্ধ্যে শতগুণা প্রোক্তা গঙ্গায়ামপি তৎসমা॥"

ভারতের মেরুদণ্ডসম বিন্ধ্যগিরি পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত থাকিয়া ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তর খণ্ডকে আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণ খণ্ডকে দাক্ষিণাত্য কহে। এই বিন্ধ্যাচলের পার্শ্ব দিয়াই ই, আই, আর নির্ম্মিত হইয়াছে। কাশী হইতে প্রয়াগ যাইতে বিন্ধ্যবাসিনী পথিমধ্যে অবস্থিত। কাশী হইতে বিন্ধ্যাচল ৪৪ মাইল, ভাড়া ॥৶ আনা। বিন্ধ্যাচল উপপীঠ। পুরাকালে এই পর্ব্বতোপরি শম্ভু নিশম্ভু সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ। যাত্রিগণের বাসের জন্য সন্নিকটেই একটী ধর্ম্মশালা আছে। সহরের ভিতর গঙ্গার পার্শ্বে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির। এখান হইতে ৫।৬ মাইল ব্যবধান পর্ব্বতোপরি জঙ্গল মধ্যে অষ্টভূজা দেবীর অতি প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দির মধ্যে একটী ছোট প্রকোষ্ঠে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মূর্ত্তি। ঘরটি স্বভাবতঃই অন্ধকার, সর্ব্বদা প্রজ্বলিত দীপালোকের সাহায্যে দেবী দর্শন ঘটে। মন্দিরের পশ্চাতের দুইটী গৃহে ভগবতী ও সরস্বতী দেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান। পূজার বিশেষ আড়ম্বর নাই, এক পয়সার পুষ্প বিল্বপত্র ও সিন্দূর এবং আট পয়সার একখান সন্দেশের ভোগ দিয়া পাণ্ডার কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে হয়।

অষ্টভুজার মন্দিরে যাইতে উঁচু পর্ব্বত বহিয়া যাইতে হয়। নিকটে লোকালয় কিম্বা জন মানব নাই। মন্দিরের নিকট একটী ধর্ম্মশালা আছে। এখানে দিবসে পূজার সময় যাত্রী সমাগম হয়। পর্ব্বতশিখরে দেবীর মন্দিরের উপরে উঠিবার জন্য প্রস্তরগঠিত সোপানাবলী আছে।

এখানে মন্দিরটী পর্ব্বতগাত্র ক্ষোদিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাহারই সঙ্কুচিত দ্বার পথে অষ্টভুজার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। কক্ষটী এত ক্ষুদ্র যে, এক সময়ে ৩।৪ জন লোকের অধিক দাঁড়াইতে পারে না। সেই ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্টা অষ্টভুজা মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি ভিন্ন আরও কয়েকটী দেব মূর্ত্তি আছে, কিন্তু তাহা বঙ্গদেশী দেবী মূর্ত্তির আকার নহে। এখানে রমণী পাণ্ডার বিশেষ বাড়াবাড়ি, তাহারাই যাত্রিগণকে তারামাতা, দুর্গা মাতা, কালী মাইজি ইত্যাদি নানাবিধ দেবীমূর্ত্তি দর্শাইয়া আশীর্ব্বাদ দিয়া ২।৪টী পয়সা আদায় করিয়া থাকে। বস্তুত পাণ্ডার জন্য অধিক ব্যয় ভূষণ করিতে হয় না। তবে বিন্ধ্যবাসিনীর বাটী হইতেই যাত্রিগণের সঙ্গে পাণ্ডা আসিয়া থাকে, সে-ই একরূপ রক্ষীর কাজ করিয়া থাকে, তাহাকে কিছু বক্‌সিস্ দিতে হয়। যাত্রিগণের এই ভীষণ পর্ব্বত-সঙ্কুল স্থানে রজনী যাপন করা বিপদসঙ্কুল বটে। দিবাভাগে আসিয়া দর্শনাদি করতঃ রাত্রে মৃজাপুর কিম্বা এলাহাবাদে থাকাই ভাল।

প্রয়াগতীর্থ বা এলাহাবাদ।

"অঙ্গুলীবৃন্দং হস্তস্থ
প্রয়াগে ললিতা ভবঃ ॥"

বারাহী তন্ত্র।

কাশী হইতে আমরা প্রয়াগ তীর্থে গমন করি। কাশী হইতে প্রয়াগ যাইবার জন্য দুইটী লৌহবর্ত্ম বিদ্যমান আছে। এক আউড্ রোহিলখণ্ড রেলযোগে বেনারস কেণ্টনমেণ্ট নামক ষ্টেশন হইতে গাড়ী চড়িয়া প্রতাপগড় নামক ষ্টেশনে গাড়ী বদলাইয়া এলাহাবাদ বা প্রয়াগ যাওয়া যায়। অপর কাশী রাজঘাট ষ্টেশনে গাড়ী চড়িয়া মোগলসরাই ১০ মাইল, ও তথা হইতে প্রয়াগ ৯৫ মাইল মোট ১০৫ মাইল, ভাড়া মোগলসরাই ৵০ আনা ও তথা হইতে প্রয়াগ ৸০ আনা। হাবড়া হইতে এলাহাবাদ ৫১৪ মাইল, ভাড়া তৃতীয় শ্রেণী ৫/৬ পাই। এলাহাবাদ প্রকাণ্ড ষ্টেশন, এথান হইতে বোম্বে যাইবার জন্য জব্বলপুর লাইন, ফৈজাবাদ, জৈনপুর লাইনের জংশন ইত্যাদি একত্রে সমাবেশ। ষ্টেশনের নিকটেই বেহারীলাল ও কুঞ্জলাল সিঙ্গনীয়ার সুবিস্তীর্ণ ধর্ম্মশালা। যাত্রিগণ বিনা ভাড়ায় তিন দিন তথায় থাকিতে পারে পশ্চিমাঞ্চলে ধর্ম্মশালার বন্দোবস্ত অতি পরিপাটী; প্রত্যেক ধর্ম্মশালাতে একজন জমাদার কর্ত্তাস্বরূপ থাকে; তদ্ভিন্ন ভৃত্য, দ্বারবান, মেম্বর ইত্যাদি বিনা ব্যয়ে পাওয়া যায়। তাহাদের তত্ত্বাবধানে নিজ নিজ দ্রব্য সামগ্রী ছোট ছোট কুঠরীতে তালাবন্ধ করিয়া অকুতোভয়ে নানাস্থানে যাওয়া যায়, সঙ্গে একটী অতিরিক্ত ভাল তালা চাবি রাখার প্রয়োজন।

ধর্ম্মশালার ভৃত্যকে কিছু বক্শীষ দিলে সমস্ত কাজকর্ম্ম তাহা দ্বারা সম্পন্ন

করান যায়। এই ধর্ম্মশালাটী দ্বিতল অট্টালিকা, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, মধ্যে জলের কল। ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, প্রত্যেক কুঠরীতে শয়নের জন্য খাট্‌লী আছে। ধর্ম্মশালার সম্মুখেই ছোটখাট একটী বাজার; পাকের উপযোগী ও প্রস্তুতী খাবার সমস্তই পাওয়া যায়। সড়কের পার্শ্বেই এক্কা, ঘোড়ার গাড়ী ও মুটীয়া থাকে। আমরা ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিবামাত্র জমাদার ভৃত্যকে একটী কুঠরী পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য আদেশ করিল। আমরা উপরের একটী ঘর দখল করিলাম। সঙ্গে পাচক ও ভৃত্য ছিল সুতরাং ধর্ম্মশালার ভৃত্যের বিশেষ সাহায্য লইতে হইল না। এই ধর্ম্মশালা ভিন্ন খসরুবাগের পশ্চাৎ দিকে লালা অঙ্গলাল আগরওয়ালার অর্থব্যয়ে অপর একটী ধর্ম্মশালা আছে, তাহাতে ৫০ জন যাত্রীর সমাবেশ হয়। ধর্ম্মশালা ভিন্ন এখানে ভাল ভাল সরাই আছে, এবং সহরে বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকা যায়। যাঁহারা সাহেবী ফেসনে হোটেলে বাস করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের জন্য সহরে বিলাতী ধরণের হোটেল আছে। এতদ্‌ভিন্ন পাণ্ডাদিগের যাত্রী রাখার দরুণ নিজের বাড়ীতে ও পৃথক বাসাবাটীতে অনেক ঘর আছে। পাণ্ডাদিগের চর বহুদূর হইতে যাত্রিগণের সঙ্গী হইয়া সুমধুর বাক্যাবলী ও নানাবিধ প্রলোভনে মুঁগ্ধ করিয়া যাত্রিগণকে আপন আপন বাটীতে আনিয়া স্থান দেয়। কিন্তু একবার নিজ আয়ত্তাধীনে নিতে পারিলে নানাপ্রকারে অর্থ শোষণ করিয়া থাকে। এখানকার পাণ্ডার অত্যাচার ভারতবিখ্যাত। ত্রিবেণীঘাট, ধর্ম্মশালা ও সহর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ ব্যবধান হইবে। দূর বলিয়া অনেক যাত্রী পাণ্ডার অধীনে বাসা লয় এবং তাহাদিগের অধিকাংশকেই পরিশেষে অনুতাপ করিতে দেখা গিয়াছে। লিখকও একবার ভুক্তভোগী বটেন। ষ্টেশন হইতে যাহারা একবারে ত্রিবেণীঘাটে স্নান করিবার জন্য যাইবার ইচ্ছুক তাহারা এক আনা অধিক ভাড়ায় এলাহাবাদ কোর্ট নামক ষ্টেশনে নামিয়া ত্রিবেণীতে স্নান করিতে পারেন। কোর্টের

পার্শ্বেই স্নানঘাট। সড়কের পার্শ্বে কয়েকটী মিঠাইর দোকান আছে, স্নানাদির কার্য্য সমাপনে জলযোগ করিয়া ধর্ম্মশালায় আসিয়া থাকাই সুবিধাজনক। যমুনার পাড়ে আরও একটী ধর্ম্মশালা আছে।

প্রয়াগ অতি প্রাচীন তীর্থ, পুরাণাদিতে ইহার উল্লেখ আছে। অতি প্রাচীন সংহিতাসত্তম প্রয়াগ তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, মানব দেহের ইড়া, পিঙ্গলা, সুষম্না নাড়ীর ন্যায়, প্রয়াগে সুরধুনী গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম হইয়াছে; এই পুণ্যতোয়া নদীত্রয়ের সঙ্গমের নামই ত্রিবেণী। আর্য্যগণের উপনিবেশ ব্রহ্মাবর্ত্তের একদিকে দৃশদ্বতী ও অপরদিকে সরস্বতী নদী বহমান ছিল, বেদে ইহার স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়, সেই পবিত্র সরস্বতী স্রোতস্বিনী এখানে অন্তঃসলিলা। পূর্ব্বে যে স্থানে প্রবলবেগে স্রোতস্বিনী সরস্বতী বহমান ছিলেন, কালের কুঠারাঘাতে তাঁহার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ হইয়াছে। তদুপরি এলাহাবাদের বিশাল দুর্গ, অচল অটল মূর্ত্তিতে মাথা উচ্চ করিয়াই যেন বৃটিশ শান্তিরক্ষা করিতেছে। এইস্থানে প্রজাপতি ব্রহ্মা শঙ্খচূড় দৈত্যকে বিনাশ করিয়া চতুর্ব্বেদের উদ্ধারসাধনে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। প্রয়াগ ব্রহ্মক্ষেত্ররূপে বিরাজমান। কাশীতে যেমন শিবক্ষেত্রের প্রাধান্য, জগন্নাথ যেমন বিষ্ণুর প্রধান ক্ষেত্র, প্রয়াগ তেমনই ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের ক্ষেত্র। এইস্থান বৈদিকাচারের আদি লীলাক্ষেত্র। সকল তীর্থের শিরোমণি। এখানে ভগবতী সতীদেবীর হস্তাঙ্গুলি পতিত হইয়াছিল, দেবীর নাম ললিতা বা আলোপী। আলোপী নাম্নী দেবী তাম্র সিংহাসনোপরে বিরাজমান। আলোপী দেবীর মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণগণ সতত বেদধ্বনি করিয়া থাকেন। প্রয়াগে শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণব তীর্থচতুষ্টয়ের একত্র সম্মিলনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র বটে। এখানে পিতৃ তীর্থ সকলের অধিষ্ঠান আছে। এ সমস্ত তীর্থের সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যের উচ্চ আদর্শ গঙ্গা যমুনার সঙ্গম। যমুনা একদিকে এলাহাবাদের দুর্গের পাদমূল প্রক্ষালিত করিয়া কুলু কুলু রবে যেন সপত্নীসম্ভাষণে

ভাগীরথীর সহিত সমবেত হইয়াছেন। পতিসোহাগিনী সুরধুনী অহঙ্কার করিয়াই যেন সপত্নীকে একত্রে মিলিতে দিতেছেন না। প্রয়াগের সঙ্গমস্থান বড়ই মনোহর ও যমুনার নীল বারি ভাগীরথীর শুভ্র জলের সঙ্গে মিলিয়া সুন্দর একটী রেখা পাত হইয়াছে। প্রয়াগ তীর্থের রাজা, মৎস্য পুরাণে উল্লেখ আছে "এতৎ প্রজাপতে ক্ষেত্রং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্"। এই পুণ্যতীর্থ প্রজাপতির ক্ষেত্র ত্রিলোকবিশ্রুত। ইহার মহিমা বর্ণনাতীত, ইহার খ্যাতি ত্রিলোক ব্যাপ্ত। এই তীর্থে স্নান দান শ্রাদ্ধাদি করিয়া দেহীর দেহাবসান হইলে সে স্বর্গে গমন করে। গ্রাম্য কথায় বলিয়া থাকে "প্রয়াগে মুড়াইয়া মাথা, মর পাপী যথা তথা।" পাপীর যত পাপ আছে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে তীর্থ দর্শন, স্নান, পূজাদি করিলে পাপসকল কেশমূল আশ্রয় করিয়া থাকে, সুতরাং সর্ব্বপাপ বিনাশজন্য মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়। প্রয়াগের বর্ত্তমান নাম এলাহাবাদ। বাদসাহ আকবরের রাজত্ব সময় ইহার নাম ইলাহাবাদ ছিল। মুসলমান রাজত্ব আরম্ভে এখানে বাড়ী ঘরের সংখ্যা কম ছিল। সেই জন্য তৎকালে ইহার অন্য নাম ছিল ফকিরাবাদ।

এলাহাবাদের দর্শনীয় স্থান সমূহ মধ্যে ত্রিবেণী ঘাট, আলোপী দেবীর মন্দির, অক্ষয়বট, এলাহাবাদ দুর্গ, অশোকস্তম্ভ, মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম, রামঘাট, শিবকোট ঘাট, খসরুবাগ, এলফ্রেডপার্ক, ইউনিভারসিটী হল, মুইর কলেজ, পাইওনিয়ার অফিস, গবর্ণমেণ্ট বাড়ী, পুল ইত্যাদি প্রধান। পাঠকগণের অবগতির জন্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখা গেল।

ত্রিবেণীঘাট।

ষ্টেসনসংলগ্ন ধরমশালার পার্শ্ব দিয়া যে সড়ক বরাবর চলিয়া গিয়াছে,সেই পথেই ত্রিবেণী বা বেণীঘাটে যাওয়া যায়। নিকটেই ঘোড়ার গাড়ী ও এক্কা গাড়ী পাওয়া যায়। আমরা একবার আট আনা দিয়া এক্কা

গাড়ী করিয়া ত্রিবেণীঘাট গিয়াছিলাম, যাত্রিগণ হাঁটিয়াও যাইতে পারে, চারি মাইল মাত্র ব্যবধান। বেণীঘাট গঙ্গার ধারেই ছিল, ক্রমে চর পড়িয়া দূরে সরিয়াছে। তটভূমি উচ্চ, বর্ষার কয়েক মাস ভিন্ন অন্য সময়ে সৈকত-ভূমেই পাণ্ডাগণ আপন আপন নাম পরিচায়ক নানাবিধ নিশান উড়াইয়া বাচারি করিয়া কাষ্ঠমঞ্চে বসিয়া থাকেন, চতুঃপার্শ্বে কতকগুলি কাষ্ঠাসন থাকে। ধ্বজাসকল চিত্র বিচিত্র, কোনটীতে মাছ, কোনটীতে মকর, কোনটীতে হস্তী, অশ্ব, ময়ূর, সিপাই, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা ইত্যাদি অঙ্কিত। পতাকার উপর পতাকা বায়ুভরে সঞ্চালিত হইতেছে, পবনতাড়িত এই সকল নিশানাগ্রভাগে উপরোক্ত চিত্রগুলি ঘাটের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যাত্রিগণের পাণ্ডার সঙ্গে সমস্ত কার্য্যের জন্য একটী চুক্তি করা শ্রেয়স্কর। যাহারা পাণ্ডার সুললিত বচন পরম্পরায় মুগ্ধ হইয়া অগ্রে কোনরূপ চুক্তি না করেন, তাহাদিগকে অধিক দণ্ড দিতে হয় এমন কি অনেক সময় পুলিসের সাহায্য পর্য্যন্ত লইতে হয়। পূর্ব্বে অর্থের দাবি বড়ই অধিক ছিল, এখন ন্যূনকল্পে ২।৩ টাকা দ্বারাও সাধারণ ভাবে কার্য্য সম্পন্ন করা যায়।

ত্রিবেণীঘাটে মাথা মুড়ানই প্রধান কার্য্য। পরামাণিক (নাপিত) চারি আনা পাইয়া থাকে, পরিধানের বস্ত্রেরও দাবি করে। নাপিত সঙ্গে চুক্তি করাই সহজ। কেশ মুণ্ডনে কেশ পরিমিত বর্ষ স্বর্গবাস হয়। অন্যান্য তীর্থে স্ত্রীলোকের মুণ্ডন নাই, এখানে সধবার দুই অঙ্গুলি পরিমিত কেশ-চ্ছেদন ও বিধবার মস্তক মুণ্ডনের বিধান আছে। ক্ষৌরকার্য্য সমাপনান্তে ত্রিবেণী স্নান করিতে হয়। বর্ষা ভিন্ন অন্য সময় সঙ্গম স্থানে অধিক জল থাকে না; কিন্তু স্রোতের বেগ বড়ই প্রবল,দুর্ব্বল ব্যক্তির নদীগর্ভে দাঁড়াইয়া স্নান করা আয়াসসাধ্য, সঙ্গম স্থানে ঘাট মাঝিদের বহুতর নৌকা থাকে, দুই একটী পয়সা দিয়া নৌকায় উঠিয়া স্নান পূজা করা যায়। যাঁহারা নৌকায় সঙ্গম স্থানের মধ্যে যাইতে চাহেন তাঁহাদিগহইতে এক আনা দুই আনা

লইয়া থাকে। গঙ্গায় স্নান তর্পণ শেষ করিয়া আপন পাণ্ডার ধ্বজনিম্নে আসিয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ দান দক্ষিণাদি কার্য্য সমাপনে দেব দর্শন ও পাণ্ডা বিদায় পূর্ব্বক সফল লইতে হয়।

আলোপী দেবীর মন্দির।

ত্রিবেণীঘাটের উত্তর পূর্ব্ব দিকে বহু দূরে আলোপী দেবীর মন্দির। মন্দির মধ্যে কোন মূর্ত্তি নাই, সুপ্রশস্ত মন্দিরাভ্যন্তরে একটী মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চ বেদী, মধ্যস্থান চতুর্হস্ত একটী গর্ত্ত, গর্ত্ত মধ্যে দেবীর পীঠ, দেবী মাত্র ক্ষোদিত। গর্ত্তের উপরে একটী শিশুর দোলা লটকান আছে, ইহাই দেবীর আসন। এই দোলায় ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন। দেবীর মন্দির প্রদক্ষিণ করতঃ দক্ষিণা ২।৪টী পয়সা দিয়া বেণীমাধবজিউ দেখা যায়। এই সকল দেব দর্শনাদি কার্য্যে পাণ্ডার বিশেষ মনোযোগ দেখা গেল না, তাহারা আপনাদের প্রাপ্য পাই গণ্ডা পর্য্যন্ত বুঝিয়া লইতে পারিলেই যাত্রীর সহিত আর বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখে না। যাত্রিগণ স্বয়ং অন্যান্য দেবদেবী দর্শন করিয়া থাকে। অন্যান্য স্থানে পূজা কি দক্ষিণার বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। দুই একটা পয়সা দর্শনি দিলেই হয়।

অক্ষয় বট।

অক্ষয় বট দুর্গাভ্যন্তরে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূগর্ভ মধ্যে নিহিত। অক্ষয় বট অতি প্রাচীন। এই বৃক্ষটী খৃষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দিতে যে বর্ত্তমান ছিল তাহা হি-উ-এন্‌থ্‌ সঙ্গের বর্ণনায় উল্লেখ আছে; সুতরাং ইহা তের শত বৎসরের উর্দ্ধের প্রাচীন বৃক্ষ। এই আশ্চর্য্য বৃক্ষটী পত্রাদি বিহীন হইয়া অতীত যুগের সাক্ষ্য দিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ৫।৬ ফিট উচ্চ এবং ২ ফিট ব্যাস-বিশিষ্ট বৃক্ষের গুড়িটী মাত্র আছে। ঢালু পথে প্রদীপের সাহায্যে ইহা

দেখিতে মৃত্তিকার নিম্নে যাইতে হয়। উক্ত চীন পরিব্রাজকের সময় এই বৃক্ষ সতেজ পত্র ও শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট ছিল। কিল্লা হইতে পাশ লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়।

এলাহাবাদ দুর্গ।

এলাহাবাদের কিল্লা দেখিবার জিনিস; ইহার ভিতরে যেমন এক দিকে পুরাতন অক্ষয় বট, অপর দিকে প্রায় ২৩ শত বৎসরের পূর্ব্বের অশোকস্তম্ভ বিদ্যমান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলের মধ্যেই দুর্গটী অবস্থিত, দুর্গের পাদমূলেই যমুনা। প্রকৃতপক্ষে দুর্গের কতক অংশ নদী হইতেই উঠান হইয়াছে। দুর্গের দুই দিকই নদী দ্বারা বেষ্টিত, এক দিকে বিস্তৃত প্রান্তর। হিন্দু রাজত্ব সময়ে এই দুর্গ কোন হিন্দু নরপতিকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। মোগল রাজত্ব সময়ে এই দুর্গ বাদসাহ আকবর কর্ত্তৃক পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষের উপর নির্ম্মিত হইয়া ইহাকে মধ্যপ্রদেশের সুদৃঢ় কিল্লারূপে পরিণত করা হয়। ইহার আকার ও নির্ম্মাণ কৌশল অনেক পরিমাণে আগ্রার কেল্লার অনুকরণীয়; সমস্ত দুর্গ, দুর্গ প্রাচীর, দুর্গ পরিখা, দুর্গদ্বার ও ভিতরের অট্টালিকাসমূহ সুদৃঢ় লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত, দুর্গের প্রধান দ্বারের উপরিভাগে বৃহৎ গম্বুজ, তন্নিম্নে বিস্তৃত গোলাকার গৃহ। ইহার দ্বার অন্যান্য দুর্গদ্বারাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এমন কি কোন কোন ইংরেজ ভ্রমণকারীর মতে এমত দুর্গদ্বার জগতে আর কোথাও নাই বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নদী হইতে এই দুর্গের সুষমা বড়ই মনোহর।

অশোকস্তম্ভ।

এলাহাবাদের কিল্লার ভিতরে অক্ষয় বটের সুড়ঙ্গের নিকটেই অশোকস্তম্ভ বা অশোক লাট। মহারাজ অশোক খৃঃ ২৪০ বৎসর

পূর্ব্বে এই স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট অশোকের পর সমুদ্র গুপ্ত কর্তৃক ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার গাত্রে বৌদ্ধ রাজচক্রবর্ত্তী অশোক ও সমুদ্র গুপ্তের বৌদ্ধ ধর্ম্মের নানাবিধ উপদেশাবলী ক্ষোদিত আছে। এইরূপ অশোকস্তম্ভ ভারতের নানাস্থানে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে যে সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মের লীলাক্ষেত্র ছিল, এই সকলই তাহার নিদর্শন স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। খৃষ্টের জন্মের ২৪০ বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট অশোক মগধের সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের পর্ব্বত গাত্রে বৌদ্ধধর্ম্মানুসৃত শাসননীতি সমূহ ক্ষোদিত করিয়া গিয়াছিলেন। খৃষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দিতে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের অনুশাসন-লিপিও সংযোজিত আছে। ইহার প্রধান উপদেশ "অহিংসা"—জীবহত্যা নিষেধ। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ইহার গাত্রে নিজ শাসন নীতির অনেক কথা ফরাসী ভাষায় ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছেন। এলাহাবাদের অশোকলাটের ন্যায়, দিল্লীতে, ফতেগড়ে কোটলাতে, ত্রিহুতমধ্যে, কাশীতে সারনাথে, ভুপাল রাজ্যে আরো সাতটী লাট এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমুদয়কে স্থানীয় লোকে অশোকলাট বলিয়া জানিতে না পারিয়া কেহ ভীমের গদা, কেহ মহাবীরকাদণ্ড ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া থাকে। মেজর জেম্‌স প্রিন্সেফ সাহেব এই সকল স্তম্ভের গাত্র-লিপির পাঠ উদ্ধার করিয়াছিলেন।

মহর্ষি ভরদ্বাজ আশ্রম।

কয়েকটী অর্দ্ধভগ্ন দেবালয় ও ইষ্টক-স্তূপ, এবং ইতস্ততঃ কতকগুলি আম্রবৃক্ষ। একটী দেবালয়ে শিব স্থাপিত আছে। মন্দিরের পার্শ্বে একটী অন্ধকার সিঁড়ি পথে ভূমধ্যস্থ একটী ঘরে প্রবেশ করতঃ নারায়ণের মূর্ত্তি দর্শন করিলাম; এক কোণে কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত একটী মূর্ত্তিকে ব্যাসদেব বলিয়া পরিচয় করিল। এখানে পুরুষ পাণ্ডাপেক্ষা স্ত্রী পাণ্ডার প্রাদুর্ভাব

অধিক। অর্থ পাইবার আশায় নানারূপ অলীক কথার প্রবর্ত্তনে যাত্রি-গণ হইতে কিছু আদায় করিয়া থাকে। দর্শনি না পাইলে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেয় না।

অন্যান্য তীর্থ।

প্রয়াগে ত্রিবেণীঘাট ভিন্ন রামঘাট, শিখামুণ্ডনঘাট, বাসুকীঘাট, ভোগবতীঘাট, শিবকোটঘাট প্রভৃতি অনেকগুলি তীর্থঘাট আছে। প্রয়াগে মাঘ মাসে একমাসস্থায়ী একটী কল্পমেলা বসিয়া থাকে, তাহাতে যাত্রী সংখ্যা সমধিক হয়, গঙ্গার সৈকতভূমে অসংখ্য চালা বাঁধিয়া সাধু, সন্ন্যাসী ও ধর্ম্মাত্মাগণ কল্পবাস করিয়া থাকেন। এখানে প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তরে কুম্ভমেলা নামে একটী বৃহৎ মেলা হয়। স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে—

"মকরস্থো যদা ভানু স্তদাদেব গুরুর্যদি।
পূর্ণিমায়াং ভানুবারে গঙ্গাপুষ্কর ঈরিতঃ।
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগেচ কোটিসূর্য্যঃ গ্রহৈঃ সম॥

প্রয়াগ, হরিদ্বার, পুষ্কর ও নর্ম্মদাতীরে তিন বৎসর অন্তর পর্য্যায়ক্রমে কুম্ভমেলা হয়। তত্তৎস্থানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। নানা গোস্বামী, সন্ন্যাসী, সাধু, অবধূত প্রভৃতি বহু শ্রেণীর সন্ন্যাসী দলে দলে আগমন করিয়া থাকেন। প্রয়াগের কুম্ভমেলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের ভিড় হয়। সঙ্গমস্নানার্থে হিমালয়শৃঙ্গবাসী, গুহাপ্রস্থিত সন্ন্যাসীর দলও নানা দিক্‌দিগন্ত হইতে আসিয়া থাকেন। রাজা, মহারাজা, ধনী, মঠাধিকারী মোহন্তগণ অপর্য্যাপ্ত অর্থব্যয় করিয়া জটাজূটধারী তেজঃপুঞ্জ কলেবর সন্ন্যাসিগণের নানারূপ সেবা করিয়া থাকেন।

এইত গেল প্রয়াগের তীর্থ বিবরণ। প্রাচীন প্রয়াগ এখন দুইভাগে বিভক্ত ; এক তীর্থস্থান, দ্বিতীয় নূতন সহর। এলাহাবাদেই বর্ত্তমান সহর।

ইহা মধ্য প্রদেশের রাজধানী। ইংরাজের নির্ম্মিত ক্যানিং টাউন কলিকাতার চৌরঙ্গি। এখানে পূর্ব্বে নানাবিধ বৃক্ষ পরিশোভিত একটী গ্রাম ছিল, সিপাই বিদ্রোহের সময়, বিদ্রোহী সিপাইগণ এই গ্রামে আশ্রয় লইয়া ইংরেজদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল বিধায় বিদ্রোহ প্রশমনের পর ঐ গ্রামটী জ্বালাইয়া দিয়া সেই স্থানে তৎকালের গবর্ণর বাহাদুর লর্ড ক্যানিং কর্ত্তৃক বর্ত্তমান নগরী নির্ম্মিত হয়। সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম সুমনোহর অট্টালিকা-শ্রেণী, ফল পুষ্প ভারাক্রান্ত নানাবিধ বৃক্ষ লতাদি পরিশোভিত উদ্যান, পার্ক, রাজভবন, বাজার, চত্বর ইত্যাদির সমাবেশে হিন্দুর ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীন গৌরবের সমাধিস্তূপ, মোগল সম্রাটের লোচনানন্দদায়ক বিলাস ক্ষেত্রকে পরাস্ত করিয়া ইহা অতুল সৌন্দর্য্যের খনিভূত হইয়াছে। এখানে লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের প্রাসাদ, হাইকোর্ট, ইউনিভার-সিটীর সিনেট হাউস, মুইরকলেজ, এলফ্রেড পার্ক, খসরুবাগ, যমুনার পুল, বোর্ডআফিস, পাইওনিয়র নামক পত্রিকার আফিস, চকবাজার প্রভৃতি অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। মোসলমান রাজত্ব সময়েও ইহার সৌন্দর্য্য অতুলনীয় ছিল, তৎকালের খসরুবাগ নামক উদ্যান আশ্চর্য্য চিত্তবিনোদনকারী। বাদসাহ আকবরের রাজত্ব সময়ে এলাহাবাদ দুর্গ নির্ম্মিত হইয়া যে সকল মাল মসলা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল তদ্দারাই খসরুবাগ নামক চিত্তরঞ্জক উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এলফ্রেড পার্ক।

এলফ্রেড পার্ক অতি বিস্তৃত। ইহার ব্যয় পোষণার্থ গবর্ণমেণ্টের বহু টাকা ব্যয় পড়ে, ইহার নাম যেমন, দেখিতে তেমন বোধ হইল না; প্রশস্ত সবুজ বর্ণ দূর্ব্বাক্ষেত্র, ক্রীড়াস্থান, ফুলের কেয়ারি, রাস্তা, নানাবিধ তরু লতা ইত্যাদি সাজান আছে। মধ্যে রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তি সিংহাসনোপরি প্রতিষ্ঠিত। ইহার সম্মুখে ব্যাণ্ড বাদ্য

হইয়া থাকে। সহরবাসিগণ এখানে আসিয়া নির্ম্মল বায়ু সেবন করিয়া থাকেন; ডিউক অব্ এডিনবরার ভারতে শুভাগমনোপলক্ষে ইঁহার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ এলফ্রেড নামে অভিহিত। গ্রীন পার্ক নামে আর একটী সুন্দর বাগান আছে, তাহাতে কৃত্রিমতার সহিত অকৃত্রিমতার একত্র সম্মিলনে বড়ই নয়নতৃপ্তিকর হইয়াছে। পার্কের সম্মুখেই ইউনিভারসিটির হল ও মুইর কলেজ। এস্থানের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর মুইর সাহেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মুইর কলেজ নাম হইয়াছে। এখানকার হাইকোর্ট কলিকাতার হাইকোর্ট হইতে ছোট। যমুনার সেতুর নির্ম্মাণ কৌশল চিত্তাকর্ষক, ইহা দৈর্ঘ্যে ৩২২৪ ফিট, প্রতি ২০৫ ফিট অন্তরে ৯৫ ফিট উচ্চ চৌদ্দটী স্তম্ভোপরি স্থাপিত। সেতুর উপর হইতে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থান দেখিতে বড় সুন্দর। সেতুটী ত্রিতল; ইহার নির্ম্মাণ কৌশল ইংরেজ জাতির বিজ্ঞানচর্চ্চার অপূর্ব্ব পরিচয়।

মথুরাতীর্থ।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

বঙ্গদেশীয় তীর্থযাত্রিগণমধ্যে অনেকেই গয়াধামে পিতৃপুরুষের পিণ্ড প্রদান, কাশীতে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বর দর্শন, এবং প্রয়াগে মস্তকটি মুণ্ডন করিয়াই বাটীর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিশেষ উৎসাহী ও সঙ্গতিসম্পন্ন যাত্রিগণই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র পুণ্যভূমি মথুরা বৃন্দাবন দর্শন করিয়া থাকেন। আমরা আউড্ রোহিলখণ্ড রেলে হরিদ্বার দর্শন করিয়া দিল্লীর পথে মথুরা নগরীতে গিয়াছিলাম; কিন্তু বঙ্গবাসী যাত্রীদিগের পক্ষে এলাহাবাদ হইতে মথুরা গমন সহজসাধ্য। এলাহাবাদ হইতে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলে হাট্রস্ নামক জংসন ২৯২ মাইল, ভাড়া ২।৬ আনা এবং তথা হইতে বোম্বে বরদা এবং সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলে মথুরা ২৯ মাইল, ভাড়া ।৬ আনা, মোট এলাহাবাদ হইতে ২৷৵০ এবং হাবড়া হইতে ৮৩৫ মাইল, ভাড়া ৭৷৵৬ আনা।

মথুরা অতি প্রাচীন নগরী, বাল্মীকি-রামায়ণে ও মনুসংহিতায় ইহাকে সুরসেন নামে অভিহিত করিয়াছে। রামায়ণে উল্লেখ আছে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্ব সময়ে দুর্দ্দান্ত লবণ নামক রাক্ষস এখানে বাস করিত। মহাবলশালী শত্রুঘ্ন লবণ রাক্ষসকে বধ করিয়া এখানে নগর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সুরসেন হইতেই এই নগরী সুরসেন নামে আখ্যাত হইয়াছিল। মথুরা বৈদিকযুগ, বৌদ্ধযুগ, হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বের উত্থান পতন দর্শন করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানে পুনঃ হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এস্থানে বৈষ্ণবধর্ম্মের

প্রসারতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মের উত্থান পতনে বহুতর প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ ও বহু দেবদেবীর মন্দিরাদি দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দিতে চীন পরিব্রাজক হিউ এন্‌থ্ সঙ্গের পরিদর্শন সময়ে মথুরাতে বৌদ্ধধর্ম্মের চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সেই প্রাচীন ভগ্ন চিহ্নাদি অদ্যাপি কিছু কিছু দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। দশম শতাব্দির শেষভাগে হিন্দু প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ঘটে ও পূর্ব্ব গৌরব নষ্ট হয় এবং হিন্দু রাজন্যবৃন্দের দ্বারা নগরীর সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। তৎকালে ইহা অতুলনীয় শোভা সম্পদে ভারতের প্রধান নগররূপে পরিচিত হইয়াছিল। নয়নমুগ্ধকর শ্বেত মর্ম্মর বিনির্ম্মিত দেবমন্দিরগুলির অভ্রভেদী স্বুবর্ণচূড়াসমূহ, অট্টালিকা শ্রেণীর অসামান্য কারুকার্য্য ও শিল্প নৈপুণ্য, বহুমূল্য মণিমুক্তাগঠিত অসংখ্য দেবমূর্ত্তি প্রভৃতির অপরিসীম ঐশ্বর্য্য রাশির খ্যাতি নানা দেশদেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল; এবং ঐ বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশির প্রবল আকর্ষণে অর্থগৃধ্নু বৈদেশিক নরপতিবৃন্দ বারম্বার এই নগরীকে লুণ্ঠন করিয়া পূর্ব্ব গৌরব বিনষ্ট করিয়াছেন। ইতিহাসে উল্লেখ আছে, দশম শতাব্দিতে স্বুলতান মামুদ গিজনী, প্রথমবারে পঞ্চদশ শতাব্দিতে সেকেন্দর লোদি এবং অষ্টাদশ শতাব্দিতে আমেদসাহা দুরাণী ও আরেঙ্গজেব কর্ত্তৃক বারম্বার ইহার অতুল ধন সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত ও হিন্দুদিগের দেববেদীর সমস্ত মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। বর্ত্তমান মন্দিরসমুদয় আধুনিক। মথুরা নগরী বারম্বার বিলুণ্ঠিত হইয়াও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরাশির প্রভাবে চিরমাধুর্য্যময় ও স্বাভাবিক শান্তির ছটা বিস্তার করিয়াই যেন দর্শনলোলুপ যাত্রীদিগকে আহ্বান করিতেছে।

মহাভারতীয় যুগে মথুরা মহাপরাক্রমশালী স্বুরসেন বংশীয় দুরাচার কংস রাজের রাজধানী ছিল। পুরাণে বর্ণিত আছে, কংসরাজ দৈববাণীতে, আপন ভগিনী দৈবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কর্ত্তৃক নিহত হইবেন

জানিতে পারিয়া দৈবকী দেবী ও তৎস্বামী বসুদেবকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং দৈবকীর সপ্তম গর্ত্ত পর্য্যন্ত জাত সন্তানগণকে বিনষ্ট করেন। যথাকালে অষ্টম গর্ত্তে মধুসূদন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে বসুদেব সদ্যপ্রসূত শিশুকে গোকুল নগরে আপন বন্ধু নন্দরাজ ভবনে গোপনে রাখিয়া আসেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথায় নন্দরাজ গৃহিণী যশোদারাণী কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইয়াছিলেন। কংসের অত্যাচারে নন্দরাজ গোকুল নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কালিন্দী যমুনা তটে বৃন্দাবনে উপনিবেশ করেন। বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অশেষ লীলা করিয়া বাল্য ও কৈশোরকাল অতিবাহিত করেন এবং মথুরা নগরে গমন করিয়া মল্লযুদ্ধে কংসকে নিহত করিয়া তৎপিতা উগ্রসেনকে রাজা করিয়া যদুবংশের একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি মথুরা, গোকুল, মহাবন, বৃন্দাবন, গিরিগোবর্দ্ধন, চৌরাশিযোজন পরিধি স্থান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্ররূপে হিন্দুদিগের পরম পবিত্র মুখ্য তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে মথুরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ বিখ্যাত একটী জিলা। এখানে রাস্তা ঘাট পরিষ্কার ও প্রশস্ত, সড়কের দুই ধারে অট্টালিকা সমূহ, নানাবিধ পণ্যবীথিকা দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ, বাজারে দধি, দুগ্ধ, ফল, তরিতরকারী, উৎকৃষ্ট মিঠাই ও আহার্য্য নানাবিধ সামগ্রী সুলভ ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ঘোড়ার গাড়ী, এক্কা, পাল্কী, গোযান, উষ্ট্রযান প্রভৃতি নানা প্রকার যান বাহনের প্রাচুর্য্য আছে। ব্রিটিশ আফিস সমূহের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌধরাজি, মুসলমানদিগের জামে মসজিদ, হিন্দু দেবদেবীগণের মন্দিরসমূহ মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মন্দির, বিজয়গোবিন্দ মন্দির, ভৈরবনাথের মন্দির, মদনমোহন মন্দির, বলদেব মন্দির, বিহারীজিউর মন্দির, পরশনাথের মন্দির, পশুরামের মন্দির, লক্ষ্মণদাসের মন্দির, এবং মথুরার তোরণ দ্বার, গির্জ্জা হোলিদরজা, রেল

ষ্টেশন, যমুনা পুল, কেশীঘাট, মিউজিয়ম, উদ্যান ইত্যাদি নানাবিধ সুদৃশ্যে মথুরানগরী পরিপূরিত। এখানে মিউজিয়মে রক্ষিত দ্রব্যাদি মধ্যে বৌদ্ধদিগের বহুতর দুর্লভ জিনিষও দৃষ্ট হয়।

এখানে পাণ্ডার অত্যাচার কম নহে। আমরা ষ্টেশনে রাত্রিতে আসিয়াছিলাম, তবুও পাণ্ডার শত শত চেলায় নানা প্রকার জ্বালাতন করিতে লাগিল, আমরা পূর্ব্ব হইতেই ধর্ম্মশালায় যাওয়া কৃতনিশ্চয় হইয়া আট আনা দিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিলাম ; কিন্তু পাণ্ডার চেলারা ষ্টেশনে ধরমশালাটীর নির্দ্দেশ এমনি ভাবে করিয়া দিল, যে গাড়োয়ান আমাদিগকে তাহাদের বাসা বাটীতেই লইয়া গেল। বাসা বাটীটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দ্বিতল প্রশস্ত বাড়ী, চতুর্দ্দিকে জানালা, বানরের উপদ্রব নিবারণার্থে প্রতি জানালা ও দরজাতেই লৌহ জালের কপাট। আমরা জয়পুর হইতে সকালে সামান্য আহার করিয়া আসিয়াছিলাম। সারাদিনের পরিশ্রমে বাসায় কোনরূপে ময়রা দোকানের জিনিষেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করা গেল। এখানে মলাই ও নানাবিধ মিঠাই এবং ফলাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। রজনী প্রভাতে আমরা জানিতে পারিলাম ইহা ধরমশালা নহে, পাণ্ডার বাসাবাড়ী, চেলা মহাশয় কৌশলে গাড়োয়ান সঙ্গে ইঙ্গিত করিয়া আমাদিগকে তাহার কবলে আনিয়াছে ; সুতরাং তখনই চলিয়া যাইবার জন্য লগেজ বান্ধিলাম, এবং পাণ্ডার অনুচরকে মিথ্যা বলার জন্য ভর্ৎসনা করিলাম ; গোলমাল দেখিয়া পাণ্ডাজি স্বয়ং দর্শন দিলেন এবং নানা কথায় আমাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার বাসাতেই রাখিলেন।

চিরসমৃদ্ধিশালিনী মথুরানগরী হিন্দুর পক্ষে কি পবিত্র স্থান। মথুরা যমুনার তটদেশে আনন্দ শোভায় শোভমান। ইহা ভক্ত বৈষ্ণববৃন্দের প্রাণপ্রিয়তর পুণ্যভূমি। এই নগরে কংস-কারাগারে ভক্তবাঞ্ছিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে যমুনাতে স্নান-তর্পণ, পার্ব্বণ, দেবাদি দর্শন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি লীলাক্ষেত্র দর্শনই

প্রধান কাজ। বর্ত্তমান ধনী শেঠদিগের বিনির্ম্মিত বহু নয়নতৃপ্তিকর সুদৃশ্য দেবমন্দির ও বিগ্রহাদি যাত্রিগণ দর্শন করিয়া থাকেন। পুরাতন চিহ্ন মধ্যে সেই স্থিরা ধীরা, অতুলশোভাসমন্বিতা একমাত্র যমুনা। যমুনার তটবর্ত্তী ঘাটগুলি অতি প্রাচীন স্মৃতির মধুময় কাহিনীসকল হৃদয়ে আনয়ন করতঃ চিত্ত তন্ময় করিয়া দেয়। এখানে বহুতর স্নানঘাট আছে, পাণ্ডারা ইহার প্রত্যেকটিকেই কোন না কোন প্রাচীন ইতিহাসের সহিত কিম্বা পৌরাণিক ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া নামানুকরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব দ্বাপরের শেষভাগে; পুরাণাদি মতে ইহা শত সহস্র বৎসরের কথা, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কাল নির্ণয়ে নানামতাবলম্বী হইলেও অনেকেই তিন সহস্র বৎসরের ঊর্দ্ধ এবং চারি সহস্র বৎসর মধ্যের ঘটনা বলিয়া আপন আপন পুরাবৃত্তে আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং এ সমস্ত ঘাট দৃষ্টে ইহা যে কত আধুনিক তাহা সহজবুদ্ধি লোকেরও হৃদয়ঙ্গম হয়। আমরা প্রধান কয়েকটী ঘাটের নাম উল্লেখ করিলাম। বিশ্রামঘাট, ধ্রুব ঘাট, গণেশ ঘাট, চক্রতীর্থ ঘাট, মানস ঘাট, ঋষিঘাট, মোক্ষঘাট, সূর্য্যঘাট, বৈকুণ্ঠঘাট, ব্রহ্মলোক ঘাট, নবতীর্থঘাট, কালেঞ্জরেশ্বরঘাট, ঘণ্টবরণঘাট, সঙ্গমঘাট, বাসুদেবঘাট, মহাদেবমন্দিরঘাট, অসিকুণ্ডঘাট, চিন্তামণিঘাট, বুদ্ধঘাট, দশাশ্বমেধঘাট, প্রয়াগঘাট, কনখল ঘাট, এ সকলের মধ্যে বিশ্রাম ঘাট ও ধ্রুবঘাটই যাত্রীদিগের নিকট বিশেষ পবিত্র স্থান। এই দুই ঘাটে স্নান তর্পণই প্রধান কার্য্য। বিশ্রামঘাটে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। পাণ্ডা মহাশয় কংসের ঢিবী বা কংসটীলা হইতে বিশ্রামঘাট পর্য্যন্ত, কোথাও সড়ক দিয়া, কোথাও বা অট্টালিকার নিম্ন দিয়া, কোন স্থানে কোন জলপ্রণালীর মধ্য দিয়া, ভগবানের গমনের পথটী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। যমুনাতে কচ্ছপের সংখ্যা অত্যধিক, ইহাদের বিশাল কায়া দৃষ্টে মনে ভয় হয়, কিন্তু স্নানের সময় ইহারা শরীর সংস্পৃষ্ট হইয়াও

স্নানার্থীকে কোনরূপ উপদ্রব কিম্বা দংশন করে না। পিতৃ-উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পিণ্ডগুলি ইহারা অকুতোভয়ে ভক্ষণ করিয়া থাকে। বিশ্রামঘাটের নিকটস্থ একটী ঘাটকে কংসখড়ি কহে, প্রবাদ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংস নিহত হইলে তাহার শবদেহ সৎকারার্থে যমুনাতীরে এই পথে আনীত হইয়াছিল। বিশ্রামঘাটের নিকটেই সতীবুর্জ্জ নামক মন্দির। কংসরাজ নিহত হইলে তাহার পাটরাণী এখানে পতিসহ সহমৃতা হয়েন; মন্দিরটী পুরাকালের নহে। জানা যায়, অম্বরাধিপতি ভগবানদাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ঘাটের উপর একটী উন্নত অট্টালিকার সর্ব্বউচ্চতলের প্রধান প্রকোষ্ঠে ধ্রুবের একটী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মন্দিরটী যমুনার গর্ভ হইতে একটী দুর্গের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। পুরাকালে এখানে একটী পর্ব্বতোপরি পঞ্চমবর্ষের শিশু উত্তানপাদতনয় ধ্রুব বিমাতৃবাক্যে মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া তপস্যা করতঃ সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এই জন্য ইহাকে ধ্রুব ঘাট কহে।

ধ্রুবঘাটে যতগুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, সকলগুলিই সদর রাস্তা হইতে উচ্চে স্থাপিত, যেন কোন টিলা কিম্বা ভগ্ন বৌদ্ধ স্তূপোপরি নির্ম্মিত হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় দেবালয়সমূহে, পণ্যবীথিকায় ও যমুনার ঘাটে শোভা অতুলনীয়। শত সহস্র প্রদীপমালা পরিশোভিত মন্দিরসমূহ; রাস্তা ও ঘাটের শোভা; সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্মে অসংখ্য লোকের সমাগমজনিত জন-কোলাহল; প্রদীপ ও পুষ্প হস্তে চঞ্চলনয়না, উজ্জ্বলবরণা, মধুরহাসিনী, ভুবন-মোহিনী মথুরাবাসিনী-রমণীগণের দ্রুত-পদবিক্ষেপে গমনাগমন, দেবালয় সমূহে সন্ধ্যারতির এককালীন অসংখ্য শঙ্খ, ঘণ্টা, ভেরী, ঝাঁজরি, মৃদঙ্গ, বেণু, দামামা প্রভৃতির সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হইয়া যমুনার তরঙ্গে তরঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া,—এক অভাবনীয় অশ্রুতপূর্ব্ব মধুর প্রশান্ত ভাবের উদ্রেক করে। যমুনার বিশ্রামঘাটের সান্ধ্য আরতি অতি মনোমুগ্ধকর ও ভক্ত হৃদয়ে ভাব উদ্রেককর বটে।

ঘাটের মধ্যস্থলে একটী প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলান আছে, আরতির সময় উহার ঘন গম্ভীর নিনাদ, চতুর্দ্দিকের অল্পপরিসর স্থানে দলে দলে অসংখ্য স্ত্রী পুরুষের একত্রে সমাবেশ ; উৰ্দ্ধে সুনীল আকাশে হীরকখচিত অগণিত তারকাবলী, নিম্নে অগণ্য প্রদীপ শিখা মণ্ডিত স্থিরা, ধীরা, ক্ষীণকায়া যমুনা, বিশ্রামঘাটের প্রতি চত্বরে চত্বরে নারীকণ্ঠবিমিশ্রিত হুলুধ্বনি, চতুর্দ্দিকে পুরুষমণ্ডলীর উল্লাসজনিত হরিধ্বনি, চঞ্চলতার সহিত মধুরতার, উচ্ছ্বাসের ও গাম্ভীর্য্যের এমত সুমধুর সম্মিলন বড়ই সুন্দর ও শান্তিপ্রদ। কংস-বধে মল্লবেশধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিশ্রান্ত হইয়া একদিন যমুনার এই স্থানে উপবেশন করিয়া স্বেদ-সিক্ত-বদন-মণ্ডল শান্ত ও নির্ম্মল করিয়াছিলেন, বোধ হয় যেন আজিও যমুনা সেই আরামের উপকরণগুলি দ্বারা অলক্ষ্যে এই ঘাটে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতেছেন। এই উদ্‌ভ্রান্ত সৌন্দর্য্যলহরীর মধ্যে মানব হৃদয়ের শোক দুঃখ দূর করিবার জন্য কি যেন এক স্বর্গীয় ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে। যিনি সংসারের বিষয়যাতনায় জর্জ্জরিত ও কুটীল প্রবাহে সুখশান্তি লাভে বঞ্চিত আছেন ; যদি কোন নিষ্ঠুর আঘাতে কোমল হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া থাকে, যদি কাহারও জীবনের চিরসঙ্গিনী একমাত্র প্রেমময়ী ভার্য্যার বিয়োগে জীবন উদাস ও চিরদুঃখ-ময় হইয়া থাকে ; যদি কাহারও স্নেহময় সন্তান বিয়োগশোকে হৃদয় এক মাত্র শোকের আলয় হইয়া থাকে, আসুন! একবার ছুটিয়া আসুন, আসিয়া যমুনার শান্তিময় বিশ্রামঘাটের প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর উপর উপবেশন করুন, একবার সন্ধ্যারতির সেই সুমধুর গর্জ্জন প্রতি লক্ষ্য করুন। সম্মুখে যমুনাবক্ষে মধুরভাষিণী ব্রজবাসিনী রমণীগণের দোলায়মান চঞ্চল প্রদীপমালার ভাসান দর্শন করুন। চতুর্দ্দিকের ভক্ত বৃন্দের আনন্দ সঞ্চালিত উন্মত্তবৎ হরিধ্বনি শ্রবণ করুন, অনন্ত গগনে অসংখ্য তারকাবলীখচিত সেই সুনীল চিত্রপট খানির প্রকৃষ্ট শোভা দর্শন করুন, অমনি শোক, তাপ, দুঃখ সমস্ত ভুলিয়া শান্তিলাভ করিবেন। ইহা

কবির লেখনীসম্ভূত কল্পনা নহে। যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন, ইহাই তীর্থের মাহাত্ম্য। অন্য সকল পাণ্ডাগণের অর্থোপার্জ্জনের চাতুরী মাত্র। এই সুদৃশ্য শান্তিময় ভাব যমুনা গর্ভ হইতে নৌকাযোগে, কিম্বা অদূরবর্ত্তী নৌকা শ্রেণী উপরে ভাসমান লৌহবর্ত্মের উপর হইতে দেখিলে মনে যে ভাব হয় তাহা বর্ণনাতীত। নদীতটের অপূর্ব্ব শোভা, বারাণসী ঘাটেও আছে, বৃন্দাবনেও আছে, মথুরায়ও আছে, হরিদ্বারেও দেখা যায়, কিন্তু এমন শান্তিময় আরামপ্রদ ভাব জগতে বুঝি আর কোথাও নাই! মথুরার ঘাটগুলি কাশীর ঘাটের ন্যায় তত উচ্চ ও প্রশস্ত নহে, কিন্তু সৌন্দর্য্য শোভায় বড়ই চিত্তহর। সোপানাবলীর উপর চত্বরের পর চত্বর, পার্শ্বেই সুন্দর সুন্দর দেবালয় সমূহ। অনতি উচ্চ পার হইতে মন্দিরগুলির প্রতিবিম্ব স্বচ্ছসলিলা যমুনার বক্ষে যেন চিত্রিত রহিয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য শিল্পসুষমার সহিত একত্রে মিলিয়া মিশিয়াই মথুরাপুরীর মধুর মোহন শান্তিভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। যাঁহারা এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই আত্মহারা হইয়াছেন। কার্ত্তিক মাস পুণ্যাহ মাস, এতদঞ্চলবাসীরা এসময় মথুরাপুরী দর্শনে নানা স্থান হইতে সমাগত হইয়া থাকেন। এসময় মথুরা দর্শন, যমুনাতে স্নানাদি করা বড়ই পুণ্যপ্রদ বলিয়া কথিত আছে। আমরাও অগণ্য যাত্রিগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়াছিলাম।

ধ্রুবঘাট হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে যমুনার তটবর্ত্তী একটী উচ্চ স্তূপকে পাণ্ডা মহাশয় কংসস্তূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, ইহাকে কংসটিলাও বলিয়া থাকে। এই টিলাটী বৌদ্ধযুগের কোন স্তূপ বলিয়াও কেহ বলিয়া থাকেন। এখানে অট্টালিকার নানাবিধ নিদর্শন মৃত্তিকাসংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মহাভারতীয় যুগের পর সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে। এই মথুরানগরী বিধর্ম্মী বৌদ্ধ ও যবনদিগের কত ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়াছে। নানাধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের

সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরাদি বিধ্বস্ত হইলেও স্থানমাহাত্ম্যে প্রাচীন স্মৃতি চিহ্ন-টুকু একেবারে মুছিয়া যায় নাই। কংসটিলা বা কংসভবন দেখিলে ইহার প্রাচীনত্ব এবং ইহা যে রাজযোগ্য আবাসভূমি তাহা অনুমান হয়। ইহার বাহিরদিকে সুপ্রশস্ত যমুনা ধনুর আকারে বেঁকিয়া রহিয়াছে, অন্য-দিকে সুগভীর প্রশস্ত পরিখার চিহ্ন অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এক-দিকে দিগন্তব্যাপী প্রান্তর। মহাভারতাদি ইতিবৃত্ত বিশ্বাস করিলে একদিন এখানে যে কংসালয় ছিল তাহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে। এই টিলার উত্তরে পরিখার অপর পারে একটী বাটীতে কতকগুলি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত শিল্প নৈপুণ্যবর্জ্জিত পুতুল আছে, ইহাকে অঘাসুর বধ স্থান বলিয়া পাণ্ডাগণ সমস্ত যাত্রিগণ হইতে পয়সা লইয়া থাকে। কংসটিলার উপর একটী শিবমন্দির ভিন্ন দর্শনযোগ্য অন্য কিছু বর্ত্তমান নাই; শিবলিঙ্গটী বৃহৎ ও কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত, চতুষ্পার্শ্বে শ্বেত প্রস্তরের বৃষ ও গণপতি প্রভৃতি মূর্ত্তি সকল বিরাজমান। বনভূমি নামে অপর একটী টিলা পাণ্ডারা দেখাইয়া থাকেন, তাহা রেল ষ্টেশনের নিকট। টিলার উপরি-ভাগে দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। একটী ঘরে কংসনিধনযজ্ঞের কৃত্রিম চিহ্ন অঙ্কিত আছে, এখানে মল্লযুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংস নিধন করিয়াছিলেন। যাত্রিগণ হইতে দর্শনি আদায়ের জন্য এ সব সৃষ্টি বলিয়াই বোধ হয়।

মথুরা সহরের পশ্চিমদিকে ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বহু ভগ্ন মন্দিরাদির স্তূপ দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরটির গঠন আধুনিক স্থাপত্যের সদৃশ নহে। মন্দিরের মধ্যভাগ বিস্তৃত ও পরিষ্কৃত। একটী কুণ্ড উপরি লিঙ্গ স্থাপিত। ভূতেশ্বর লিঙ্গ অতি সুদীর্ঘ, দেখিতে একটী স্তম্ভের ন্যায়; ইহার গাত্রে বিরাট গুম্ফ বিশিষ্ট ত্রিলোচনের মুখ ক্ষোদিত আছে; এই কুণ্ডমধ্যে ব্রজেশ্বর নামক আর একটী ক্ষুদ্র শিব-লিঙ্গ আছে, উহা অনিরুদ্ধের পুত্র মহাত্মা ব্রজের স্থাপিত বলিয়া কথিত।

ভূতেশ্বর মহাদেব এই তীর্থাধিপতি। মথুরা বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থান, এখানে শিবের প্রাধান্য দৃষ্টে বোধ হয় পুরাকালে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিরোধ ছিল না। চৈতন্যদেবের তিরোধানে গোস্বামিগণের প্রাধান্যেই সাম্প্রদায়িকতা ও বিরোধ জন্মিয়াছে, নচেৎ মথুরাতে ভূতেশ্বর, বৃন্দাবনে গোপেশ্বর শিবলিঙ্গের প্রাধান্য লক্ষিত হইত না। চৈতন্য প্রভুর শিষ্যগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্মাবধারণে অসমর্থ হইয়া শৈবাদি ধর্ম্ম সঙ্গে নিরর্থক ধর্ম্মবিরোধ জন্মাইয়া বর্ত্তমান ভেকধারী বৈষ্ণবদলের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃত ভক্ত বিশ্বময় হরিকে সর্ব্বভূতে নানারূপে দৃষ্টি করিয়া থাকেন। সত্ত্ব রজ তমাদি গুণ ভেদে দেবমূর্ত্তির কোন প্রভেদ নাই।

মথুরার প্রধান কীর্ত্তি কেশবজীর মন্দির বাদসাহ আরংজেব কর্ত্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তাহার সন্নিকটে একটী ক্ষুদ্র টিলার উপরে বর্ত্তমান কেশবজীর মন্দির নির্ম্মিত হয়। কেশবজীর পূর্ব্ব মন্দির ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে ঐতিহাসিক বর্ণিয়ার সাহেব তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। একটী দেব মন্দিরে কত ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে, পাঠকগণ বিদেশীয় চিত্রে তাহা পাঠ করিয়া দেখিবেন।

মথুরার উত্তর দিকে যমুনাতীরে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডারা ইহাকে কংসের কিল্লা বলিয়া থাকেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, আকবর বাদসাহের সময় মহারাজ মানসিংহ এই দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অম্বরেশ্বর মহারাজ জয়সিংহ এদেশের শাসনকর্ত্তা থাকা কালে মথুরাতে জ্যোতিষ গণনা জন্য যে মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার কোন চিহ্ন নাই। কাট্‌রা নামক একটী উন্নত ভূমিখণ্ডের উপর যেখানে আরংজেবনির্ম্মিত লোহিত প্রস্তরের অর্দ্ধভগ্ন মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়, পাণ্ডারা সেই স্থানকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। নিকটস্থ একটী কুণ্ডকে পোতরা কুণ্ড

বলিয়া থাকে। সেই কুণ্ডে নব প্রসূতি দৈবকী দেবী সূতিকাগারের বস্ত্রাদি প্রক্ষালন করিয়াছিলেন। যাত্রীদিগের নিকট এই কুণ্ডের জল পবিত্র। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট আছে। উপরের একটী মন্দির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল গোপাল মূর্ত্তি আছে। পুত্রাভিলাষিণী রমণীগণ এখানে স্নান করিয়া পুত্র কামনায় মানস করিয়া থাকেন। প্রতিবর্ষে শ্রাবণি পূর্ণিমায় মথুরায় এক প্রকাণ্ড মেলা হয়, তৎকালে বহু জন সমাগম হইয়া থাকে।

মথুরা নগরীতে কার্পাস সূতার গাইট বান্ধা, বীচি ছড়ান ইত্যাদির কল কারখানা দেখিলাম। এখানে বাণিজ্য দ্রব্যের যথেষ্ট আমদানী রপ্তানি আছে। খাদ্য সামগ্রী সুলভ ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। স্থানীয় জল বায়ু ও স্বাস্থ্য ভাল। লোক সংখ্যা ৬০০০ হাজার। এখানে গোরা সৈন্যের সংখ্যা দুই হাজারেরও উর্দ্ধে। সহরের দুইদিকে দুইটী ষ্টেশন। ব্রিটিশাধিকৃত একটী সহর।

গোকুল।

মথুরা হইতে গোকুল ৩ মাইল ব্যবধান, যমুনার অপর পার। বর্ত্তমানে যে গোকুলনগরী দৃষ্ট হয়, পুরাতন গোকুল তথা হইতে আরও আট মাইল ব্যবধান। মথুরা হইতে ঘোড়ার গাড়ী কিম্বা একায় যাওয়া যায়; যমুনার উপর তরণীমালা সংযোগে যে বৃহৎ রেল-সেতু আছে, তাহার উপর দিয়া যাইতে হয়। যমুনাতট হইতে গোকুল নগরীর হর্ম্ম্যরাজি একটী সুদীর্ঘ দুর্গবৎ প্রতীয়মান হয়। এখানে পুরাতন প্রাসাদাদির যাহা কিছু চিহ্ন ও ভগ্নস্তূপ আছে, তাহা মোসলমান রাজত্বের শেষকালের বলিয়া অনুমান হয়। গোকুল নগর ও প্রাসাদ ইত্যাদি সমস্তই আধুনিক। দুর্দ্দান্ত কংসরাজার সময়ে মথুরার সন্নিকট গোকুল নগরে নন্দভবনে শ্রীকৃষ্ণকে গোপনে রাখা সম্ভবপর নহে; বিশেষতঃ প্রকৃত নন্দভবন নামক একটী স্থান দূরে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মথুরার ন্যায় গোকুলেও পুত্রাকুণ্ড ও বহু দেবমন্দির আছে। শ্রীনন্দ, যশোদা, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি, এবং দধিমন্থনদণ্ডধারিণী যশোদা মাতৃমূর্ত্তি, পুতনা বধ, ও শ্রীকৃষ্ণের দোলা দেখাইয়া যাত্রিগণ হইতে একটী একটী পয়সা আদায় করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন প্রদর্শনকারী পাণ্ডা চারি আনা হইতে একটাকা পর্য্যন্ত লইয়া থাকে।

———

গিরি গোবৰ্দ্ধন।

গিরিগোবৰ্দ্ধন ভরতপুর রাজধানীর নিকটবৰ্ত্তী। এখানে ভরতপুর রাজন্যবর্গের সমাধি ক্ষেত্র বা শ্মশান ভূমি। দুইটী পুষ্করিণীর তটে সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট প্রস্তরনির্ম্মিত অনেক মন্দির আছে, তন্মধ্যে বলদেব সিং নির্ম্মিত শ্বেত মর্ম্মরের কারুকার্য্যখচিত বিচিত্র মন্দিরটী বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পুরাণে বর্ণিত আছে, নন্দরাজ প্রভৃতি ইন্দ্রপূজা করিতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার সময় এইরূপ পৌত্তলিকতা রহিত করিবার বাসনায় ইন্দ্রপূজা বন্ধ করিয়া অনাদি ব্রহ্মের পূজা প্রচলন জন্য প্রকৃতির সুমহান লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনের সন্নিকট গিরিগোবৰ্দ্ধনে গোপবৃন্দ সহ মিলিত হইয়া সেই অচিন্ত্যশক্তি জ্যোতির্ম্ময়ের পূজা অর্চ্চনা করিয়া স্তূপাকারে অন্ন পানীয়াদি দীনদুঃখীকে বিতরণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ ইহাকেই গিরিগোবৰ্দ্ধনের পূজা ভাবিয়া ইন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করিয়া সুন্দর কবিত্বপূর্ণ অলৌকিক আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন।

সমাধি মন্দিরের একপার্শ্বে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মন্দির আছে। তাহাকে কানাই বলাই মন্দির নামে পরিচয় দিয়া থাকে। গোবৰ্দ্ধনের সর্ব্বোচ্চস্থানে মানস গঙ্গা নামে একটী সরোবর আছে। তাহাই পাণ্ডাদিগের করতলগত তীর্থ স্থান। তীর্থযাত্রীরা এখানে স্নান তর্পণ করিয়া থাকেন। মানস গঙ্গার পারে গোবৰ্দ্ধনদেবের মন্দির। এই পর্ব্বতের উপরেই গোবিন্দজিউর মন্দির ও মূর্ত্তি ছিল। সেই মূর্ত্তি মহারাজ মানসিংহ বৃন্দাবনে স্থাপন করিয়াছিলেন। আবার আওরেঙ্গজেবের দৌরাত্ম্যে তথা হইতে মহারাজ জয়সিংহ রাজধানী জয়পুরে আনিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই গোবৰ্দ্ধনের উপলক্ষে অন্নকুট উৎসব হইয়া থাকে। যাত্রিগণ এখানে প্রসাদ পাইয়া থাকেন। প্রসাদ মধ্যে পায়সান্নই প্রসিদ্ধ।

পুষ্কর তীর্থ

"পুষ্করং ব্রহ্মণঃ স্থানং তীর্থরাজেতি নাম্না খ্যাতং।
তত্র ত্রিসন্ধ্যাং দশকোটিতীর্থাণ্যায়ান্তি।
তস্য ফলম্ অশ্বমেধতুল্যং ব্রহ্মলোকগমনঞ্চ।"

জয়পুর হইতে পুষ্কর তীর্থ দর্শন করিতে হইলে, আজমীর হইয়া যাইতে হয়। জয়পুর হইতে আজমীর ৮৪ মাইল—ভাড়া ৸৹ আনা মাত্র। কলিকাতা হইতে আজমীর ১০২৬ মাইল;—ভাড়া ৯৷৶৬ পাই। আমরা দিল্লী যাইবার পথে আজমীর হইয়া জয়পুরে আসিয়াছিলাম। সুতরাং পুষ্কর তীর্থ দর্শন আমাদের পূর্ব্বেই হইয়াছিল। আজমীর হইতে পুষ্কর তীর্থ প্রায় ৭ মাইল পথ ব্যবধান। আজমীর না হইয়া পুষ্করে যাইবার অন্য পথ নাই। রাজপুতনা মধ্যে আজমীর প্রসিদ্ধ স্থান ও ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের রাজপুতনার হেড্‌কোয়াটার। এখানে দেখিবার অনেক জিনিষ আছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই আজমীরে তীর্থ দর্শন উপলক্ষে আসিয়া থাকেন। রেল ষ্টেশনে প্রতিদিন অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হয়। হিন্দু যাত্রিগণ পুষ্করতীর্থ দর্শনার্থে আজমীর ষ্টেশনে অবতরণ করেন। ভারতের সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় মৈনুদ্দীন চিস্তির সমাধি দরগা দর্শনার্থে এখানে আসিয়া থাকেন। হিন্দু মুসলমান উভয়েই এই দরগাকে ভক্তির সহিত দর্শন করেন। হিন্দু পাণ্ডাদিগের ন্যায় যাত্রী সংগ্রহ করিবার জন্য দরগায় বহু সংখ্যক মুসলমান নিযুক্ত আছে। তাহারা যাত্রী আসিলে তাঁহার হস্তে একটী পুষ্প দিয়া বরণ করিয়া থাকে। পুষ্প দিবার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি পুষ্প দিয়া প্রথমে বরণ করে সে ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহাকে দরগা দর্শন করাইতে পারে না।

ষ্টেশনের পশ্চাৎদিকেই পুষ্করের শত শত পাণ্ডা যাত্রী সংগ্রহ জন্য উপস্থিত থাকে। সকল তীর্থেই পাণ্ডার একাধিপত্য। যাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ কি নিজেরা কখন আসেন নাই, তাঁহারা বিবেচনা পূর্ব্বক একজনকে পাণ্ডা বলিয়া স্বীকার করিলেই আপদ চুকিয়া যায়। আমরা যে পাণ্ডাকে প্রথম দর্শন করিয়াছিলাম তাহাকেই পাণ্ডা স্বীকার করিলাম। আজমীর খুব সমৃদ্ধিশালী বড় সহর। এখানকার সরাইগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অন্যস্থানে এমত সুবিধাজনক সরাই ক্বচিৎ পাওয়া যায়। আজমীরের প্রাচীন নাম ইন্দ্রকোট। চোহান বংশীয় রাজা অজয়পাল কর্ত্তৃক খৃষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দিতে এই নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান আজমীর সহর মোগল রাজত্ব সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু এক সময়ে ইহা যে প্রাচীন হিন্দু রাজন্যবর্গের কীর্ত্তিকলাপসমূহে ভূষিত ছিল তাহার বহুচিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। চৌহানবংশীয় পৃথ্বীরাজের প্রকাণ্ড দুর্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান। হিন্দু দেব-মন্দির সকল ভগ্নাবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মাড়োয়ারী এখানকার প্রধান বাসিন্দা; সহরটী অতি সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিকে বৃক্ষলতাদি পরিশূন্য অভ্রভেদী শৈলরাজি, মধ্যস্থলে অসংখ্য ধবলকান্তি হর্ম্ম্যরাজি সুবৃহৎ কাননে যেন পুষ্পবৎ প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। অদূরে পর্ব্বতের ঢালু অঙ্কে ও সানুদেশে বাড়ী ঘরগুলি যেন স্তরে স্তরে ঝুলিয়া রহিয়াছে। দূর হইতে এই দৃশ্যটী দেখিতে বড়ই মনোহর। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের সহিত, ব্রিটীশ রাজ্যের কৃত্রিম শোভা সম্পদের সংমিশ্রণে, আজমীর পরম রমণীয় আকার ধারণ করিয়াছে। আজমীরে দর্শনীয় মধ্যে আড়াই দিনকা ঝম্‌প্রা, মৈনুদ্দিন চিস্তির দরগা, তাড়াগড়দুর্গ, মেও কলেজ, ঘণ্টাস্তম্ভ, অনাসাগর ও ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের দোকান, মিল ইত্যাদি। ফকীর সাহ মৈনুদ্দিনচিস্তি সম্বন্ধে জানা যায় যে, তিনি পারশ্যদেশীয় একজন মহাপুরুষ ছিলেন। আজ-

মীরেই এই দৈবশক্তিসম্পন্ন ফকীরের সমাধি হয়। এই পবিত্র কবর দর্শন উদ্দেশ্যে দূরদেশ হইতে বহুলোক আগমন করিত। কথিত আছে, আকবর বাদসাহ পুত্রাকাঙ্ক্ষী হইয়া এই ফকীরের দরগায় শরণাপন্ন হন; এবং শপথ করেন যে, যদি তাঁহার সুসন্তান হয় তবে তিনি স্বয়ং পদব্রজে দরগায় আসিয়া সিন্নি দিবেন। দৈবানুগ্রহে বাদসাহজাদা সেলিমের জন্ম হইলে, আকবর সাহ পদব্রজে, প্রায় দেড়শত মাইল দূরবর্ত্তী আজমীর সহরে, ফকীর সাহেবের দরগায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই দরগা মধ্যে আকবর সাহ ও সাজাহান বাদশার সুরম্য দুইটী শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত মস্‌জিদ্ আছে। হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুরের বহু অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মিত নানাবিধ ঝাড় লণ্ঠন পরিশোভিত, সুপ্রশস্ত একটী অট্টালিকা আঙ্গিনার দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত আছে। ইহার নিকটে দুইটী প্রকাণ্ড চুলার উপরে দুইটী লৌহপাত্র আছে। প্রতিদিন ইহাতে ৬০ মণ চাউল রন্ধন করিয়া দীন দুঃখী ও দরগার মুসলমান যাত্রীদিগের আহার দেওয়া হইত। পূর্ব্বোক্ত আঙ্গিনার পরে অন্য একটী আঙ্গিনার পার্শ্বেই ফকীর সাহেবের সমাধি মন্দির অতুল ধনরত্ন ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। কবরের চতুর্দ্দিকে রৌপ্য নির্ম্মিত রেলিং; উপরে জরীর সূক্ষ্ম কাজ করা চন্দ্রাতপ, কপাটগুলি সমস্তই রৌপ্য নির্ম্মিত, এতদ্ভিন্ন বহুমূল্যের পাথর ও স্বর্ণাদি নির্ম্মিত নানাবিধ দ্রব্যাদিতে মন্দিরের এক অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে। শুনা যায় আফ্‌গানিস্থানের আমীর বাহাদুরও এই দরগা দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

আজমীরের বর্ণনা করিতে করিতে পুষ্করতীর্থের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমরা নির্ব্বাচিত পাণ্ডাসঙ্গে একটী ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আজমীরের পশ্চিমদিকস্থ আগ্রাগেট হইতে বাহির হইয়া পুষ্করের পথে ধাবিত হইলাম। আজমীর সহরের পশ্চিম দিকেই অনাসাগর নামে এক সুবৃহৎ হ্রদ। তাহার পূর্ব্বপারে ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের সুমনোহর

অট্টালিকাসমূহ নানাবিধ বৃক্ষাবলীর মধ্যে শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। স্বচ্ছসলিলা অনাসাগরের পশ্চিমদিকেই অভ্রভেদী গিরিশ্রেণী, পর্ব্বতের নিম্নে স্বভাবসুন্দর অনাসাগরের সৌন্দর্য্যরাশি যেন আরও বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। দক্ষিণদিকস্থ পর্ব্বত উপত্যকাভূমে নানাবিধ বৃক্ষসমন্বিত ছোট ছোট গ্রামগুলি যেন পর্ব্বত গাত্রে মিলিয়া রহিয়াছে এমত বোধ হইল। আমাদের গাড়ী অনাসাগরের পার দিয়া একটী উচ্চ পর্ব্বতের সানুদেশে আসিয়াছিল। পর্ব্বতের গাত্রভেদ করিয়া শিখরে শিখরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটী সুপ্রশস্ত রাস্তা পুষ্করের দিকে গিয়াছে। আমরা কখন হাঁটিয়া কখন গাড়ীতে বসিয়া পর্ব্বত পার হইলাম। এখানকার দৃশ্য বড়ই মনোহর। যাঁহারা দার্জ্জিলিং রেলে ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। রাস্তাটী কখন পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া, কখন পর্ব্বতের বক্ষ ভেদ করিয়া বিচিত্র কৌশলে উভয়পার্শ্বের স্তূপাকার পাথরগুলি কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। আমাদের গাড়ী কখনও ভিতরে ঢুকিয়া অদৃশ্য হইল, কখনও বাহির হইয়া পর্ব্বতগাত্রে যেন চিত্রিত হইল।

আমাদের অগ্রগামী গাড়ীসকল পর্ব্বতের একটী মোড় পার হইয়া আমাদের মাথার উপর দিয়া যাইতে লাগিল। আবার পরক্ষণেই অদৃশ্য হইল। যেন পর্ব্বতমধ্যে দানব সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতে লাগিল। রাস্তাগুলি ঢালু, উপরে উঠিবার সময় আমরা গাড়ীতে ছিলাম। কিন্তু নিম্নদিকে নামিবার সময় ভয়ে গাড়ী হইতে নামিয়া হাঁটিয়াই গেলাম। এই পর্ব্বতটী দুই মাইলেরও অধিক হইবে। পর্ব্বত পার হইয়া দুই মাইল পরেই আমরা পুষ্করতীর্থে উপনীত হইলাম। পুষ্করতীর্থ একটী হ্রদ, চতুর্দ্দিকের পরিধি প্রায় দুই মাইল। তিনদিকেই পর্ব্বত। সম্মুখের পর্ব্বত বড়ই উচ্চ। পর্ব্বত হইতে বৃষ্টিবারি পতিত হইয়া এই পুষ্করে জমা হয়। একেই পুষ্কর স্বাভাবিক গভীর তাহাতে আবার পর্ব্বতের বারিপাতে ইহার জল বড় হ্রাস হয় না। অল্প কতকটুকু স্থান ভিন্ন প্রায় চারিদিকেই পাষাণ নির্ম্মিত

সোপানাবলি ও তৎসংলগ্ন স্বাধীন নৃপতিবৃন্দ ও ধনিগণের অট্টালিকাসমূহ। পুষ্কর আদি ব্রহ্মতীর্থ; ইহাকে তীর্থরাজ কহে। মহাভারতে তীর্থ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে, যিনি পুষ্করতীর্থে আসিয়া স্নান করিবার বাসনা করেন তাঁহারও পাপ দূর হয়। এখানে স্নান ও তর্পণের ফল অসীম। পুষ্করের প্রাকৃতিক শোভা আমার নিকট বড়ই সুন্দর বোধ হইল। উর্দ্ধে অনন্ত নীল আকাশ সম্মুখে যতদূর চক্ষু যায় কেবল পর্ব্বতশিখরই দৃষ্ট হয়; যেন গগনের সহিত মিলিয়া ইহাই মরজগতের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছে। নিম্নদিকে নির্ম্মলসলিলা অগাধ বারিপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ সরোবরটী চতুর্দ্দিকের অট্টালিকাসমূহ যেন বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এবং তাহার স্বচ্ছ সলিলে অসংখ্য পর্ব্বতচূড়ার নীল ছায়া পতিত হইয়া সরোবরটী স্বয়ংই যেন নীলিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার বক্ষগত সোপানোপরি বসিয়া চতুর্দ্দিকের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যরাশি একাগ্রমনে ভাবনা করিলে সেই অদৃশ্যহস্ত নির্ম্মাতার প্রতি মনের যে ভাব হয় তাহা বর্ণনাতীত, যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন। ফলতঃ তীর্থসকল মধ্যে পুষ্কর ও হরিদ্বারই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। পুষ্কর তীর্থে স্নান, তর্পণ ও পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এখানে পাণ্ডার ব্যবহার মন্দ নহে। আমরা যাহা দিলাম তাহাতেই মহাবীর পাণ্ডা মহাশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এবং আমাদিগকে সুফল দিবার পূর্ব্বে নিজবাটীতে নিয়া প্রসাদ দিয়াছিলেন; পুষ্কর মধ্যে অসংখ্য মৎস্য আছে। ঘাটের মধ্যে বুট ভাজা ফেলাইয়া দিলে একেবারে শত শত মৎস্য লাফাইয়া উঠে। দেখিতে আমোদ লাগে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার মধ্যে বহুতর কুম্ভীর বাস করে। পুষ্করের তটে দাঁড়াইলেই চতুর্দ্দিকে কুম্ভীর সকল ভাসিয়া বেড়াইতেছে দেখা যায়। এখানে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। সাবিত্রী মন্দির অতি উচ্চ পর্ব্বত শিখরোপরি স্থাপিত, তাহা দর্শনকরা আয়াসসাধ্য। ব্রহ্মার যজ্ঞভূমি বলিয়া ব্রহ্মার মন্দিরই এস্থানে সর্ব্বপ্রধান। একটী উচ্চবেদীর উপর

প্রাচীরবেষ্টিত মন্দির। সিঁড়ি দিয়া সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে হয়। ফটকের উপর বহুতর হংসের প্রতিমূর্ত্তি আছে। মন্দির মধ্যে চতুর্ম্মুখ প্রজাপতি উচ্চাসনে উপবিষ্ট। দুই পার্শ্বে আরও কয়েকটী দেবমূর্ত্তি আছে। ফটকের সম্মুখে দুইটী শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত হস্তী আছে। এতৎভিন্ন বিষ্ণু মন্দির ও শিবমন্দির আছে। বিষ্ণুমন্দিরে বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মূর্ত্তি। মহাদেবের মন্দিরটীর মধ্যে গাঢ় অন্ধকার। সিঁড়ি দিয়া প্রদীপের সাহায্যে নামিতে হয়। পুষ্কর তীর্থের দেবমন্দিরগুলি উচ্চ পর্ব্বতশিখরে স্থাপিত। ইহার নির্ম্মাণকৌশল প্রশংসনীয়। এখানে একটী বিশেষত্ব এই যে,—দেবমূর্ত্তিগুলি প্রায়ই বৈদিক যুগের প্রথমাবস্থার। পুষ্কর তীর্থে পাণ্ডাগণ ভিন্ন অন্য লোকের বাস অধিক নহে। এখানে খাদ্য সামগ্রী তত সুবিধাজনক নহে। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ অসুবিধা, জিনিষ ও দোকানের সংখ্যা কম। রাস্তা ঘাটগুলি অপরিষ্কার ধূলি পরিপূরিত। বাড়ীগুলিও পুরাতন। এখানে দ্বাদশ বৎসর অন্তরে কুম্ভ মেলা হয়।

কুরুক্ষেত্র তীর্থ।

"কুরুক্ষেত্রেচ গুল্‌ফঃ
স্থাণু নাম্নী চ সাবিত্রী অশ্বনাথস্তু ভৈরবঃ।"
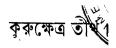
আমরা হরিদ্বার হইতে "ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র" দর্শনাভিলাষে সাহারণপুর ও আম্বালার পথে থানেশ্বর ষ্টেসনে আসিয়াছিলাম। পথিমধ্যে উল্লেখ-যোগ্য রুরকী সহর দেখিলাম ; রুরকী সহরে ভারতের সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে ; এখানে সৈন্যাবাস, মানমন্দির, বোটানিকেল গার্ডেন, গঙ্গার কেনেল, ডিস্পেন্সেরী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সাহারণপুর হইতে ইহা ২২ মাইল মাত্র ব্যবধান। তৎপর আম্বালা ষ্টেসন। আম্বালা পঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে বিখ্যাত সহর, ষ্টেসনটী বিস্তীর্ণ। এখান হইতে ভারতের দ্বিতীয় রাজধানী সিমলা ৯৪ মাইল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই সহর প্রতিষ্ঠিত হয়, অম্বা নাম্নী প্রতিষ্ঠিতা দেবী হইতে আম্বালা হইয়াছে। এই নগর দুইভাগে বিভক্ত ; কেণ্টনমেণ্ট ও সিটি। সৈন্যনিবাস বা ছাউনিকে কেণ্টনমেণ্ট কহে। সিটিতে বিচারালয় প্রভৃতি অবস্থিত। আম্বালার একদিকে বৈদিক সময়ের পূতসলিলা সরস্বতী ও অন্যদিকে দৃশদ্বতী প্রবাহিতা। আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এক সময়ে এখানে আর্য্যগণের সামগানে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইত। এই পঞ্চনদ প্রদেশই আর্য্যগণের অতীত গৌরবকাহিনীভূষিত পুণ্যতম ভূমি। অদ্যাপি সরস্বতীর পবিত্র সলিলে স্নানার্থে বহুলোকের সমাগমে প্রতি বৎসর মেলা হইয়া থাকে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল লাইনে থানেশ্বর নামক একটী ক্ষুদ্র ষ্টেসন আছে,

ইহা দিল্লী হইতে ৯৭ মাইল, ভাড়া ১।৯ পাই এবং হাবড়া হইতে ১০০৯ মাইল, ভাড়া ৯।৶০ আনা। ষ্টেসন হইতে সহর দেড়মাইল এবং তথা হইতে অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানেই সমন্তপঞ্চক দ্বৈপায়ন হ্রদ নামক কুরুক্ষেত্র তীর্থ।

থানেশ্বর বা স্থানীশ্বর সহর কুরুক্ষেত্রের তীর্থপতি স্থানুদেবের নাম হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র মহাপীঠ। সতীদেবীর গুল্‌ফ এখানে পতিত হইয়াছিল; দেবীর নাম সাবিত্রী, এবং ভৈরবের নাম অশ্বনাথ। কুরুক্ষেত্র বৈদিকযুগের অতি প্রাচীন পবিত্র তীর্থ। বেদের ব্রাহ্মণভাগে এই তীর্থের নাম দৃষ্ট হয়। আর্য্য উপনিবেশের আদিস্থান; উত্তরে দৃশদ্বতী ও দক্ষিণে সরস্বতী; ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানই ব্রহ্মর্ষি প্রদেশ বলিয়া খ্যাত, বৈদিক দৃশদ্বতীনদী,—বর্ত্তমান ঘাগরা নদী। বেদে উল্লিখিত হইয়াছে, সরস্বতী তটে স্বয়ং ব্রহ্মা বেদী স্থাপন করিয়া প্রথম যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করেন; তদবধি ইহা পুণ্যময় ব্রহ্মবেদী নামে আখ্যাত হইয়াছে।

মহাভারতে বর্ণিত আছে, কুরুরাজা এই পবিত্র ক্ষেত্রে স্বয়ং হাল চাষ করিয়া একটী মহৎযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এবং কুরুরাজার নামানুসারে ইহার নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। আদিকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধচারণ ও গন্ধর্ব্বগণ সর্ব্বদা এই তীর্থের সেবা করিতেন। মহাভারত বর্ণিত ভারতযুদ্ধের লীলাভূমি এই কুরুক্ষেত্র। এই পুণ্য ক্ষেত্রে হিমালয় হইতে কুমারিকা, গান্ধার হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ (আসাম) সমস্ত ভারতের বীরাগ্রগণ্য ক্ষত্রিয় বংশীয় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী (অর্থাৎ ২৫ লক্ষ) সৈন্য অষ্টাদশ দিবস ব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া চিরদিনের জন্য ভারতকে নির্বীর্য্য ও পরাধীন করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে, যুদ্ধস্থান নির্ণায়ক পর্ব্বাধ্যায় কুরুক্ষেত্রের পুণ্যবত্তা এবং এই স্থানে মৃত্যু হইলে নিশ্চয় স্বর্গ প্রাপ্তির সবিশেষ উল্লেখ করিয়া উভয় পক্ষে যুদ্ধের জন্য এই স্থানটি নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল। ইহা সুবিস্তীর্ণ সমতল

প্রান্তর ভূমি, ৮৪ যোজন পরিধিবিশিষ্ট। এই স্থানের মৃত্তিকা কঠিন ও লোহিত রাগ রঞ্জিত; পাণ্ডারা ইহাকে যুদ্ধক্ষেত্রের শোণিতে লোহিত বর্ণ হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করেন। এই প্রান্তর ভূমি বড়ই অনুর্ব্বর, চতুর্দ্দিকে জঙ্গল পরিপূর্ণ; এথানে কোন ফসল উৎপন্ন হয় না, অদ্যাপি পরিত্যক্ত ভাবেই রহিয়াছে, ক্বচিৎ দুই চারিটী পশুপালনোপযোগী বসতি হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের পরিধি মধ্যে বহুতর তীর্থ আছে, কেহ কেহ সংখ্যা গণনায় ৩৬০ তীর্থের উল্লেখ করিয়াছেন। থানেশ্বরের নিকট কন্যাদ্বার, স্বর্ণদ্বার, সোমতীর্থ, দ্বৈপায়ন, রামতীর্থ, রামহ্রদ, স্থানীশ্বর, পঞ্চবটী প্রভৃতি প্রধান। দ্বৈপায়ন তীর্থকে কেহ কেহ দধীচি তীর্থও বলিয়া থাকে। দধীচি মুনির অস্থিদ্বারা বজ্র অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। মুনির নিকট অস্থি যাচ্ঞা করিলে মুনি পরোপকারার্থে আত্মজীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন। তীর্থ সকলের মধ্যে পাঁচটী পুণ্যপ্রদ হ্রদ আছে; তন্মধ্যে দ্বৈপায়ন সমন্তপঞ্চক হ্রদই শ্রেষ্ঠ।

পাণ্ডু বংশের শেষ রাজা ক্ষেমক নরপতির সময় পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্র চন্দ্রবংশীয় রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। পরে কান্যকুব্জাধিপতির অধিকার ভুক্ত হয়। বৌদ্ধ যুগে গুপ্ত সম্রাটদিগের অধীনে স্থানেশ্বরে প্রভাকর বর্দ্ধন রাজত্ব করিতেন, তাহা সমুদ্র গুপ্তের লৌহস্তম্ভের বর্ণনাতে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। প্রভাকর বর্দ্ধনের পুত্র মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর, অর্দ্ধ শতাব্দি পর্য্যন্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ হর্ষবর্দ্ধন নামে থানেশ্বরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই হর্ষবর্দ্ধনই রত্নাবলী নাটকের রচয়িতা। বানভট্ট প্রভৃতি মহা কবিগণ কর্ত্তৃক পরিশোভিত তদীয় সভা সরস্বতীর লীলা নিকেতন বলিয়া তৎকালে কথিত হইত। বানভট্ট রচিত শ্রীহর্ষ চরিতে এতৎ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ আছে। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন প্রদত্ত তাম্র শাসন যাহা লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে সুরক্ষিত আছে, তৎপাঠেও এই সকল

বিবরণ অবগত হওয়া যায়। চীন পরিব্রাজক হিউয়নথ্ সঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই রাজার বিষয় উল্লেখ আছে। তিনি অস্থিপুর নামক এক গ্রামের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারত যুদ্ধে হত সৈন্যাদির কঙ্কাল রাশি হইতে ঐ গ্রামের নামানুকরণ হইয়াছিল, এমত লিখিয়া গিয়াছেন।

এই থানেশ্বরেই মোসলমান রাজত্বের সূত্রপাত হয়। থানেশ্বর সহরটী কুরুক্ষেত্রতীর্থান্তর্গত ভূমি। ইহা দীর্ঘকাল হইতে নগরীরূপে পরিণত হওয়ায়, কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরের ন্যায় ভীষণ জঙ্গল নহে। এই পুণ্য ক্ষেত্রেই দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজ মহাম্মদ সাহেব উদ্দিন ঘোরীর যুদ্ধে পরাজিত ও স্বর্গগত হন এবং তৎসঙ্গে ভারতের আর্য্য গৌরব ও রাজলক্ষ্মী চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুগে যুগেই মহাযুদ্ধক্ষেত্র। মোসলমান আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার বহুতীর্থ ও দেব মন্দিরাদি লুপ্ত হইয়াছে। পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের পূর্ব্বে গজনী অধিপতি সুলতান মামুদ ভারত লুণ্ঠনে আগমন করিয়া কুরুক্ষেত্রের বহু দেবদেবীর মন্দির ভগ্ন ও ধন রত্নাদি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তৎকালে চক্রস্বামী নামক বিষ্ণু মূর্ত্তির সুদৃশ্য মন্দির অসংখ্য ধনরত্নে পরিপূর্ণ ছিল, সুলতান মামুদ ঐ মন্দির ধূলিসাৎ করিয়া অপরিসীম ধনরত্নাদি লইয়া যান। হিন্দু দেবদ্বেষী সম্রাট আরঙ্গজেব এই তীর্থটী লোপ করিবার মানসে, কুরুক্ষেত্র প্রান্তর মধ্যবর্ত্তী একটী হ্রদ মধ্যে যে চতুষ্কোণ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তাহার উত্তর ও দক্ষিণদিকে দুইটী সেতু নির্ম্মাণ করিয়া একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করতঃ একজন মোসলমান সেনাপতির অধীনে কতকগুলি সৈন্য রক্ষা করিয়াছিলেন এবং যাহাতে এই তীর্থে যাত্রী সমাগম না হয় তাহা সর্ব্বথা বারণ করিয়াছিলেন।

দুর্গস্বামী, বাদসাহের আদেশে তীর্থযাত্রীদিগকে তীর, বর্ষা ও বন্দুকের গুলির আঘাতে নিরীহ পশুর ন্যায় বধ করিতেন। এই দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহাকে মোগলপাতা দুর্গ কহে। পাণ্ডাগণ

গল্প করিয়াছেন, একবার কোন উপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হয়; সেনাপতি যাত্রীদিগকে তীর্থস্নানে বাধা দিলে যাত্রিগণের সঙ্গে একটী যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে মোগল সৈন্য ধ্বংস হইয়া যায়। এখানে পাণ্ডার সংখ্যা পূর্ব্বে দুই সহস্র ছিল, কিন্তু মহামারীতে নষ্ট হইয়া এখন ছয় শত ঘর আছে, এমত জানা যায়। এখানে জলের বড় অভাব, স্বাস্থ্য ভাল নহে। চতুর্দ্দিকে পাণ্ডাগণের পরিত্যক্ত ইষ্টকালয়গুলি মনে বিভীষিকা উৎপাদন করে।

থানেশ্বর হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত সমন্তপঞ্চকতীর্থ নামক দ্বৈপায়ন হ্রদ অর্দ্ধ মাইল ব্যবধান। হ্রদের উত্তরদিকে বৃহৎ বৃহৎ অসংখ্য আম্রবৃক্ষসমূহ মর্কট কুলের আশ্রয় হইয়া ইহাদের প্রাচীনত্ব ঘোষণা করিতেছে। হ্রদটী দৈর্ঘ্যে অর্দ্ধ মাইল হইবে, প্রশস্ত বড়ই কম, ক্রমশঃই যেন চড়া পড়িয়া ভরট হইতেছে। উত্তর ও পশ্চিম পাড়ে সিঁড়ি বাঁধা কয়েকটী ঘাট আছে। ঘাটগুলি ঘনসন্নিবেশিত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাবলীর শাখা পল্লবাদিদ্বারা সমাচ্ছন্ন, এই নিমিত্ত দিবসে প্রখররৌদ্রের সময়েও সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে না পারায় শীতল ও শান্তিপ্রদ। প্রত্যেক ঘাটেই পোস্তা বাঁধিয়া হ্রদের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, যাত্রিগণ ঐসকল পোস্তার উপর বসিয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন। পিণ্ডগুলি জলে নিক্ষেপ করা মাত্র শৈবালজাল আচ্ছাদিত বৃহৎ বৃহৎ কচ্ছপগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকে। হ্রদের তটেই নানাবিধ দেবদেবীর মন্দির। উত্তর পাড়ে ভৈরব অশ্বনাথ লিঙ্গের মন্দিরই শ্রেষ্ঠ। পশ্চিম তটে সাবিত্রী নাম্নী পীঠেশ্বরী দেবীর সুবৃহৎ অট্টালিকা, উপরে উচ্চ মঠ। আমরা এই প্রকাণ্ড বাড়ীর দ্বিতলে উঠিয়া পূজারম্ভে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া প্রীতি অনুভব করিয়াছিলাম। এই সকল মন্দিরাদি আধুনিক বলিয়াই বোধ হইল। ইহার অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত, বোধ হয় মোসলমান অত্যাচারে পূর্ব্বকীর্ত্তি সকলের ধ্বংস হইলে ব্রিটীশ রাজত্বের প্রারম্ভে মন্দির

ও ঘাট ইত্যাদি অধিকাংশই নির্ম্মিত হইয়াছে। যাহাহউক ইহার প্রাচীনত্বের নিদর্শন বর্ত্তমান না থাকিলেও ইহাই সেই "ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র" তাহার আর কোনও সংশয় নাই। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, দ্বৈপায়ন হ্রদে স্নান দান ও পিণ্ডাদি ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। এই দেবর্ষি সেবিত পুণ্যস্থানের বায়ু বিক্ষিপ্ত ধূলি কণাও দুষ্কৃত কর্ম্মীকেও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রদান করিয়া থাকে।

দ্বৈপায়ন হ্রদ ভিন্ন এখানে বহুতর তীর্থ আছে তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সমস্ত দেখিবার সাধ্য নাই। অমৃত কূপ, অগ্নিতীর্থ, অব্যনা সঙ্গম, ইন্দ্রবারি, কাম্যবন, কৌবের তীর্থ, কৌশলি সঙ্গম, দধীচি-তীর্থ, পঞ্চবটী, মাতৃতীর্থ, যযাতিতীর্থ, বিষ্ণুপদ তীর্থ প্রভৃতি দর্শন করিতে হয়। সূর্য্য গ্রহণাদি বিশেষ বিশেষ যোগ উপলক্ষে এখানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। থানেশ্বর সহরে দুই তিনটী প্রধান প্রধান দেবালয় আছে। একটীতে বিরাট শিবমূর্ত্তি দেখিলাম। মন্দিরের সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর চারিপাড়েই সিঁড়ি বাঁধা ঘাট ; মন্দির মধ্যে অন্ধকার। প্রদীপের সাহায্য ভিন্ন দেবমূর্ত্তি দর্শন হয় না, সর্ব্বদাই প্রদীপ জ্বলিতেছে। মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড ঘণ্টা লটকান আছে। আর একটী বৃহৎ দেবালয় থানেশ্বরের পশ্চিম দিকস্থ বৃহৎ সরোবরের তটে—প্রশস্ত দ্বিতল বাটী, নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। মধ্যের মন্দিরটী নানাবিধ কারুকার্য্য সমন্বিত। সম্মুখে একটী দেবকূপ আছে, পয়সা দিয়া জল স্পর্শ করিতে হয়। প্রত্যেক মন্দিরে দেবদর্শনে একটী দুইটী পয়সা দিলেই পুরোহিতগণ সন্তোষ সহকারে আশীর্ব্বাদ দিয়া থাকেন। যাত্রী প্রদত্ত এইরূপ সামান্য আয়ের দ্বারাই ইঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। আমাদের পাণ্ডার ব্যবহার প্রশংসনীয়। ৪।৫ টাকা ব্যয় করিলেই এস্থানের কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করা যায়।

মায়াপুরী বা হরিদ্বার

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত তিষ্ঠতি॥"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

১৩১৭ সালের আশ্বিন মাসের শেষভাগে, পুণ্যতীর্থ হরিদ্বার দর্শন মানসে আমি একজন বন্ধু সহ বেনারস কেন্টনমেণ্ট হইতে আউধ রোহিলখণ্ড রেলের মেইল গাড়ীতে বেলা ১১ ঘটিকার সময় রাওনা হই। হরিদ্বার যাইতে আউড্ রোহিলখণ্ড রেলেই ব্যয়ের লাঘব হইয়া থাকে। এই রেলপথে কলিকাতা হইতে হরিদ্বার ৯২১ মাইল;—ভাড়া ৮৸৵৬। কাশী হইতে হরিদ্বার তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৪৷৹ টাকা মাত্র। আমাদের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে প্রতাপগড়, রায়বেরেলি, লক্ষ্ণৌ, সাজাহানপুর, বেরেলি ও লক্সার উল্লেখযোগ্য। লক্সার ষ্টেসনে গাড়ী বদলাইয়া আমাদের দেরাদূনগামী রেলে উঠিতে হইল। গাড়ী হরিদ্বার ষ্টেশনে আমাদিগকে নামাইয়া দিয়া দেরাদুন অভিমুখে চলিয়া গেল, তখন রাত্রি ৩টা। আমরা ষ্টেশনের মোসাফির খানাতেই রজনী যাপন করিলাম। হাস্যমুখে ঊষা সুন্দরী প্রভাত রবির কণক-কিরণে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া দর্শন দিলেন। ষ্টেশন সন্নিহিত কাননে, বিহঙ্গকুলের সুমধুর প্রভাত সঙ্গীতে, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইলাম শুভ্র তুষার কিরীট মণ্ডিত হিমাদ্রির পাদমূলে বালার্ককিরণস্নাত হরিদ্বার ষ্টেশনটি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। চারিদিকে নয়নাভিরাম দৃশ্য, পাহাড়ের উপর পাহাড়, তার উপর পাহাড়, গৌরবে মস্তক উত্তোলন করিয়া যেন মহাদেবের ধ্যানে নিমগ্ন। গিরিশিখরস্থিত কুয়াসা রাশিতে নবোদিত তপনের

কিরণরাশি পতিত হইয়া গলিত সুবর্ণধারার সৃষ্টি করিতেছিল; অভ্রভেদী পর্ব্বতমালার ক্রোড়দেশে যেন শোভাময় পুণ্যদর্শন নগরটী স্বচ্ছন্দোপবিষ্ট রহিয়াছে। আহা! কি সুন্দর! অপরূপ মনোহর বনরাজিকুন্তলা প্রকৃতির মধুর আস্যে যেন হাসি চিরবিরাজিত। দেখিতে দেখিতে ষ্টেশনের বাহিরে আসিলাম। সম্মুখে সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম,—এক দিকে নগরের বক্ষভেদ করিয়া স্নান ঘাট ব্রহ্মকুণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছে; অপরদিকে কনখলাভিমুখে গিয়াছে। উভয় পার্শ্বে রোপিত নানাবিধ নয়নাভিরাম পাদপ সমূহ। ষ্টেশনের এক পার্শ্বেই যাত্রিনিবাস ও কয়েকটী খাদ্য দ্রব্য পরিপূরিত ময়রার দোকান। এখান হইতে স্নান ঘাট ব্রহ্মকুণ্ড অন্যূন দেড় মাইল দূরবর্ত্তী। ষ্টেশনের নিকটেই এক্কা গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, মুটিয়া ইত্যাদি পাওয়া যায়। ছয় আনা ও আট আনা দিলেই যথাক্রমে এক্কা ও ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়, মোট বিবেচনায় মুটিয়ার ভাড়া চারি পয়সা হইতে তিন আনা পর্য্যন্ত হয়। আমরা এই নগরীর অপরূপ স্বর্গীয় শোভা সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, স্নান ঘাট পর্য্যন্ত পদব্রজে যাওয়াই অধিকতর প্রীতিপ্রদ মনে করিলাম। ব্রহ্মকুণ্ডের সন্নিকট কুম্ভকর্ণ নামক এক পাণ্ডার দ্বিতল বাটীতে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

হরিদ্বার—গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি পবিত্র ও নিসর্গসুন্দর মোক্ষতীর্থ। হরিদ্বারের উত্তর দিয়াই পুণ্যসলিলা সুরধুনী, শ্বেতরূপী গঙ্গা পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিতা। হরিদ্বারের অপর নাম, মায়াপুরী। ইহা সপ্ত মোক্ষধামের অন্যতম। ইহাকে হরদোওয়ারও বলিয়া থাকে। মন্ত্রাদিতে ইহা জম্বুদ্বীপাবস্থিত স্বর্ণদ্বার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ষ্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে কলিকাতার বিখ্যাত ধনী বাবু সূর্য্যমলের একটি "ধরমশালা" আছে, তাহাতে যাত্রিগণ আশ্রয় পায়। সহর মধ্যে যাত্রি-গণের থাকার জন্য পাণ্ডাদিগের ভাড়াটিয়া বাসাবাটী বিস্তর আছে। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রেসিডেণ্ট পরম যোগী মহাত্মা ভোলাগিরি বাবাজিরও

একটী ধর্ম্মশালা গঙ্গাতীরে বর্ত্তমান। এতদ্ভিন্ন গঙ্গার উত্তর পারে সাধু মোহন্তদিগের আশ্রমে ভ্রমণকারিগণ আশ্রয় পাইয়া থাকেন। এখানে রাজা, মহারাজাদিগের নির্ম্মিত অনেক অট্টালিকা আছে।

পুরাকালে এখানে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দ্বেষ, মদ, মাৎসর্য্যের স্থান ছিল না। এখানে যাত্রিগণ ভিন্ন অন্যের বাস ছিল না। সংসার-বিরাগী পরমার্থ তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণই এস্থানে বাস করিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রিগণ যাঁহারা এই পবিত্র স্থান দর্শনে আগমন করিতেন তাঁহারা স্নান ও দর্শনাদি করিয়া চলিয়া যাইতেন, বাস করিবার নিয়ম ছিল না। পাণ্ডারাও এখানে বসবাস না করিয়া সপরিবারে কঙ্খল বা কনখল নামক স্থানে বাস করিতেন; অদ্যাপিও পাণ্ডাদিগের পরিবার কঙ্খলেই রহিয়াছে। তাঁহারা স্বয়ং কিম্বা প্রতিনিধি দ্বারা হরিদ্বারের বাসা বাড়ীতে থাকিয়া নিজ নিজ ব্যবসা করিয়া থাকেন। এক সময়ে এই স্থান ধর্ম্ম সাধনের প্রধান অন্তরায় কামিনী কাঞ্চন উভয়ই বর্জ্জিত ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এক্ষণে পাণ্ডাগণ কাঞ্চন লোভের পুরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। হরিদ্বারে জীব হিংসা নাই! ভগবানের আশ্চর্য্য মহিমায় জীবজন্তুগণও যেন হিংসা দ্বেষ বর্জ্জিত। গঙ্গার নির্ম্মল শুভ্র সলিলে বৃহৎ বৃহৎ মহাশোল নামক মৎস্যগুলিকে নির্ভয়ে মানুষের নিকট বিচরণ করিতে দেখিলাম। ইহারা যাত্রিগণের প্রদত্ত পিণ্ডাদি অকুতোভয়ে ভক্ষণ করিয়া থাকে; মনুষ্যের গাত্র স্পর্শ করিয়া গমন করিতেও যেন কোন আশঙ্কা করে না। ইহাদের প্রতি কেহ কোন অত্যাচার করে না, বরং যাত্রিগণ খাদ্য দ্রব্যাদি জলে ফেলিয়া দিয়া ইহাদিগকে পরিপোষণ করিয়া থাকে। এখানে মৎস্যাদি জীবজন্তুকে আহার দেওয়াও ধর্ম্ম কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। মৎস্যের আহার জন্য এক প্রকার ভুষি আটার পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায়িগণ ১৫।২০টী এক পয়সায় বিক্রয় করিয়া থাকে। যাত্রিগণ তদ্দ্বারা মৎস্যদিগের আহার

প্রদান করে। আহারলোলুপ মৎস্যগণের পিণ্ড ভোজনের জন্য এক সঙ্গে ছুটাছুটি লাফালাফি বড়ই সুন্দর দেখায়। এমন শান্তিপ্রদ সুন্দর দৃশ্য পুরাণ বর্ণিত তপোবন ভিন্ন আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। ধন্য প্রেমময়ের প্রেমমহিমা! এখানে পশুপক্ষিগণকেও আহার দিবার বিধান আছে। গরুগুলিকে ঘাস খরিদ করিয়া আহার দিতে হয়, হৃষ্টপুষ্ট গাভী ও বৃষগণ পথিপার্শ্বে আহার লালসায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং যাত্রিগণ প্রদত্ত তৃণগুচ্ছ সুখে রোমন্থন করিতেছে। বানরসমূহ পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদিগকেও আহার (বুট, খই ইত্যাদি) দিতে হয়। হরিদ্বারই যেন বিশ্বজনীন প্রেম শিক্ষার স্থান। প্রেম দিলেই প্রেম পাওয়া যায়। আমরা যদি হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে অরণ্যের হিংস্র শার্দ্দুল ও বনের ভীষণ সর্পও আমাদিগকে দেখিয়া মস্তক অবনত করিয়া দূরে চলিয়া যাইবে। হায়! স্বার্থপর মানব! আমরা আর কতদিন সেই প্রেমময়ের জগদ্ব্যাপী প্রেম ভুলিয়া থাকিব।

আমাদের বাসাবাটীর পার্শ্বদিয়াই পাণ্ডবপ্রস্থিত স্বর্গ গমনের রাস্তা বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা হৃষীকেশ, কেদার, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি উত্তর খণ্ডস্থিত তীর্থ সকল দর্শনে গমন করেন তাঁহাদিগকে এই পথেই যাইতে হয়। বাসা হইতে নিম্নে সুরধুনী গঙ্গার সুদৃশ্য ও উর্দ্ধে ধবল তুষার মণ্ডিত হিমগিরির অভ্রভেদী শৃঙ্গ সকল সর্ব্বদা দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া আমাদের মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিত। হরিদ্বারে আসিয়া যাত্রিগণকে ব্রহ্মকুণ্ড ও গঙ্গাঘাটে স্নান তর্পণ ও তৎতীরবর্ত্তী গঙ্গা, বিষ্ণু প্রভৃতির মন্দিরে দেব দর্শন করিতে হয়। কোশাবর্ত্তঘাটে তীর্থপদ্ধতি অনুসারে পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন, দান দক্ষিণাদি প্রধান কার্য্য সম্পাদনে মায়াদেবীর মন্দির, সর্ব্বনাথ দেবের মন্দির, ভৈরব মন্দির, বিশ্বেকেশ্বর দেব, পিছোড় নাথ, ভীমগড়ের শিবলিঙ্গ, চণ্ডীর পাহাড়, গঙ্গার ত্রিধারা, সপ্তধারা, নীলধারা

প্রভৃতি দর্শন ও পূজা করিতে হয়। হরিদ্বারের কেনেল দেখিবার বিষয়।

ব্রহ্মকুণ্ড ও গঙ্গাদ্বার ঘাট।

হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটই স্নানার্থ প্রসিদ্ধ। ইহার সম্মুখে গঙ্গার স্নান ঘাট সুবিস্তীর্ণ সৈকতভূমি। প্রতিনিয়ত শত সহস্র লোক এই ঘাটে স্নান করিয়া থাকেন এবং প্রতিবর্ষের চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা উপলক্ষে এই ঘাটে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সাধু সন্ন্যাসীর সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। হরিদ্বারের জগদ্‌বিখ্যাত কুম্ভমেলা, যাহাতে দুই লক্ষের উর্দ্ধেও জনসমাগম হয় এবং সহস্র সহস্র দণ্ডী, অবধূত, পরমহংস, রামায়ত, গোস্বামী, সন্ন্যাসী ও নাগাসাধুর একত্র সম্মিলন হয়, সেই কুম্ভমেলার মহাস্নান এই ঘাটেই হইয়া থাকে। কোন কোন কুম্ভ মেলার স্নান উপলক্ষে দাঙ্গা ও জনতার নিষ্পেষণে শত শত লোকের প্রাণনাশ হইতে শুনা গিয়াছে। এই স্থানে সুরধুনী গঙ্গা স্বর্গ হইতে পর্ব্বত গাত্র ভেদ করিয়া পাষাণোপরি প্রথম অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। গঙ্গাদেবী গিরিদেহ বিচ্যুত উপলখণ্ড বিধৌত করিয়া প্রবলবেগে কুলু কুলু রবে প্রবাহিতা। গঙ্গার জল এখানে উজ্জল শ্বেতবর্ণ। বর্ষা ভিন্ন অন্য সময় ৪।৬ ফুটের উর্দ্ধে জল থাকে না। এই ঘাটকে হিন্দুস্থানিগণ হরি কি চরণ ঘাট নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। গঙ্গার ঘাটের উপর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণ চিহ্ন অদ্যাপি অঙ্কিত রহিয়াছে। এখানে স্নান তর্পণ করিতে হয়। পূজার উপকরণ পুষ্প মাল্যাদি ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মকুণ্ড নামক আদিকুণ্ড এখন বালুতে চরা পড়িয়া গিয়াছে। সন্ধ্যারতির সময় কুণ্ডের সোপানে দণ্ডায়মান পুরোহিতের হস্তস্থিত দীপাবলীর কম্পমান শিখা সঞ্চালন; একসঙ্গে সকল দেবালয়ের অসংখ্য শঙ্খ, ঘণ্টা, ভেরি, ঝাঁজরি, প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের ঐকতান, দেব দর্শনে সমাগত জনসঙ্ঘের

ভক্তিপূর্ণ উচ্ছ্বাস ও তাহাদিগের কণ্ঠোচ্চারিত হরিধ্বনি, গঙ্গাবক্ষে অগণিত প্রদীপমালার চঞ্চল আলোক সম্মুখে, খরস্রোতা নির্ম্মলসলিলা সুরধুনীর সুমধুর কুলু কুলু ধ্বনি; তট প্রান্তস্থিত হিমাদ্রির অভ্রভেদী শৃঙ্গ সমূহের সৌন্দর্য্যসম্ভার একত্র মিশ্রিত হইয়া যেন এক অব্যক্ত মহানন্দভাব হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, এবং ক্ষণকালের জন্য জগৎ সংসার ভুলিয়া সেই অনন্তময়ের অনন্ত মহিমায় আত্মহারা হইতে হয়। ভগবানের অপার করুণায় এই স্বর্গীয় ভাব যাঁহার হৃদয়ে একবার উদিত হইয়াছে তিনিই ধন্য। তাঁহারই তীর্থদর্শন সার্থক হইয়াছে। ব্রহ্মকুণ্ডের তটস্থিত দেব মন্দিরগুলির বারান্দায় ছোট ছোট বালকগণের ময়ূরপুচ্ছ শোভিত চূড়া, হস্তে মোহন বেণু, পরিধানে ধড়া, চন্দনচর্চ্চিত গোপাল ও রাখালাদি বেশ একটী চমৎকার দৃশ্য।

কোশাবর্ত্ত ঘাট—ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্ব্বদিকেই অবস্থিত। এখানে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিলে তাঁহারা বিষ্ণুর স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন, শাস্ত্রের এমন বিধান আছে। আমাদের পাণ্ডা-মহাশয় পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন; পুরোহিতও ভাল সংস্কৃতভাষী ছিলেন। তাঁহার কথিত মন্ত্রাদি সুস্পষ্ট এবং শ্রুতি-মধুর। কোশাবর্ত্ত ঘাট সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, একজন ঋষি ধ্যানমগ্ন ছিলেন, গঙ্গাদেবী পর্ব্বত হইতে বেগে পতিত হইয়া স্রোত-বেগে ঋষিবরের কোশা কোশী ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, ঋষিপ্রবর ধ্যানভঙ্গে আপন কোশাকোশী দেখিতে না পাইয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যোগবলে গঙ্গাদেবীকে আকর্ষণ করিলে গঙ্গাদেবী মুনিবরের কোশাকোশী প্রত্যর্পণ করিয়া দেওয়ায়, এই ঘাট কোশাবর্ত্ত নামে আখ্যাত হইয়াছে।

মায়াদেবীর মন্দির—হরিদ্বারে দেবমন্দির সকল মধ্যে মায়াদেবীর মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা দক্ষিণ দিকে হিমালয়ের এক অত্যুচ্চ শৃঙ্গোপরি অধিষ্ঠিত। পণ্ডিত ক্যানিংহাম সাহেবের বিবরণীতে এই

মন্দির একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া উল্লেখ আছে। দেবমূর্ত্তি ত্রিমুণ্ডধারিণী, চতুর্ভুজা, এক হস্তে নরকপাল, দ্বিতীয় হস্তে চক্র, তৃতীয় হস্তে শিবশক্তি ত্রিশূল, চতুর্থ হস্ত অভয় বরপ্রদ। ত্রিলোকজননী মহামায়া পাপী তাপী সন্তানবর্গকে অভয় দান করিয়াই যেন স্বর্গপথে করুণাময়ী মার নিকট যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

সর্ব্বনাথ দেব—সর্ব্বনাথ দেবের মন্দিরের দৃশ্যটী সুন্দর বটে। মন্দির মধ্যে আদিদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দিরের উপরে নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত বহু চূড়া দূর হইতে বাঁশের ঝাড়ের মত দৃষ্ট হয়। আঙ্গিনার চতুর্দ্দিকেই দ্বিতল অট্টালিকাসমূহ গাম্ভীর্য্য ভাবপ্রদায়ক। যাত্রিগণ স্নান তর্পণাদি করিয়া দেবাদিদেব দর্শন করেন, দক্ষিণাদির কোন পীড়াপীড়ি নাই। ২।১টী পয়সা দর্শনি দিলেই সমস্ত পুরোহিতগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। এই মন্দিরের নিকটই যেন রাজার আবাস ভূমি।

কনখল।

"তথা কনখলং তীর্থং নাম গুহ্যং পরং মম।
স্নানমাত্রেন তত্রাপি নাকপৃষ্টে স মোদতে॥"

হরিদ্বারের পূর্ব্বদিকে দুই মাইল অন্তরে কন্‌খল বা কঙ্খল। এই স্থানেই দক্ষ প্রজাপতির রাজধানী ছিল। শিববিহীন যজ্ঞে, পতি নিন্দা শ্রবণে, সতীদেবী নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পিতৃসমক্ষে তনুত্যাগ করেন। মহাদেব এই দুঃসংবাদ শ্রবণে ক্রোধপরবশে বীরভদ্র প্রভৃতি সেনানী সহ দক্ষালয়ে উপনীত হইয়া দক্ষের যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার কৃপায় দক্ষের স্কন্ধদেশে ছাগমুণ্ড আরোপিত করিয়া জীবন দান করা হইয়াছিল। পাণ্ডাগণ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দুই হাত একটী যজ্ঞ কুণ্ড দেখাইয়া যাত্রিগণ হইতে কিছু দক্ষিণা লইয়া থাকে। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত একটী দেবালয়, কয়েকটী ঘরে নানাবিধ দেবমূর্ত্তি আছে, বীরভদ্রের এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তিও তৎসহ স্থান পাইয়াছে। প্রাঙ্গণ মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ আছে, অসংখ্য বানর তাহাতে লাফালাফি করিয়া থাকে, কিছু খাদ্যদ্রব্য ছড়াইয়া দিলে তাহারা সকলেই আহার করে। বাড়ীটি প্রাচীন না হইলেও সেই আদি গঙ্গা, প্রাচীরমূল ধৌত করিয়া খরপ্রবাহে প্রবাহিতা। এখানে স্নান ও তর্পণাদি করিতে হয়। স্রোতের গতি বড়ই প্রবল, পদস্খলন হইলেই বিপদে পড়িবার আশঙ্কা। স্থানটি নির্জ্জন, গঙ্গার দৃশ্যও সুন্দর। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটী আশ্রম স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক এখানে স্থাপিত হইয়াছে।

অযোধ্যা।

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতীশ্চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকা।"

বিগত ১৩১৯ সালের চৈত্র মাসে ৺কাশীধামে বাসকালে মোক্ষধাম অযোধ্যা নগরী দর্শন লালসা অত্যন্ত বলবতী হইলে, এক দিন বেলা ১১ ঘটিকার সময়, আউড্ রোহিলখণ্ড রেলপথে কাশী ষ্টেশন হইতে অযোধ্যাভিমুখে রওনা হই। কাশী হইতে অযোধ্যা রেল ষ্টেশন ১২০ মাইল, টিকিটের মূল্য ১৷৷০ টাকা। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় গাড়ী অযোধ্যা ষ্টেশনে আসিলে আমরা অবতরণ করি। অযোধ্যা ষ্টেশনটি সামান্য হইলেও যোগাদি উপলক্ষে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে এবং তাহার চিহ্নস্বরূপ ষ্টেশন ঘর ভিন্ন আরও দুইটী সাময়িক টিকেট ঘর দেখিতে পাইলাম। গাড়ীতেই পাণ্ডাবংশীয় গোপালচন্দ্র কৃপালের এক জন চরের সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হইল। রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করা মাত্রেই তাঁহার লোকেই মুটিয়া ও এক্কা ভাড়া করিয়া আনিল; চারি আনা পয়সা দিয়া দুই মাইল ব্যবধান স্বর্গদ্বারের নিকটবর্ত্তী পাণ্ডা মহলে উপস্থিত হইলাম। এখানে ঘোড়ার গাড়ীর সংখ্যা বড়ই কম, এক্কা গাড়ী এবং দ্বিচক্র ও ছাপ্পরবিশিষ্ট মানুষ ঠেলা এক প্রকার গাড়ীর আমদানীই বেশী। পাণ্ডা নিজের একটি পরিষ্কার দোতলা বাড়ী আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়াছিলেন, পাণ্ডার সহিত সাক্ষাতন্তে তাঁহার সুমিষ্ট কথায় ও সদ্ব্যবহারে বাধ্য হইয়া আমরা ধর্ম্মশালায় না যাইয়া পাণ্ডার নির্দ্দিষ্ট বাটীতেই অবস্থিতি করিলাম।

অযোধ্যা অতি প্রাচীন দেব নির্ম্মিত নগরী। সত্য যুগে যখন আর্য্য

ঋষিগণ মহাত্মা বৈবস্বত মনুকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আদি জন্মভূমি স্বর্গ হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন তখন ব্রহ্মবর্ত্ত প্রদেশে পুণ্যতোয়া সরযূ নদীর তটদেশে, বৈবস্বত মনু স্বয়ং এই নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদে উল্লেখ আছে—

"অষ্টচক্রা নব দ্বারা দেবানাং পূরযোধ্যা
তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ॥"
তথাহি বাল্মীকি রামায়ণে—
"অযোধ্যা নাম নগরী অত্রাসীৎ লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্ম্মিতা স্বয়ম্॥"

যে দেবনগরী এক দিন মানবেন্দ্র মনু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল যাহার দৈর্ঘ্য দ্বাদশ যোজন ও প্রস্থ দুই যোজন ছিল, যেখানে ইক্ষ্বাকু, সগর, ভগীরথ, রঘু প্রভৃতি দিগ্‌বিজয়ী সসাগরা পৃথিবীপতিগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণে যে পুরীর বর্ণনা পাঠ করিলে অতীত ভারতের মধুময় স্মৃতি কাহিনী মনে পড়িয়া আত্মহারা হইতে হয়। যে স্থান নবদূর্ব্বাদল-শ্যামকলেবর বিষ্ণুর অবতার ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি! ইহাই কি সেই অযোধ্যা? হায়! কোথা সেই অযোধ্যা! সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। সূর্য্যবংশের শেষরাজা সুমিত্র অযোধ্যানগরী পরিত্যাগ করার পর কত যুগ যুগান্তর গত হইয়াছে, ইহার সুমনোহর হর্ম্ম্যরাজি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া কালক্রমে অরণ্যানীতে পরিণত হইয়া বিস্মৃতি সাগরে ডুবিয়াছে। প্রায় দুই সহস্র বৎসর হইল মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই দেব নির্ম্মিত নগরীর লুপ্ত কীর্ত্তিসমূহের পুনরুদ্ধার জন্য জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া নগরীতে পরিণত করেন। কিম্বদন্তী আছে, মহারাজ দেবাদিষ্ট হইয়া সরযূ তীরে নাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির উদ্ধার ও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়া বহু অর্থব্যয়ে ৩৬০টি দেব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া-

ছিলেন। মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বেই তাহার অধিকাংশ ধ্বংস হইয়া যায়, যাহা কিছু বাকী ছিল, তাহা হিন্দুদ্বেষী সম্রাট্ আরংজেব কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং তাহারই মালমসলাদি দ্বারায় মস্‌জিদাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে যে স্থানটি প্রভুর জন্মস্থান বলিয়া কথিত হয়, তাহাই আরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত মস্‌জিদের আঙ্গিনা মধ্যে সামান্য একটি কুটীর মাত্র। ইহাও সাম্যবাদী ব্রিটিশ রাজের রাজত্বের প্রাক্কালে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়, কেননা যবন রাজের সময় মস্‌জিদের প্রাঙ্গণে হিন্দুর দেব মন্দিরের স্থান পাওয়া নিতান্তই আশ্চর্য্যের কথা। এতৎ ভিন্ন যে কয়েকটি দেবমন্দির আছে তাহা সমস্তই আধুনিক। রামকোট নামক স্থানটি বিশেষ প্রসিদ্ধ,এখানে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ দুর্গের ২০টি বুরুজ ছিল; দুর্গাভ্যন্তরে ৮টি রাজপ্রাসাদ ছিল, এখন তাহার কোন চিহ্ন নাই, কেবল দুর্গ সেনাপতি মহাবীর হনুমানজির নামে হনুমানগড়ই সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী দেখিতে পাইলাম। অযোধ্যাতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার ভক্তবীর হনুমানজির গৌরব সমধিক, হরি অপেক্ষা হরিনাম শ্রেষ্ঠ এই মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থেই বুঝি এখানে ভগবানের ভক্ত সেবকের এত মান। এক মাইল ব্যাপী একটা বাগানের সম্মুখে একটি উচ্চ টিলার উপরে হনুমানজীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। প্রস্তর নির্ম্মিত বহুতর সিঁড়ি বাহিয়া ইহার প্রাঙ্গণে উঠিতে হয়। মধ্যস্থলে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির মধ্যে প্রকাণ্ড মূর্ত্তি হনুমানজী বিরাজ করিতেছেন, তদুপরি চন্দ্রাতপছত্র, সুগন্ধি প্রদীপ সর্ব্বদা জ্বলিতেছে, চতুর্দ্দিকে পণ্ডিতগণ নানাবিধ ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া থাকেন। নীচে অনেকগুলি মিঠাইর দোকান। যাত্রিগণ দর্শনীর সঙ্গে কিছু কিছু মিঠাই ভেট দিয়া থাকেন। অযোধ্যাবাসী এই মন্দিরেই সমধিক আড়ম্বরের সহিত দর্শনাদি করিয়া থাকেন।

অযোধ্যার পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর তিন দিকেই সরযূ নদী পূর্ব্বে বহমান

ছিল, এখন চরা পড়িয়া গিয়াছে। উত্তর দিকে যেখানে ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ ঠাকুর শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞায় সরযূসলিলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া অদ্ভুত ভ্রাতৃ-প্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়াছেন, তথায় একটি সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট আছে, বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে সিঁড়ির নিকট জল থাকে না। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকেই সুবিস্তীর্ণ রাম ঘাট, যথায় ভগবান শ্রীরামচন্দ্র প্রাণের ভাই লক্ষ্মণের আত্মবিসর্জ্জনের পর স্বয়ং সহস্র সহস্র অযোধ্যা-বাসী সহ পুণ্যসলিলা সয়যূ জলে প্রাণ পরিত্যাগান্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন, সেই ঘাটটি বড়ই শান্তিপ্রদ। অদূরেই সীতার ঘাট ও নিকটে সীতা দেবীর একটি মন্দির জীর্ণপ্রায় হইলে পুণ্যবতী রাণী অহল্যাবাই বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। অযোধ্যা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান অবস্থান। শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় এখানে প্রত্যেক অধিবাসীর ঘরেই শ্রীরাম সীতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মধ্য প্রদেশের রাজা, মহারাজা, সাধু, সন্ন্যাসী ও মোহন্তদিগের অসংখ্য মন্দির। প্রত্যেক মন্দিরেই শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান। বড় বড় রাজা মহারাজা ও মোহন্ত-দিগের মন্দিরগুলি প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ কিম্বা রাজবাটীর ন্যায় দেখা যায়। ভিতরে বহু আড়ম্বরের সহিত রাম সীতার অর্চ্চনা হইয়া থাকে।

অযোধ্যায় রামলীলার বহুতর মূর্ত্তি গঠিত আছে। কোন মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের সূতিকাগার, কোথাও রাজা দশরথের নিকট কৈকেয়ী দেবী রামবনবাসরূপ বর যাচ্ঞাকারিণী, কোথায় বা অভিমানিনী নিরাভরণা কৈকেয়ী দেবী ধূল্যবলুণ্ঠিতা, কোথাও জটা বল্কলধারী শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বনগমনে উদ্যত, কোন স্থানে একটী যজ্ঞকুণ্ড কাটিয়া স্বর্ণসীতা সহ শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত এইরূপ বহুতর লীলাভিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। যাত্রীদিগের নিকট হইতে এ সমস্ত গুলিরই কিছু না কিছু দর্শনি আদায় করা হইয়া থাকে। শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় এখানেও একটী মাত্র শিব ও কালীমূর্ত্তি আছে।

পাণ্ডারা বলিয়া থাকেন, মহারাজ দশরথ কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্যেক দেবালয়কে আস্থান বলিয়া থাকে। কবিবর তুলসীদাসের আস্থানে সান্ধ্যারতির বড় ধূম হয়, এখানে পঞ্চপ্রদীপ, দশ প্রদীপ, বিংশতি প্রদীপ, এইরূপ ভাবে সহস্র বাতির আরতি হইয়া থাকে। তৎকালের মধুর হরিসংকীর্ত্তন, থম্মক, ঘণ্টা, ঝাঁজরি প্রভৃতি বাদ্যের সুমধুর গর্জ্জন, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে যুক্তকরে অসংখ্য নরনারীর একত্রে সমাবেশ, সম্মুখে দণ্ডায়মান পুরোহিতের হস্তস্থিত দীপাবলীর কম্পমান শিখা সঞ্চালন ইত্যাদি একত্রে মিশ্রিত হইয়াই আমার মনে এক অব্যক্ত মহানন্দ ভাবের উদ্রেক করিয়া দিল, অমনি অতীত যুগের রামায়ণের চিত্রপট যেন নয়ন সমক্ষে অভিনীত হইতে লাগিল। একদিন না শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনে এখান হইতে বনগমন করিয়াছিলেন? মহারাজ দশরথ নয়নাভিরাম শ্রীরামচন্দ্রের শোকে অধীর হইয়া আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। সেই শোক দৃশ্যের পর শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বের অপূর্ব্ব সুনীতিপূর্ণ পুলক দৃশ্যও যেন আমার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইতে লাগিল, আবার সেই শোক কাহিনী যেন অনন্ত গগনে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। আমি আরতিদৃশ্যে আত্মহারা হইয়া বাসায় আগমন করিলাম।

অযোধ্যা ধামে আসিয়া প্রথম সরযূ নদীতে স্নান তর্পণ, দান করিয়া পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধ করিতে হয়; লক্ষ্মণঘাট ও রামঘাট হইয়া শীত ঋতুতে প্রায় এক মাইল দীর্ঘ একটী বালুকাচর পার হইয়া সরযূ নদীতে যাইতে হয়, তথায় পাণ্ডাগণের বাচাই আছে। যাত্রিগণ আপন ইচ্ছামতে দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকের কার্য্যাদি করিতে পারেন। সমস্ত আয়োজনই সেখানে পাওয়া যায়, একটী নারিকেল সরযূদেবীর ভেট দিতে হয়। বর্ষাকালে ঘাটের সিঁড়িপ্রান্তেই নদীর জল আইসে, তখন সুপ্রশস্ত ঘাটের চত্বরে বসিয়া পিতৃকার্য্যাদি করা যায়।

সরনাথ।

কাশী হইতে উত্তরে প্রায় চারি মাইল ব্যবধানে সরনাথ নামক অতি প্রাচীন স্থান। খৃষ্টাব্দের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ করিয়া সরনাথে প্রথম ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সময় এই স্থানের অশেষ উন্নতি হইয়াছিল। সরনাথের ভগ্নস্তূপ সকল দর্শন করিলে আড়াই হাজার বৎসরের কথা স্মৃতি পথে উদয় হয়। বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভের জন্য উরবিল্ব গ্রামে ধ্যানাবস্থায় ছয়টী বৎসর অতিবাহিত করেন; সেই সময় তাঁহার পাঁচজন শিষ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিলে এই সরনাথেই তাহাদের সঙ্গে পুনঃ মিলন হইয়াছিল। ইহার আর এক নাম মৃগদার। সরনাথের স্তূপ, বিহার, চৈত্য ও মঠ ইত্যাদি বুদ্ধদেবের সময় হইতে আরম্ভ হইয়া সম্রাট অশোকের সময় সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়। চীন পরিব্রাজক ফাহীয়ান ও হিউনসঙ্গ লিখিত বিবরণীতে ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার কিছুই বর্ত্তমান নাই, কেবল বুদ্ধদেবের স্নান করিবার, জলপাত্র ধৌত করিবার ও বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য যে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ পুষ্করিণী ছিল তাহার শুষ্কাবস্থা অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। চতুর্দ্দিকে কেবল প্রাচীন কীর্ত্তির অসংখ্য ভগ্নাবশেষ টিলা ও প্রস্তর ইষ্টকস্তূপরাশি। এই সকল ভগ্নস্তূপরাশির স্তরে স্তরে যে কত ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে মনে উদাসভাবের সঞ্চার হয়। মেজর জেনারেল কানিংহম সাহেব ইহার নানাস্থান খনন করাইয়া নানাবিধ মূর্ত্তি, পিতল নির্ম্মিত জিনিস, সূক্ষ্ম কারুকার্য্য খচিত স্থপতি কার্য্যের অশেষ নৈপুণ্য নিদর্শন প্রস্তর খণ্ডাদি

উত্তোলন করিয়া আনিয়া চীফ্ সোসাইটীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বারাণসীস্থিত গবর্ণমেণ্ট কলেজভূমে সরনাথের পুরাতন কীর্ত্তির স্মৃতি চিহ্নাদি কিছু কিছু রক্ষিত আছে। একটী নদীর ধারে প্রকাণ্ড বৌদ্ধমূর্ত্তি অর্দ্ধ প্রোথিতাবস্থায় বর্ত্তমান আছে; কিন্তু হিন্দুদিগের দ্বারা ইহা দেবমূর্ত্তি উল্লেখে অতিবিশিষ্টভাবে পূজিত হইয়া থাকে। ভ্রমণকারিগণ ভগবান বুদ্ধদেবের লুপ্তকীর্ত্তির শেষ চিহ্ন দেখিবার জন্যই এখানে আসিয়া থাকেন।

শ্রীবৃন্দাবন তীর্থ।

"বৃন্দাবনে কেশজাল উমা নাম্নীচ দেবতা।
ভূতেশো ভৈরব স্তত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥"

মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবন ৬ মাইল মাত্র ব্যবধান। যাইবার দুইটী পথ; একটী রেল পথ, ভাড়া ⁄৬পাই, অপরটী পাকা রাস্তা। ঘোড়ার গাড়ী, এক্কা, গোযান, উষ্ট্রযান সমস্তই পাওয়া যায়। মথুরা সহরের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় প্রান্তেই দুইটী রেল ষ্টেসন আছে। যাত্রিগণ ইচ্ছামত আপন আপন সুবিধা অনুসারে যাইতে পারেন। সাধারণ লোকে পদব্রজেই যাতায়াত করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৃন্দাবন, মথুরা, গোকুল, কাম্যকবন, গিরিগোবর্দ্ধন প্রভৃতি ৮৪ যোজন স্থানই ব্রজপুর নামে অভিহিত হইত। এক বৃন্দাবনের পরিধিই দ্বাদশ যোজন ছিল। হিন্দুশাস্ত্রমতে এসব স্থান পদব্রজে পরিভ্রমণ করিলে পুণ্য হয়। এখনও শ্রাবণী পূর্ণিমায় বন ভ্রমণ উপলক্ষে শত সহস্র লোক বৃন্দাবন পরিক্রমণ করেন। তখন রাজা মহারাজাদিগের শুভাগমন হয়, এবং বনভূমিগুলিই লোক চলাচলের উপযুক্ত করিয়া পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। আমরা রেলপথে না যাইয়া ১৸০ টাকা মূল্যে এক ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া প্রত্যূষে মথুরানগরী হইতে রওনা হইলাম। আমাদের দক্ষিণ দিকে সুরতরঙ্গিনী যমুনা যেন সতত করুণকণ্ঠে আপনার অতীত গীতি গাইতে গাইতে ধীর মন্থর গমনে প্রবাহিতা। বাম পার্শ্বে সুদূর শ্যামল প্রান্তরমধ্যস্থ বনভূমির অপূর্ব্ব শোভা, স্বভাবসুন্দর প্রকৃতির লীলানিকেতন কাননগুলির মধ্যে হিংসা দ্বেষ বর্জ্জিত শিখিকুলের রমণীয়

পদবিক্ষেপ, বৃক্ষারূঢ় নানাবিধ বিহঙ্গকুলের সুমধুর কাকলি বনভূমির মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র লতা গুল্ম পরিবেষ্টিত ঝোপগুলি হইতে অকুতোভয়ে নির্গত কুরঙ্গদল এবং অতীত গৌরব পুরাণবর্ণিত পুণ্যধাম দর্শন সৌভাগ্য স্মৃতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমাদের হৃদয়কে এক অপূর্ব্ব আনন্দে অভিষিক্ত করিতেছিল। গাড়ীর গতি হ্রাস করিয়া ধীরে ধীরে এসমস্ত দেখিতে দেখিতে সুধাময় স্মৃতি সংস্পর্শে মনে কতই কল্পনা করিতেছিলাম। একদিন না এই বৃন্দাবনের পথে কত কষ্ট কত লাঞ্ছনা। দস্যু তস্করের ভয়ে মৃত্যু স্থিরসঙ্কল্প করিয়া স্নেহময় আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় লইয়া দলবলে আসিতে হইত! আজ আমি একটী মাত্র ভৃত্য সঙ্গে করিয়া শস্যশ্যামলা বঙ্গজননীর ক্রোড় হইতে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে ও সুকৌশলে ৮৫০ মাইল্ দূরবর্ত্তী পথ বিনা ক্লেশে অতিক্রম করিয়া অতি পুণ্যভূমি মধুর বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। দেখিতে দেখিতে প্রান্তর মধ্যস্থতেই বৃন্দাবনের দেবমন্দিরসমূহের উচ্চ চূড়াসকল নয়নপথে পতিত হইল। একদিন নন্দের আদরের দুলাল, শ্রীযশোদার নয়নমণি রাখাল বালক, যথায় বনে বনে বেণু বাজাইয়া ধেনু চরাইয়া খেলিয়া বেড়াইত; যাঁহার বাঁশরীর সুমধুর উল্লাস তানে যমুনা উজান বহিয়া গোপবালাগণের হৃদয়ে প্রেমের লহরী উত্তালতরঙ্গে প্রবাহিত করিয়া আকুল করিত; যাঁহার অতীত গৌরব ও পবিত্র কৃষ্ণলীলা সকল লিপিবদ্ধ করিয়া বৈষ্ণবকবিকুল গীতিকাব্য রচনা করিয়া মরজগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন, এই কি সেই বৃন্দাবন! ধন্য প্রেমময় বৃন্দাবনবিহারী। যাঁহার অপার কৃপায় আমার শ্রীবৃন্দাবন দর্শন ভাগ্যে ঘটিল। বৃন্দাবনে উপনীত হইলে আমার মনে অপার আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল। আমাদের গাড়ী শেঠজীর কুঞ্জের সম্মুখে উপস্থিত হইলে পাড়ার লোকের সাহায্যে চতুষ্পথের পার্শ্ববর্ত্তী নবনির্ম্মিত একতালা একটি বাড়ী দৈনিক দুই টাকা হিসাবে ভাড়া করিয়া আশ্রয় লইলাম।

বৃন্দাবন মহাপীঠ। এখানে সতীদেবীর কেশজাল পতিত হইয়াছিল। দেবীর নাম উমা, ভূতেশ নামক সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক ভৈরব গোপীগণের মধ্যে পড়িয়া গোপীশ্বর মহাদেব নামে অভিহিত হইয়াছেন। এখানে এই দুই মূর্ত্তি ভিন্ন সর্ব্বত্রই কেবল শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি। বৃন্দাবন যমুনার তটবর্ত্তী, তিন দিকেই যমুনা বেষ্টিত, চৌরাশী যোজন পরিধি ব্যাপী মথুরা, গোকুল, গিরিগোবর্দ্ধন, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড দ্বাদশবন, বৃন্দাবন সমস্তকেই ব্রজমণ্ডল কহে। মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে বৃন্দাবনের অন্যতর নাম কালীয়বর্ত্ত। কালীয়নাগের আবর্ত্ত হইতে বোধ হয় ঐ নাম হইয়াছিল। ঐ সময়ে উহা অতি প্রসিদ্ধ সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। বৃন্দাবন বৈষ্ণবদিগের মোক্ষ-ধাম; শাক্তের বারাণসী, বৈষ্ণবের বৃন্দাবন কৈবল্যধাম বলিয়া বৃদ্ধগণ শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া অন্তে গৌরবান্বিত হয়েন। বৃন্দাবনবাসীকে ব্রজবাসী বলে।

প্রত্যেক ব্রজবাসীর বাটী কুঞ্জ নামে অভিহিত। কুঞ্জ নামে লতা পুষ্পাদি পরিশোভিত পুষ্পবাটিকা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন। প্রত্যেক কুঞ্জেই বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের কোন না কোন নামের একটি মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। অবস্থাভেদে বড় ছোট ও পূজার আড়ম্বরের তারতম্য হয়। যাহার কুঞ্জে দেবতা নাই সেখানে অন্ততঃ একটী বেদিকায় বৃন্দাজী তুলসীর মঞ্চ নিশ্চয় আছে। সহরে চারি সহস্রের ঊর্দ্ধে কুঞ্জ আছে। গত সেনসস্ রিপোর্টে অধিবাসীর সংখ্যা পঁচিশ সহস্র ছিল, তন্মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক। প্রত্যেক কুঞ্জবাসীই যাত্রী রাখিবার ব্যবসা করিতে পারেন। যাত্রিগণ স্বাধীনভাবে বাটী ভাড়া করিয়াও থাকিতে পারেন। কুঞ্জে আসিলে কুঞ্জের দক্ষিণা স্বরূপ একটী ভেট্ কুঞ্জবাসীকে দিতে হয় কিন্তু যাত্রীরা স্বতন্ত্র বাটী ভাড়া করিলে তাহা দিতে হয় না। শ্রাবণ মাসের ঝুলনে, কার্ত্তিকের অন্নকুটে, ফাল্গুনের দোল যাত্রার সময় যাত্রীর সমাগম অধিক হইয়া থাকে। বৃন্দাবনের অধিকাংশ

দেবালয়ে প্রসাদ বিক্রী হইয়া থাকে, এবং চারি আনা মূল্যের প্রসাদে এক জনের পরিতোষ পূর্ব্বক আহার হয়।

মথুরা উপাখ্যানে বলা হইয়াছে, কংসভয়ে ভীত হইয়া বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণকে জন্মিবা মাত্রই গোপরাজ নন্দালয়ে গোকুলে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে বাল্যলীলায় অপরিসীম বল বিক্রমে কংস প্রেরিত অনেক অসুরকে বধ করিয়াছিলেন। কংসরাজ উত্তেজিত হইয়া প্রতিনিয়ত তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করায়, গোকুল পরিত্যাগ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ সহ যমুনাতীরে আসিয়া ব্রজপুর স্থাপন করেন। তৎকালে ঘোষপল্লীসমুদয় কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে দীর্ঘকাল থাকিত না, যেখানে গবাদি পশু পালনের সুবিধা হইত, তথায়ই পল্লীসকল স্থানান্তরিত হইত; বৃন্দাবনে পশু পালনের সুবিধা, চতুর্দ্দিকে সুপ্রশস্ত বন, নিকটেই যমুনা, গোকুলের স্নান জলপান সহজে সম্পন্ন হইবে মনে করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুরম্য যমুনা তটে এই নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত সেই বৃন্দাবন নামেই অভিহিত। বৃন্দাবনের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে একটী প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে কুশধ্বজ নামক রাজার তুলসী নাম্নী কন্যা শ্রীহরিকে পতিরূপে পাইবার জন্য ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্করাংশ দুর্ব্বাসা মুনির ক্রোধানলে অভিশপ্ত হইয়া শঙ্খচূড় নামক অসুরকেই পতিরূপে প্রাপ্ত হন। পুরাণে বর্ণিত আছে, এই তুলসীর শাপে শ্রীহরি শালগ্রাম শিলা এবং শ্রীহরির শাপে তুলসী দেবী বৃক্ষরূপে পরিণত হন। তুলসীর অপর নাম বৃন্দা। বৃন্দা যেখানে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীবৃন্দাবন নামে আখ্যাত হইয়াছে।

বৃন্দাবনে যে সকল দেব মন্দির আছে তন্মধ্যে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির, গোপীনাথ দেবের মন্দির, মদনমোহন মন্দির, শ্যামসুন্দরের মন্দির, গোকুলানন্দ, রাধারমণ, শ্রীরাধাদামোদর এই কয়েকটী রূপ ও সনাতন গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত আদি দেবালয়। বৈষ্ণবকবি মুরারি গুপ্তের শ্রীচৈতন্যচরিত

কাবী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠে জানা যায়, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই পুণ্য তীর্থে আগমন করিয়া বৃন্দাবন, বনময়-দৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্থানের কোন চিহ্নই প্রাপ্ত হন না; পরে স্বর্গীয় অলৌকিক শক্তি প্রভাবে ও তাঁহার পার্ষদ শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর সহায়তায় লীলাস্থানসকল নির্দ্দেশপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-দেব এবং রূপ ও সনাতন গোস্বামীর উদ্যম, উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমে বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থসকলের পুনরুদ্ধার হইয়াছিল এবং তাঁহারাই প্রথম দেবমন্দির সকল নির্ম্মাণ করাইয়া বিগ্রহাদি স্থাপন, ও সেবা করিয়াছিলেন। তৎপর রঘুনাথ ও নরোত্তম ঠাকুর, গোপাল ভট্ট, লোকনাথ, শ্রীনিবাস আচার্য্য, রূপ সনাতন প্রভৃতি গৌড়ীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর শিষ্য পরম্পরায় অদ্যাপি সেইগুলি গোস্বামীদিগের অধিকারভুক্ত রহিয়াছে। এই সমস্ত দেবালয়ে পশ্চিমাঞ্চলীয় মাড়বারি ব্রাহ্মণ পাণ্ডাদিগের কোন অধিকার নাই। এতদ্‌ভিন্ন জয়পুর, সিন্ধিয়া, হোলকার, গোয়ালিয়র, টিকারী, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানের স্বাধীন নৃপতিবৃন্দের ও বহুতর রাজা, মহারাজা, ধনী, শেঠ ও বাঙ্গালি জমিদারবর্গের বহুসংখ্যক দেব মন্দির ও কুঞ্জাদি প্রতিষ্ঠিত আছে। এবং গোপেশ্বর মহাদেব, সাহাজীর মন্দির, গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির, অদ্ভুত শালগ্রাম, বঙ্কবিহারী মন্দির, সেবাকুঞ্জ, দাবীলন, নিকুঞ্জবন, বংশীবট, যমুনাপুলীন প্রভৃতি বহুতর দর্শন করিতে হয়।

বৃন্দাবনে প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। শাস্ত্রে লিখিত আছে, ভক্তিই মুক্তির সোপান। যদি কোথাও ভক্তির আদর্শ দেখিতে চাও, বৃন্দাবনে যাও। বৃন্দাবনের মন্দিরে, হাটে, ঘাটে, মাঠে, রাস্তায়, কুঞ্জে কুঞ্জে দিবারাত্রি কেবল প্রভু শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত নাম সংকীর্ত্তন। ব্রজবাসী ভিক্ষুকগণের সুললিত মৃদু গম্ভীর মৃদঙ্গ ধ্বনি, ভক্তবৃন্দের মুখ নিঃসৃত জয়রাধা, শ্রীরাধা, রাধাশ্যাম, শ্যামনটবর প্রভৃতি জয়-ধ্বনি; কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর, ব্রজরজবিলুণ্ঠিত, গলদশ্রুলোচন প্রেমিকগণের

বক্ষস্থল ভাসাইয়া 'হা' কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ রব; ময়ূর ময়ূরীগণের পুচ্ছ বিস্তার পূর্ব্বক সৌধোপরি নৃত্য; দেবদর্শনকারী নরনারীগণের যুক্তকরে সোৎসুক নয়নে মন্দির বারান্দায় অবস্থান; আবার দেবদর্শন মাত্র ছিন্ন কদলী বৃক্ষসম এক সঙ্গে সকলের মৃত্তিকায় পতন ও ধুল্যবলুণ্ঠিত হইয়া জিহ্বাগ্রে রজ স্পর্শ করণ; ভগবত প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন, পদধূলি গ্রহণ ইত্যাদি দৃশ্য কি মনোহর ও ভক্তি উদ্দীপক। সে কি চমৎকার দৃশ্য তাহা কিরূপে বুঝাইব! সে কি লেখনির বিষয়? ধন্য ভক্তি! ধন্য প্রেম। এমন ভক্তি আর বুঝি জগতে নাই। যদি ভক্তি শিখিতে চাও? একবার বৃন্দাবনে যাও।

বৃন্দাবনের পুরাতন চিহ্ন মধ্যে ভুবনবিখ্যাত পুণ্যতোয়া যমুনা দেবীই প্রেমময়ের প্রেমে বিগলিত হইয়া স্বীয় গন্তব্য পথ ভুলিয়াই যেন পশ্চিমবাহিনী হইয়াছেন। সেখানে নদীর গতি চঞ্চলা ও কলনাদিনী। দেবমন্দির নিঃসৃত প্রশস্ত সোপানময় ঘাটগুলি সুন্দর। তন্মধ্যে কেশীঘাট, গোবিন্দঘাট, বস্ত্রহরণ ঘাট, ভ্রমরঘাট, চিড়ঘাট প্রভৃতি স্নান ঘাট, এবং ধীর সমীর ঘাট, কেলীঘাট, বংশীবট ঘাট, প্রভৃতি বহুতর ঘাট আছে। এই ধীর সমীর ঘাটেই জয়দেব গোস্বামী কবির সেই সুললিত পদাবলী সমন্বিত "ধীর সমীরে যমুনা তীরে" ইত্যাদি চিত্তহর গীতাবলি রচিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনেও যমুনা জলে অসংখ্য কচ্ছপ যাত্রী প্রদত্ত দ্রব্য সামগ্রী কুড়াইয়া খাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ কেশীদৈত্যকে যেখানে বধ করিয়াছিলেন তাহাকেই কেশীঘাট কহে। আমরা এই ঘাটেই স্নান তর্পণাদি করিয়া যমুনার ভেট প্রদান করিলাম। তটে ফুলওয়ালীরা পুষ্প বিল্বপত্র ও যমুনা ভেটের দুগ্ধাদি সহ বসিয়াছে, অল্প মূল্যেই এ সব পাওয়া যায়, কেবল ভেটের নারিকেলটীর বাবত পাণ্ডাগণ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করেন। ভালরূপে ভেট দিতে হইলে একটী টাকা ব্যয় করিতে হয়। ধনীদিগের স্বতন্ত্র বাবস্থা। এখানে দান

পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি করিবার বিধান আছে। বৃন্দাবনে যাত্রিগণের বিশেষ সতর্কতাসহ আপন আপন দ্রব্যজাত কুঠুরীতে বন্ধ রাখিতে হয় নচেৎ বানরেরা লইয়া যায়। এখানে বানরের সংখ্যা অধিক।

শ্রীগোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির।

রেল ষ্টেসন হইতে উত্তরদিকে সহরে প্রবেশ করিলেই, বামধারে গোবিন্দজীউর আদি পুরাতন ভগ্ন মন্দির। ইহা একটী বিশেষ দর্শনীয়; অত্যাশ্চর্য্য শিল্পালঙ্কত লোহিত প্রস্তরে বিনির্ম্মিত; নানাবিধ সূক্ষ্মকারুকার্য্য-খচিত এই বিশাল সৌধ পুরাতন হিন্দুর স্থপতি বিদ্যার উৎকর্ষতার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইহার উচ্চতা এক সময়ে এত অধিক ছিল যে, ইহার শিখরস্থ দীপালোক আগ্রার প্রাসাদোপরি হইতে দৃষ্টি করিয়া হিন্দু দেবদ্বেষী সম্রাট আওরংজেবের আদেশে ইহার গগনস্পর্শী উচ্চতা খর্ব্বীকৃত হইয়া ত্রিতলে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীগোবিন্দজিউর নূতন মন্দির।

পুরাতন ভগ্ন মন্দিরের সংলগ্নই নব প্রতিষ্ঠিত দেবালয়। সম্মুখে দেওয়ানখানা, ভিতরে প্রবেশ করিয়া দপ্তরখানায় নাম ধাম লিখাইয়া ভেটের দর্শনি দিতে হয়। পাণ্ডারা যাত্রিগণ হইতে চারি আনা হইতে আড়াই টাকা পর্য্যন্ত লইয়া থাকেন। লালযাত্রী হইতে হইলে সর্ব্বোচ্চ হারে ভেট দিতে হয়। লালযাত্রীর মস্তকোপরি একখণ্ড রক্ত বস্ত্রের টুকরা বাঁধিয়া দিয়া থাকে। ইহা শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের নিদর্শন মাত্র। আমার সঙ্গে দেওয়ানখানার একজন বাঙ্গালি বাবু কর্ম্মচারীর অল্প পরিচয় হইলে তিনি বলিলেন ১।০ এক টাকা চারি আনার ন্যূন প্রকৃত ভেট লওয়া কিম্বা যাত্রীর নামাদি খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয় না। দর্শনি ভেট

ছয় স্থানে দিতে হয় অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, শ্যামসুন্দর, কুঞ্জবাসী (যাহার কুঞ্জে থাকা হয়) যমুনাদেবী ও গুরুপাটে সমভাবে ভেট দিবার নিয়ম। প্রবেশ দ্বারের পরই শ্বেত কৃষ্ণ প্রস্তর মণ্ডিত প্রাঙ্গণ। চতুর্দ্দিকে দ্বিতল সৌধরাজি, সম্মুখে শ্রীগোবিন্দজিউর সুপ্রশস্ত বারান্দা সংযুক্ত সুচারু মন্দির। সন্ধ্যারতির পূর্ব্বেই চতুর্দ্দিক হইতে নরনারী সমবেত হইতে থাকে, বহুলোক সমাগমে মন্দিরাভ্যন্তরে গভীর জন কোলাহল উত্থিত হয়। দর্শনকারিগণের মধ্যে বাঙ্গালির সংখ্যাই অধিক, তন্মধ্যে আবার রমণী-গণেরই সংখ্যাপ্রাচুর্য্য। বিগ্রহদেবের দ্বার সম্মুখে একটি পরদা লটকান রহিয়াছে, সকল সময় দেব দর্শন ঘটে না, একবার দর্শন আরম্ভ হইলে কিয়ৎক্ষণ পরেই পরদা টানিয়া দেওয়া হয়, যেন দেবতারা অনবরত দর্শন দেওয়া জনিত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের পর পুনরায় দর্শন দেন। বৃন্দাবন ও জয়পুরেই এই নিয়ম। পরদা উন্মুক্ত হইলে আমরা জনতার মধ্য হইতে অগ্রসর হইয়া সেই বিশ্বজনমোহন গোবিন্দজীর ও রাধারাণীর যুগল মূর্ত্তি দর্শনে হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রীতি ও তৃপ্তিলাভ করিলাম। কি সুন্দর দৃশ্য। শ্রীমধুসূদনের পাপতাপহারী শান্তিময় নয়নানন্দকারী বরপ্রদ সাক্ষাৎ সজীব মূর্ত্তি যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দর্শনমাত্র শত শত নরনারী মৃত্তিকা স্পর্শে মস্তক নত করিয়া করযোড়ে করুণা ও ভক্তি ভিক্ষা করিতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্য জগৎসংসার ভুলিয়া মনে যেন কেমন এক ভাবের উদয় হইল। পবিত্রতার পুণ্য সম্মিলনে শান্তির বিকাশ পাইল। ছোট, বড়, ধনী নির্ধন ভেদ নাই, জাত্যভিমান নাই, সকলই এখানে সমান ভাবে ভগবানের দ্বারে দণ্ডায়মান। আমি পূজরিহস্তে যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দিলাম। তিনি আশীর্ব্বাদ স্বরূপ পুষ্পমালা প্রদান করিলেন। পূজারি বাঙ্গালি, দেবালয়ের কর্ম্মচারিবৃন্দও অধিকাংশ বাঙ্গালি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গোস্বামী-দিগের স্থাপিত দেবমন্দির সমূহে বাঙ্গালিদিগেরই একাধিপত্য।

শ্রীগোপীনাথজীর মন্দির।

শ্রীগোবিন্দের বাটীর পশ্চিমে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে গোপীনাথজির মন্দির। এই স্থানটিও সেই হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষী যবন সম্রাটের কোপ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। সকলেই একদশা প্রাপ্ত। পুরাতন মন্দির ভগ্নদশা-গ্রস্ত, এই মন্দিরের ভগ্ন চূড়াটি বহুদূর হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুরাতন মন্দিরের দক্ষিণেই নব নির্ম্মিত মন্দির। আমরা প্রত্যেকে দপ্তরখানাতে নাম ধাম ও ভেটের চারি আনা পর্য্যন্ত দাখিল করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম, তখন বিশ্রামের সময় ছিল, যাত্রীর সংখ্যাধিক্য ও জনকোলাহল ছিল না। সিংহাসন উপরি শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারাণীর যুগল মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। গোপীগণের প্রভু ছিলেন বলিয়া বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নাম গোপীনাথজি হইয়াছে। এই মূর্ত্তি গোবিন্দ ও মদনমোহন মূর্ত্তি হইতে অপেক্ষাকৃত ছোট। দর্শনান্তে আমরা মিঠাই প্রসাদ পাইলাম।

শ্রীমদনমোহন দেবের মন্দির।

যমুনা তটে মৃত্তিকার স্তূপের উপর মদনমোহনের পুরাতন মন্দিরের ভগ্নরাশি পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। অন্যান্য বিগ্রহের ন্যায় মদনমোহন মূর্ত্তিও নূতন একটি মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছে। এই সুন্দর ও সুগঠিত মন্দির ১৮২১ খৃষ্টাব্দে নন্দকুমার বসু নামক জনৈক বাঙ্গালি কায়স্থ ভক্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। মদনমোহনজির পূর্ব্ব মন্দিরাদি সম্বন্ধে একটী জনপ্রবাদ আছে। রামদাস নামক কোন বণিক নৌকাযোগে বাণিজ্যার্থে এই স্থানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, সহসা তাঁহার নৌকা চড়ায় আটকাইয়া যায়। তিনি কোন মতেই নৌকা মুক্ত করিতে না পারিয়া, মদনমোহনের স্থাপয়িতা ও পূজক স্বয়ং সনাতন গোস্বামীর চরণোপরি প্রণিপাত পূর্ব্বক নিজ বিপদের কথা অবগত করাইলে বণিকের করুণ বিলাপে, গোস্বামী ঠাকুর দয়াপরবশ হইয়া বণিককে আশ্বাস দিয়া

নৌকায় গমনের অনুমতি করেন। বণিক প্রবর ঘাটে যাইয়া ভাসমান নৌকা দৃষ্টে মানস করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সে বারের বাণিজ্য লব্ধ সমস্ত ধন দ্বারা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। প্রভুর কৃপায় বণিকের প্রভূত লাভ হইয়াছিল, বণিক বিপুল অর্থ ব্যয়ে সেই পুরাতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মদনমোহনজি সনাতন গোস্বামীর স্থাপিত বিগ্রহ। তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই সুন্দর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামীর সমাধি এই বাটীতে হইয়াছিল। শুনা যায়, এই দেবালয়ের আয় দশ সহস্র মুদ্রা। এই মন্দিরের অনতিদূরে শ্রীচৈতন্য দেবের সমাধি মন্দির বর্ত্তমান আছে।

শ্রীশ্যামসুন্দরজীর মন্দির।

এই মন্দির শ্যামসুন্দর গোস্বামী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। মন্দির মধ্যস্থিত নয়নানন্দদায়ক নবজলধর শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি পার্শ্বে স্থিত সৌদামিনী রাধিকা দেবীর মূর্ত্তি। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেবমূর্ত্তি বড়ই বিরল। এ স্থানে দর্শনি ও ভেটের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। জন প্রতি এক আনা দিতে হয়। গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহনজীর বাটীতে বাঁধা ভেট না দিলে দর্শনই হয় না। পাণ্ডাদিগের অর্থ উপার্জ্জনের এই একটি সুন্দর কৌশল।

রাধারমণজী বা রাধাবল্লভের বাটী।

এই মন্দিরও বিগ্রহ দেবতা, জীব গোস্বামী কর্ত্তৃক স্থাপিত। এখানে পূর্ব্বে শালগ্রাম শীলার অর্চ্চনা হইত। প্রবাদ আছে, কোন ধনাঢ্য মহারাজ কর্ত্তৃক বৃন্দাবনের সমস্ত বিগ্রহ মন্দিরে অপর্য্যাপ্ত ধন রত্ন প্রদত্ত হয়। এই মন্দিরের সেবাইত মহাশয়ও আশার অতিরিক্ত ধন পাইয়া মনোদুঃখে বলিয়াছিলেন, সমস্ত বিগ্রহই নানাবিধ রত্ন অলঙ্কারাদিতে ভূষিত হইয়াছেন কিন্তু মৎ ইষ্টদেবতা হস্তপদশূন্য শিলামূর্ত্তি। আমি যখন তাঁহাকে

অলঙ্কারাদিতে সাজাইতে পারিলাম না তখন আমি এই ধনরত্ন দ্বারা কি করিব?' ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান হরি শিলামূর্ত্তি হইতে দ্বিভুজ মুরলীধারী রাধারমণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন, ভক্ত সাধক নানাবিধ অলঙ্কারাদি দ্বারা মন সুখে বিগ্রহ দেবতাকে সজ্জিত করিলেন। এই মন্দিরের পশ্চাদ্ ভাগেই শ্রীজীব গোস্বামী ও রূপ গোস্বামীর সমাধি রহিয়াছে।

যুগলকিশোর দেবের মন্দির।

কেশীঘাটের উপরই যুগলকিশোর দেবের মন্দির স্থাপিত। এই মন্দিরটী সপ্তদশ শতাব্দিতে ঠাকুর রায় সিংহের ভ্রাতা নোন করণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরটী অতীব জীর্ণ হইয়া নানাবিধ বিহঙ্গমকুলের নিকেতন হইয়া পড়িয়াছে। নাট মন্দিরের খিলানে পুরাতন স্থাপত্যের বহু নিদর্শন আছে। গোবর্দ্ধন লীলার নানাবিধ অস্পষ্ট চিত্রাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে। এখানে পূজার বিশেষ আড়ম্বর নাই ২।১টী পয়সা দিলেই দর্শন ঘটে।

শ্রীবঙ্কবিহারীজির মন্দির।

এই মন্দির সুপ্রসিদ্ধ গায়ক হরিদাস গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। মন্দির মধ্যস্থিত সুন্দর মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, বাঁকে বিহারী নামে খ্যাত। এখানে শ্রীরাধার প্রতিমূর্ত্তি নাই। এই মূর্ত্তি সোজা পায়ে সরলভাবে উভয় পদভরে দণ্ডায়মান। এখানে পূজারী বাঙ্গালী নহে।

বিহারী সাহাজীর মন্দির।

বৃন্দাবন মধ্যে এরূপ নয়নমনোমুগ্ধকর আধুনিক সুন্দর দেবমন্দির আর নাই। নির্ম্মাতার ন্যায় এরূপ ভক্তও বিরল। মন্দিরটী সমস্তই শ্বেত প্রস্তর মণ্ডিত, সেই সকল সুদৃশ্য প্রস্তরের নানাবিধ মনোহর

কারুকার্য্যে নির্ম্মাতার সুনির্ম্মল ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব যেন প্রতিফলিত হইতেছে। মন্দিরের বারান্দার দরজার সম্মুখে হরিভক্তগণের পদরজ প্রাপ্তির আশায় তাঁহার একটী প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত রহিয়াছে।

ব্রহ্মচারীর মন্দির।

গোয়ালিয়র মহারাজের গুরু ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দেব মন্দিরটী এক প্রকাণ্ড রাজভবনের ন্যায় পথিপার্শ্বে অবস্থিত। সিংহদ্বারে সিপাই পাহারা, ভিতরে নাট মন্দিরে ঝাড়, ফানুস প্রভৃতি দীপাধারের মাঝে ব্রহ্মচারীর তৈল চিত্র লট্‌কান আছে। মন্দির মধ্যে শ্রীরাধা-গোপাল, হংসগোপাল, নৃত্যগোপাল মূর্ত্তি। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর সখিগণ পরিবৃতা রাধাকৃষ্ণের কৃত্রিম বেশধারী নট বালকগণের মধুর কৃষ্ণলীলা অভিনয় হইয়া থাকে।

লালাবাবুর মন্দির।

কলিকাতা পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ মহারাজা স্বর্গীয় কীর্ত্তিচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের স্থাপিত দেবালয়ই, লালাবাবুর মন্দির নামে প্রসিদ্ধ। বৃন্দাবনে এরূপ সুন্দর শৃঙ্খলাযুক্ত দীন দুঃখীর একমাত্র আশ্রয় আর নাই। ধনী গৃহের বিবাহাদি উৎসবের ভোজনের ন্যায় এই মন্দিরে প্রতিদিন শত শত লোক ভোগের প্রসাদ অকাতরে পাইয়া থাকে। লালাবাবুর বৈরাগ্য সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে—মহারাজ একদিন পালকীতে যাইতেছেন, বেলা অবসান প্রায়, এমন সময় পথিপার্শ্বে এক রজকগৃহে একটী বালিকা নিদ্রাগত পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে "বাবা উঠ, বেলা গেল" এই বাক্য কয়েকটী মহারাজের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র, তাঁহার মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, তিনি একমনে চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন হায়! সত্যইত বেলা গেল। সত্য সত্যই আমার জীবনরূপ

দিবা অবসান হইল। * আমি মায়া মোহে আচ্ছন্ন হইয়া সংসারেই আবদ্ধ আছি। এই বলিয়া বৈরাগ্য প্রণোদিত হইয়া অতুল বিষয় সম্পত্তির লিপ্সা পরিত্যাগে বৃন্দাবনবাসী হইলেন। তিনি ভগবানের সেবা ও নিরাশ্রয় দীনহীন কাঙ্গালীর আশ্রয়স্বরূপ সদাব্রত স্থাপন করিয়া ভারতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

শেঠের মন্দির।

বৃন্দাবন মধ্যে শেঠের মন্দির অত্যাশ্চর্য্য মহতী কীর্ত্তি। শেঠপ্রবর গোবিন্দ দাস ও রাধাকৃষ্ণ সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া মরজগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন মানসে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া নির্ম্মাণ করত আপন গুরুদেবের নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। রেল ষ্টেসন হইতে বৃন্দাবন সহরে প্রবেশ করিতেই সম্মুখে সেই উন্নত প্রাচীর বেষ্টিত প্রকাণ্ড পুরী। সম্মুখের প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ঘর, ইহা ধর্ম্মশালারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তৎপর রাজবাটীর ন্যায় সিংহদ্বার পার হইলেই দেবালয় ও প্রকাণ্ড পুষ্পোদ্যান। মন্দির সম্মুখে সুসজ্জিত নাট মন্দির। ভিতরে শ্রীরঙ্গজী, নরসিংহ মূর্ত্তি ও শ্রীরাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির কয়েকটী মূর্ত্তি নিত্য পূজা হইয়া থাকে। দেব মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ ভূমিতে শেঠের অদ্ভুত কীর্ত্তি "সোনার তালগাছ" কয়েকটী লৌহ রজ্জুর আকর্ষণে গাছের দেহ রক্ষা হইয়াছে। বৃক্ষের কোন পত্রাদি নাই একটী স্তম্ভাকার মাত্র। কথিত আছে দ্বাদশ মণ স্বুবর্ণ দ্বারায় ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছিল।

গোপেশ্বর মহাদেব মন্দির।

বংশিবটের দক্ষিণেই গোপেশ্বর মহাদেব মন্দির। বৃন্দাবনে সহস্র সহস্র বিষ্ণুমূর্ত্তি মধ্যে এই একটী মাত্র শিবলিঙ্গ বিরাজমান। তন্ত্রমতে বৃন্দাবন মহাপীঠ। এখানে সতী দেবীর কেশজাল পতিত হইয়াছিল— দেবীর নাম উমা এবং ভৈরব মহাদেবের নাম ভূতেশ। কিজন্য যে

ভূতেশ নাম স্থলে গোপেশ্বর হইল তাহা জানা যায় না। পাণ্ডারা বলিয়া থাকেন মহারাসলীলার সময় মহাদেব গোপী বেশে লীলা দেখিয়াছিলেন তজ্জন্য গোপেশ্বর হইয়াছেন। এখানে কালী দেবীর মন্দির আছে কিন্তু দেবীর নাম উমা নহে। যোগমায়া বলিয়া থাকে এবং এই যোগমায়া রাধাকৃষ্ণের মিলনের ঘটকালী করিয়াছিলেন এরূপ প্রবাদ।

বৃন্দাবনে আসিয়া যমুনায় স্নান, তর্পণ ও পার্ব্বণাদি করিতে হয়। দেব দর্শন ও বন ভ্রমণই এস্থানের প্রধান কার্য্য। পূর্ব্বের বন সকল আর নাই। সমস্তই সহরময়, তবে দূরে দূরে যে সকল বন আছে, তাহা ঝুলন পূর্ণিমার সময় ভিন্ন অন্য সময়ে দেখিবার তত সুবিধা হয় না। তৎকালে মহারাজার আগমনে বনভূমিসকল পরিষ্কার ও রাস্তাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাণ্ডাদিগের রক্ষিত কুঞ্জবন, নিধুবন, নিকুঞ্জবন, বেলবন প্রভৃতি কয়েকটী বন সহর মধ্যেই আছে কিন্তু তাহাতে বনের কোন শোভা দৃষ্ট হয় না। কতকগুলি বানরে সর্ব্বদা কিচমিচ করিয়া থাকে। পাণ্ডারা এ সব দেখাইয়াই যাত্রী হইতে পয়সা আদায় করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বংশী বট, যমুনা পুলীন, কালীয় আবর্ত্ত, বস্ত্রহরণ ঘাট, ধীর সমীর ঘাট, গোবিন্দ ঘাট, কেশী ঘাট, প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের গ্রন্থ লিখিত বহু দর্শনীয় স্থান আছে।

জয়পুরে গোবিন্দজী।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

বৃন্দাবনের প্রধান আদি দেবতা শ্রীগোবিন্দজী জয়পুরে আছেন। তদ্দর্শনাভিলাষে আমরা জয়পুর গিয়াছিলাম। মথুরা হইতে জয়পুর ১০৭ মাইল, ভাড়া ১৷০; কলিকাতা হইতে ৯৪২ মাইল, ভাড়া ৮৸৴৬ পাই। আমরা পুষ্কর তীর্থ দর্শন করিয়া আজমির হইতে জয়পুরে আসিয়াছিলাম। আজমির হইতে জয়পুর ৪৪ মাইল, ভাড়া ৷৷৵০ আনা; যাহারা দিল্লী হইতে আসিবেন তাহারা আজমিরের পথে এবং যাহারা এলাহাবাদ হইতে হাটরস হইয়া যাইবেন, তাহাদের মথুরার পথে যাওয়াই সুবিধা-জনক। রেল ষ্টেসন সহরের বাহিরে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেসনের নিকট একটি ছোট বাজার, ধরমশালা ও সরাই আছে, নিকটেই ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটী। ইংরেজ রেসিডেণ্ট সাহেবের আবাসটী বড়ই সুন্দর।

ভারতবর্ষ মধ্যে জয়পুর একটি আদর্শ সহর। এমত অনিন্দ্যসুন্দর অমরাবতীতুল্য নগরী ভারতে অতি বিরল। চতুর্দ্দিকে বৃক্ষরাজি ও উন্নত পর্ব্বতসমূহ, শিখরে শিখরে দুর্গশ্রেণী, ইহার সুদৃশ্য সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্মগুলি এমন সুশৃঙ্খলে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, তাহার তুলনা নাই। সহরের মধ্যে সড়কগুলি শত ফিট প্রশস্ত, দুই ধারে ধবল ও লোহিত-রাগরঞ্জিত শিলালঙ্কৃত সৌধাবলী যেন চিত্র-পটের ন্যায় মর জগতে স্বর্গীয় প্রভা বিস্তার করিয়াছে।

জয়পুরে প্রজার কোন স্বত্ব নাই; তাহারা ঘরবাটী প্রস্তুতের ক্বচিৎ অনুমতি পাইয়া থাকে; সমস্ত সহরই মহারাজার নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। সরকারী কার্য্য ভিন্ন অন্য সমস্তই ভাড়াতে বিলি আছে,

রাজ্যের আয়ের চতুর্থাংশই ইহাতে উৎপন্ন হয়। সড়কের উভয় পার্শ্বের হর্ম্ম্যাবলী একই রঙ্গের একই গঠনের দ্বিতল ত্রিতল চৌতল হিসাবে গঠিত, বিভিন্ন বিভিন্ন সড়কে বিভিন্ন প্রণালীতে মনোমুগ্ধকর সৌধাবলি নির্ম্মিত হইয়াছে। হাট, বাজার, মন্দির, তোরণ, চত্বর সমুদয়ই যেন চিত্রের ন্যায় নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া মনোহর ভাবে বিরাজিত। সহরের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরে, দুর্গের ন্যায় পরিবেষ্টিত। মধ্যে মধ্যে প্রবেশের জন্য বিরাট তোরণ দ্বার। নগরের চতুর্দ্দিকে সাতটী তোরণ দ্বার আছে। প্রত্যেক দ্বার বহু শস্ত্রধারী সিপাহী কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। প্রাচীরের উপরে তোপ পোতা আছে, এবং দ্বারপার্শ্বেই দ্বাররক্ষক সিপাহীদিগের থাকিবার স্থান। প্রাচীর বেষ্টিত সহরটী দুই মাইল দীর্ঘ। বাহিরে চতুর্দ্দিকেই কলিকাতার সোবার্ব্বের ন্যায় বসতি। তৎপর উচ্চ পর্ব্বত শিখরে চতুর্দ্দিকেই দুর্গ বা সুরক্ষিত কেল্লা সমূহ। মহারাজার আয় কোটী মুদ্রার উপরে, লোকসংখ্যা দেড় লক্ষের ঊর্দ্ধে। অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ প্রভৃতি সৈন্যসংখ্যা পঞ্চবিংশতি সহস্র। জয়পুর একটী বাণিজ্যপ্রধান স্থান, রাজপুতনা, দিল্লী ও আগরা হইতে বহু জিনিষ আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে। স্বর্ণ, রৌপ্য ও প্রস্তরের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। এই রাজ্যে শ্বেত মর্ম্মরের খনি ও পর্ব্বতসমূহ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত। ভারতের নানা স্থানে শ্বেত পাথরের নানাবিধ বাসন, পুতুল দেবমূর্ত্তি ও অট্টালিকাদির কার্য্যে শ্বেত পাথর এখান হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে।

প্রাচীন হিন্দু রাজ্যের শাসন প্রণালী কিরূপ সরল ও সহজ ভাবে নিষ্পন্ন হইত তাহার আদর্শ জয়পুর মহারাজের বিচারাসনে দৃষ্ট হয়। একটী সুপ্রশস্ত আঙ্গিনার চতুর্দ্দিকে মহারাজার আফিসাদি স্থাপিত। শাসন কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদনার্থ আইন, আদালত, রাজস্ব, সৈনিক প্রভৃতি চারিটী বিভাগ আছে এবং তাহা সুবিজ্ঞ সচিবগণের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত হয়। মহারাজ স্বয়ং নিজ রাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা। বিচারাদালত গুলিতে

কোন হট্টগোল নাই ; বিচারপতি ফরাসের উপর বসিয়া বিচার কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। এখানে ষ্টাম্প আছে। টাকসাল আছে। স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রাদি রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচলিত। মহারাজার হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আস্থা। ন্যায়পরায়ণতা, প্রজাবাৎসল্য ও বিচারপদ্ধতি দৃষ্টে পুরাণ বর্ণিত আর্য্যরাজগণের কথা স্মরণ হয়। এখানে প্রধান মন্ত্রী বাঙ্গালী। রাজবাটীর ঠিক মধ্যস্থলে চন্দ্রমহল নামে মহারাজা বাহাদুরের সুদৃশ্য রাজভবন। এই প্রাসাদটী ইংরেজী স্থাপত্যানুসারে নানাবিধ বিলাতী উপকরণে সুসজ্জিত। প্রাসাদের সংলগ্ন উত্তর দিকে অতি বিস্তৃত মনোহর পুষ্পোদ্যান। শ্রেণীবদ্ধ নানাবিধ তরুনিচয় প্রস্ফুটিত কুসুমভারে অবনত। জলপ্রণালী, ফোয়ারা, লতাকুঞ্জ, সবুজ, সুন্দর, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম শোভায় দর্শকের মন মুগ্ধ করিয়া থাকে। এই উদ্যানে ময়ূর ময়ূরী ও নানাবিধ পক্ষিগণ অকুতোভয়ে ইতস্ততঃ বেড়াইতেছে। দেখিতে বড়ই সুন্দর। এই উদ্যানের প্রান্তেই সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দজীর বাটী। মহারাজার প্রাসাদ হইতে একটী সরল প্রশস্ত সুন্দর সড়ক গোবিন্দজীর মন্দির পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গোবিন্দজীর সম্মুখের দরজা খুলিলেই, রাজপ্রাসাদ হইতে মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ইনি বৃন্দাবনের পুরাতন আদিমূর্ত্তি। গোবিন্দজীর বাটী প্রকাণ্ড। ইহার দেবোত্তর সম্পত্তির আয় তিন লক্ষ টাকারও উর্দ্ধে। পূর্ব্বদিকের সিংহদ্বার পথে প্রবেশ করিতে হয়। দ্বারে সিপাই পাহারা আছে। পার্শ্বেই দেবতার দেওয়ানখানা। এখানে বহুতর কর্ম্মচারী আছে। হস্তী, ঘোটক, রথ, গাড়ী ইত্যাদি সাম্রাজ্যের যাবতীয় চিহ্নই গোবিন্দজীর পৃথক ভাবে বর্ত্তমান আছে। একতালার সুপ্রশস্ত কক্ষ মধ্যে শ্রীগোবিন্দমূর্ত্তি সোজা পায় সরল ভাবে, সিংহাসনোপরি দণ্ডায়মান। হাতে মোহন বাঁশীটী উচ্চ করিয়া ধরিয়া আছেন। এই মূর্ত্তিই ষোড়শ শতাব্দিতে মহারাজা মানসিংহ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত হইতে বৃন্দাবনে আনিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন

আখ্যানে যে অত্যাশ্চর্য্য গোবিন্দজীর মন্দিরের বিবরণ বর্ণিত আছে তাহাতেই এই দেবের অধিষ্ঠান ছিল। হিন্দুদেবদ্বেষী আরংজেব বাদসাহের—গোবিন্দজীকে মন্দির সহ ভগ্ন করিবার—আদেশ শ্রবণ করিয়া —জয়পুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ কৌশলে বাঙ্গালী পুরোহিতের সাহায্যে শ্রীগোবিন্দজীকে আপন রাজধানীতে আনিয়াছিলেন। বর্ত্তমানেও সেই বাঙ্গালী পূজকের বংশধরগণই শ্রীগোবিন্দের পূজারী হইয়া সেবা করিতেছেন। আমাদিগকে যথেষ্ট আদর করিয়া সম্মুখে বসাইলে এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় যাত্রিগণ হইতে দর্শন জন্য অধিক সুবিধা করিয়া দিলেন। আমরা ॥৵০ আনা হিসাবে ভোগের পয়সা দিয়া, বাসার ঠিকানা দিয়া আসিয়াছিলাম। যথাসময়ে ভোগের প্রসাদ আমাদের বাসায় পঁহুছিয়াছিল। এখানে পূজা ও দর্শনের ভেট কি ট্যাক্স নাই। যাত্রিগণ স্বেচ্ছায় দর্শনি দিয়া থাকেন।

এখানে হাওয়া মহল, বাদলা মহল, রাজপ্রাসাদ, শ্রীগোবিন্দজীর বাটী, তোরণ দ্বার, স্বর্ণশূলমিনার, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম, রামবাগ, ত্রিপুলায়া ফটক, মানমন্দির, দেওয়ানী, আম দেওয়ানী খাস, কাছারী বাটী ইত্যাদি প্রধান দর্শনীয় স্থান। এ সমস্ত মধ্যে রামবাগ দর্শন করিয়া আমি যত আনন্দ ভোগ করিয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। এত বড় সুন্দর পার্ক কলিকাতা, আগ্রা বা দিল্লীতেও দেখি নাই। এই বাগান মধ্যে যে শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত মিউজিয়ম আছে, তাহার সংলগ্ন একটী একতালা হলের উচ্চ দেওয়ালে জয়পুর রাজবংশের আদি হইতে বর্ত্তমান মহারাজ পর্য্যন্ত রাজন্যবর্গের পূর্ণ অবয়বের অয়েল পেইন্টিং চিত্রগুলি একাদিক্রমে অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চ দেওয়ালোপরি এমত সুন্দর চিত্রগুলি শিল্প নৈপুণ্যের পারাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে এবং অতি প্রাচীন সময় হইতে যে ভারতে ভাস্করবিদ্যা প্রচলিত ছিল তাহাই সপ্রমাণ করিতেছে।

নৈমিষারণ্য।

নৈমিষে ব্রহ্ম তিষ্ঠতি। তত্রপ্রবেশাৎ সর্ব্ব পাপনাশঃ।
স্নানাৎ গবমেয় যাগফল প্রাপ্তিঃ সপ্তকুলোদ্ধারঃ
উপবাসেন প্রাণত্যাগাৎ স্বর্গপ্রাপ্তিশ্চ।

আর্য্য শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ আছে, দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হইলে, দৈত্যদানবেরা স্বর্গাধিকার করিয়া দেবগণের প্রতি একান্ত অত্যাচার করিয়াছিল। শান্তিপ্রিয় দেবগণ অসুরদিগের উৎপীড়নে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিলেন। মানবেন্দ্রমনু পিতৃ-লোকবাসিগণ সহ দক্ষিণ দিকে ভারতবর্ষে আসিয়া দৃশদ্বতী ও সরস্বতী নামক দেব নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, আদিম নিবাসী অনার্য্য দস্যু বা দানব-দিগকে পরাজিত করিয়া, উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত বলিয়া উক্ত। ক্রমে বংশবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, পাঞ্চাল, কুরুক্ষেত্র, সুরসেন, মৎস্য প্রভৃতি দেশ অধিকার করিয়া তাহাকে ব্রহ্মর্ষি দেশ নামে আখ্যাত করিলেন। নৈমিষারণ্য এই ব্রহ্মর্ষি দেশের অন্তর্গত। স্বচ্ছসলিলা গোমতী নদী মধ্য ভাগে প্রবাহিত। ইহার পরিধি চৌরাশী ক্রোশ, প্রজাপতি ব্রহ্মা এই স্থানে ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন। মানবেন্দ্র মনু এই ব্রহ্মর্ষি দেশে অযোধ্যা নাম্নী দেবনগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই পুণ্যভূমি মুনিদিগের যজ্ঞক্ষেত্র। নৈমিষারণ্যে মুনিগণের দ্বাদশ বার্ষিকি যজ্ঞে সহস্র সহস্র মুনিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস এই পবিত্র ক্ষেত্রে বসিয়া মহাভারত, পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি গোমতী নদীর তটে মহর্ষির আশ্রম প্রদর্শিত হইয়া থকে। স্বায়ম্ভুব মনু ও সতরূপার সমাধি এখানে বর্ত্তমান। ইহা পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দশাশ্বমেধ যজ্ঞ স্থান।

এই পরম পবিত্র পুণ্যভূমি দর্শনমানসে আমরা ১৩১৯ সালের চৈত্র মাসে বারাণসী ক্ষেত্র হইতে লক্ষ্ণৌর পথে, বালামৌ নামক জংসনে সীতা-পুরগামী রেলে আরোহণ করিয়া, নিমিষারনামক ষ্টেসনে অবতরণ করি। নৈমিষারণ্যের প্রচলিত নাম নিমিষার। কাশী হইতে নিমিষার রেল ভাড়া ২৸০ আনামাত্র। ষ্টেসন হইতে তীর্থ স্থান এক মাইল। চতুর্দ্দিকে অরণ্য, নিমিষার গ্রামে পাণ্ডা ও তাহাদের সেবকগণের বসতি। এখানে আম্রের বাগান সমধিক, যাত্রিগণের আম্রবৃক্ষদান করিবার প্রথা আছে। নৈমিষারণ্য মধ্যে তিনটী তীর্থ—নৈমিষারণ্য, হত্যাহরণ ও মিশ্রক। মিশ্রক তীর্থে রেলযোগেই যাওয়া যায়। হত্যাহরণ ৮ মাইল ব্যবধান, পদব্রজে কিম্বা গোশকটে যাইতে হয়। হত্যাহরণ একটী কুণ্ড, চতুর্দ্দিকে ইষ্টক বাঁধা ঘাট; পাণ্ডাগণ প্রকাশ করেন, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, রাক্ষস রাবণকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এই কুণ্ডে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হত্যাহরণ। তথায়ও পৃথক পাণ্ডা আছেন। মিশ্রক নামক তীর্থ দেবতাগণের শ্মশান ক্ষেত্র, এখানেও একটী কুণ্ড আছে, তাহাতে স্নান তর্পণ করিতে হয়। প্রত্যেক স্থানেরই স্বতন্ত্র পাণ্ডা।

নৈমিষারণ্যে প্রাচীন চিহ্ন মধ্যে সেই অরণ্য এবং গোমতী নদীই বর্ত্তমান। ব্যাসদেবের আশ্রমে অতি প্রাচীন একটী তমাল বৃক্ষ ও প্রস্তর বাঁধা উচ্চ ভিটী এবং মন্দিরাভ্যন্তরে ব্যাস দেবের মূর্ত্তি আছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞস্থানে রাম সীতা মূর্ত্তি বিরাজমান। পাণ্ডব কিল্লা নামক একটী স্থানে, অতি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইল, এই কিল্লার মধ্যে একটী মন্দিরে পঞ্চ পাণ্ডব ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে। এখানে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ তপস্যা করিয়াছিলেন এরূপ প্রবাদ। নৈমিষারণ্যে অনেক সাধু সন্ন্যাসিগণ বাস করেন। ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষে বন পরিক্রমণ নামে একটী পর্ব্ব আছে, তখন বহু সহস্র

সন্ন্যাসী, দণ্ডী, অবধূত, ব্রহ্মচারী, নাগা গোস্বামী ও বৈষ্ণব ভক্তগণের সমাগম হয়। নৈমিষারণ্যের কুণ্ডের জলে স্নান করিলে পাপ হরণ করে এমত বর্ণিত আছে, কিন্তু এই কুণ্ডের জল একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শুনা যায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কুণ্ডটী পুনসংস্কার করিয়া দিবেন। এখানে আমরা গোমতী নদীতে স্নান তর্পণ করিয়া কুণ্ডের পার দেবালয়ে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম। এস্থানের পাণ্ডাগণ ৩।৪ টাকার ন্যূনে সফল প্রদান করেন না। ইহা সাধুদিগের বাসের স্থান, অতি নির্জ্জন, অরণ্য ভূমি, বানবের সংখ্যা অত্যধিক। আহারীয় দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্য। ধনী মাড়োয়ারিগণ কর্ত্তৃক সাধুদিগের বাসের জন্য একটী ধর্ম্মশালা নূতন প্রস্তুত হইয়াছে।